মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1 Woodburn Park, Kolkata–700 020 and
Printed at : Calcutta Repro Graphics, 36/8B Sahitya Parishad Street, Kolkata-700 006

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ উপকরণ

জৈব কৃষি এবং উদ্যানবিদ্যা
(Organic Agriculture and Horticulture)

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সার্টিফিকেট পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
Distance Education Council, Government of India.

NSOU

পরিচিতি

বিষয় : জৈব কৃষি এবং উদ্যানবিদ্যা

পাঠক্রম : COAH : 01 & 02

রচনা

ড. আনন্দ কুমার মণ্ডল

শ্রী বলাইলাল জানা

শ্রী প্রদীপচন্দ্র বসু

সম্পাদনা

শ্রী রাখালচন্দ্র নাথ

শ্রী বিমল বিহারী দাস

শ্রী প্রদীপচন্দ্র বসু

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

COAH- 01 & 02

জৈব কৃষি এবং উদ্যানবিদ্যা

পত্র-১

একক 1	❑ মাটি	9-22
একক 2	❑ জৈব কৃষি	23-29
একক 3	❑ বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থা	30-33
একক 4	❑ পৃথিবী জুড়ে জৈব কৃষির অগ্রগতির ইতিহাস	34-39
একক 5	❑ জৈব চাষ	40-43
একক 6	❑ গাছের খাদ্য	44-46
একক 7	❑ মাটিতে জৈবসারের পচন ও পরিবর্তন	47-55
একক 8	❑ উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান গ্রহণ ও ব্যবহার	56-60
একক 9	❑ কৃষিতে জৈব ও অজৈব সারের সুষম ব্যবহার	61-64
একক 10	❑ জৈব সার এবং তার প্রকারভেদ	65-85
একক 11	❑ কম্পোস্ট সার প্রস্তুত পদ্ধতি	86-106
একক 12	❑ কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্ট	107-117

পত্র-২

একক 1	❑ কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশকের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফল	121-144
একক 2	❑ অম্ল, ক্ষার ও লবণাক্ত মাটি সংশোধন	145-153

একক 3	❑ মাটির উৎপাদিকা শক্তি	154-158
একক 4	❑ বিভিন্ন ধরনের শস্য ও ফসল	159-171
একক 5	❑ জৈব ও জীবাণু সারের সাহায্যে ফসল চাষ পদ্ধতি	172-206
একক 6	❑ জৈব উপাদানের সাহায্যে ধান চাষ	207-213
একক 7	❑ শস্যরক্ষা পদ্ধতি	214-232
একক 8	❑ জৈব কৃষিতে নিমের ব্যবহার	233-236
একক 9	❑ জৈব কৃষি প্রবর্তনে ভারতের জাতীয় কর্মসূচি	237-238
একক 10	❑ শহর এবং শহরতলিতে জৈব কৃষি এবং উদ্যানজাত ফসল চাষ	239-241
একক 11	❑ চুক্তি চাষ, জৈব পদ্ধতিতে ফসল চাষ	242-246
একক 12	❑ নিবন্ধিকৃত সংস্থার দ্বারা জৈব চাষের গুণমান নিয়ন্ত্রণ	247-254
একক 13	❑ বিভিন্ন জৈবসার প্রয়োগে উদ্যানজাত ফসলের চাষবাস	255-270
প্রশ্নমালা		271-276

পত্র-১

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ১ ❐ মাটি

গঠন

১.১ মাটি

১.২ মাটির সৃষ্টি

১.৩ মাটির কাজ

১.৪ মাটির প্রকারভেদ

১.৫ মাটি পরীক্ষা

১.৬ উর্বরতার ভিত্তিতে মাটিতে খাদ্যউপাদানের উপস্থিতি

১.১ মাটি

পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং একভাগ স্থল। সাধারণভাবে স্থলভাগের কঠিন অথচ কোমল যে অংশে বৃক্ষলতাদি জন্মায়, তাকেই মাটি বলে। অবশ্য জলের নীচেও মাটি দেখা যায় এবং সমুদ্রের তলদেশেও জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। আবার স্থলভাগের কোন কোন অংশেও উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কোন চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে দেখা যায় কেবল ধূ ধূ বালুকারাশি এবং শিলাস্তূপ। মরুভূমির বালুকারাশি ও পাহাড় পর্বতের শিলাস্তূপকে প্রকৃত মাটি বলা যায় না।

মাটি বলতে তাই বলা যায় যে, নানা প্রকার প্রাকৃতিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার দ্বারা স্থলভাগের উপর যে স্তর সৃষ্টি হয়েছে, যার উপর বিভিন্ন উদ্ভিদ, ফসল, বৃক্ষলতাদি, গুল্ম, গাছ প্রভৃতি জন্মায় ও স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি ঘটায় এবং নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবাণু, প্রাণী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যে স্তরকে সর্বদা পরিবর্তন করে চলেছে, সেই স্তরকেই মাটি বলে।

১.২ মাটির সৃষ্টি

বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, আমাদের এই পৃথিবীর উপরিভাগ প্রথমে উত্তপ্ত তরল অবস্থায় ছিল। ক্রমাগত তাপ বিকিরণের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থগুলি ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। এই পিণ্ডকে বলে শিলা। প্রধানত তিন ধরনের শিলা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি যথাক্রমে ঃ আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা, পরিবর্তিত শিলা।

আমরা যে মাটিকে দেখি তা সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয় ও পাললিক শিলা থেকে। এই সৃষ্টির পেছনে যে প্রক্রিয়াগুলি কাজ করেছে তার নাম ঃ প্রাকৃতিক বা ভৌত বিচূর্ণীভবন, রাসায়নিক ক্ষয় ও জৈবিক ক্ষয়।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন সূর্যের তাপ, বৃষ্টি, শৈত্য, বায়ু প্রবাহ, জল প্রবাহ দ্বারা ভূত্বকের উপরিভাগের কঠিন শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটি সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার। এভাবে মাটি সৃষ্টি হওয়ার আগে চূর্ণবিচূর্ণ শিলা বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থের সঙ্গে মেশে।

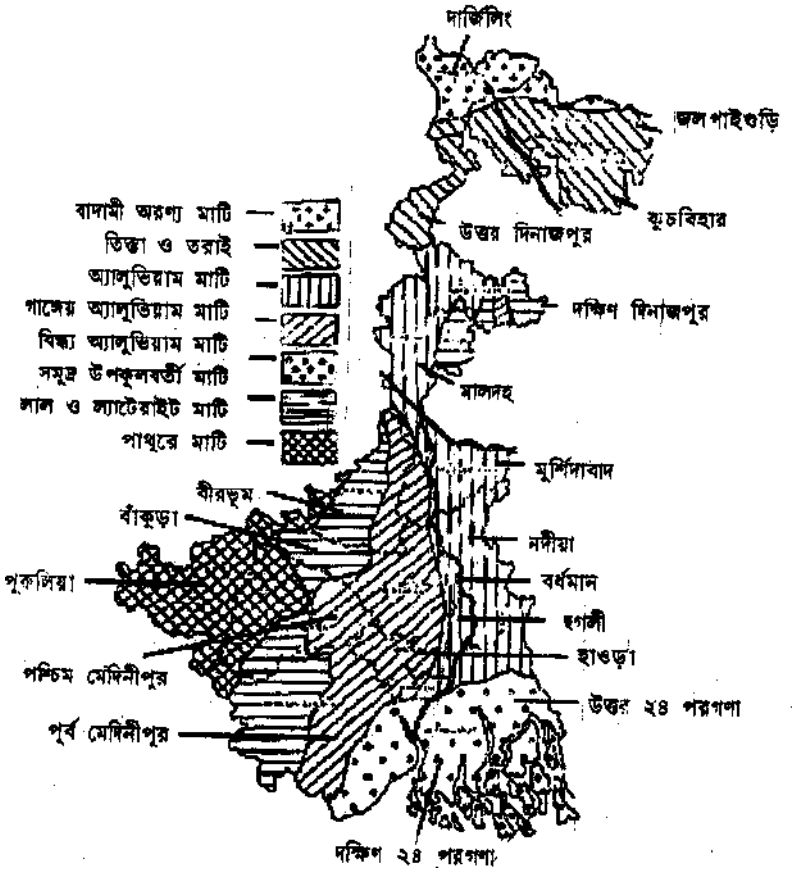

পশ্চিমবঙ্গে মাটির শ্রেণীবিভাগ

রাসায়নিক ক্ষয় প্রক্রিয়ায় শিলার বিভিন্ন ধাতব পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন নতুন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থগুলি পরবর্তী পর্যায়ে মাটি তৈরি করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই জলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের অজৈব ও জৈব অম্ল মিশে সহজে দ্রবণীয় শিলার জিপসাম, চূণাপাথরকে জলে দ্রবীভূত করে মাটিতে পরিণত করে। এছাড়াও জলস্রোতে শিলাস্তরে ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় হওয়া অংশ নদীর তীরে বা মোহনায় জমা হয়ে মাটি সৃষ্টি করে। সমুদ্রের জোয়ার ও ভাঁটাও শিলাকে চূর্ণ করে মাটিতে পরিণত করে।

প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর এর সঙ্গে জৈব পদার্থ যুক্ত হয়ে প্রকৃত মাটি তৈরি হয়। এই জৈব পদার্থ আসে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ থেকে। জৈব পদার্থ দু'ভাবে মাটি তৈরিতে সাহায্য করে।

প্রথম পর্যায়ে শক্ত শিলার গায়ে শ্যাওলা জাতীয় গাছ জন্মে শিলাকে নরম করে। তাপমাত্রার কমাবাড়ায় এই নরম শিলায় ফাটল ধরলে সেখানে বড় গাছ জন্মায়। এইসব গাছের শিকড় শিলার ফাটলে ঢুকে শিলাকে চূর্ণ করে। এর পাশাপাশি গাছের ডালপালা ও পাতা এবং শিকড় পচে জৈব অম্ল তৈরি হয়। চূর্ণ শিলার খনিজ পদার্থ জৈব অম্লের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিভিন্ন পদার্থ তৈরি করে যা কালক্রমে মাটিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রাণীদেহ থেকে জৈব পদার্থ মাটিতে দু'ভাবে যুক্ত হয়। প্রথমে প্রাণীদেহের বর্জ্য পদার্থ জীবিত থাকাকালীন মাটিতে মেশে। এরপর মৃত প্রাণীর দেহ পচে মাটিতে যুক্ত হয়। এছাড়া মাটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু জৈব পদার্থকে পচিয়ে হিউমাস সৃষ্টি করে। অনেক জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেনকে মাটিতে আবদ্ধ করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। কেঁচো মাটির মধ্যে ঢুকে মাটি ওলটপালট করে মাটির প্রকৃতি পরিবর্তন করে। জৈব পদার্থের এই সামগ্রিক ভূমিকাই হচ্ছে জৈবিক ক্ষয়।

প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আজ যে মাটিকে আমরা দেখছি তা সৃষ্টি হতে কয়েক লক্ষ বছর সময় লেগেছে। মাটি সৃষ্টির সময় মাটির ওপরে ও নীচের অংশে তিন ধরনের ক্ষয় প্রক্রিয়ার তারতম্য অনুযায়ী মাটির বিভিন্ন স্তর তৈরি হয়। এই স্তরের প্রতিটির ভৌত, রাসায়নিক ও গঠন চরিত্র আলাদা। মাটি সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি মাটির স্তরবিন্যাস তৈরিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সাধারণভাবে দেখলে মাটি একটি মিশ্র পদার্থ। এতে কঠিন উপাদান হিসেবে আছে খনিজ ও জৈব উপাদান। এর সঙ্গে মিশে থাকে জল। মাটির ছিদ্রগুলিতে ঢুকে থাকে বাতাস। আর, মাটিতে জীবন্ত উপাদান হিসেবে মিশে থাকে মাটির জীবাণু।

১.৩ মাটির কাজ

মাটি অনেক কাজ করে।

উদ্ভিদ জগতের ঠিকভাবে দাঁড়ানোর জন্য মাটি ভার বহন করে। গাছপালার শিকড় মাটিকে আঁকড়ে থাকে ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মাটি থেকে গ্রহণ করে।

মাটি উদ্ভিদ বা শস্যের এমন একটি আধার, যা থেকে উদ্ভিদ, গাছ বা ফসল তাদের দরকারী খাদ্যবস্তুগুলি পায়।

মাটি বাতাস এবং জলের উপস্থিতিতে অনেক রাসায়নিক পরিবর্তনের আধার হিসাবে কাজ করে। ফলে অনেক দূষিত পদার্থের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

মাটি অনেক উপকারী অণুজীবী ও প্রাণীর বাসস্থান। ব্যাক্টেরিয়া, রাইজোবিয়াম, এ্যান্টিনোমাইসিটিস প্রভৃতি অণুজীবী এবং কেঁচো, ঘুরঘুরে পোকা ইত্যাদি প্রাণী মাটির প্রভূত উপকার সাধন করে, উদ্ভিদের শিকড়কে খাদ্যের জোগান দেয় ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

মাটি একটি মিশ্র পদার্থ। জল, বায়ু, জৈব পদার্থ, জীবাণু, প্রাণী ইত্যাদির দ্বারা মাটির সৃষ্টি হয়েছে। এইসব উপকারী জীবাণু ও প্রাণী (ছোট এবং বড়) সর্বদাই মাটির বিভিন্ন স্তরকে পরিবর্তন করছে।

১.৪ মাটির প্রকারভেদ

মাটির প্রকারভেদ প্রধানত দু'ভাবে করা হয় ঃ

(১) উৎপত্তি অনুসারে ; (২) উপাদান অনুযায়ী।

উৎপত্তি অনুসারে মাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম ভাগের নাম, স্থানীয় মাটি। কোনও এলাকায় শিলা থেকে সৃষ্টি হওয়া মাটি যদি সেই এলাকাতেই থেকে যায়, তাহলে তাকে স্থানীয় মাটি বলে। স্থানান্তরিত মাটি হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগের নাম। এ ধরনের মাটি এক এলাকার শিলা থেকে সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি, জলস্রোত ও বাতাসের মাধ্যমে অন্য এলাকায় গিয়ে স্থিতিশীল হয়। নদীমাতৃক এলাকায় এ ধরনের মাটি বেশি দেখা যায়। এরকম মাটিকে বলা হয় পাললিক মাটি। মাটির উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, এর গ্রথনে তিন ধরনের কণা থাকে। এদের বলে বালি কণা, পলি কণা ও কাদা কণা।

উপাদান অনুযায়ী মাটির অনেক ধরনের প্রকারভেদ হয়। এগুলির নাম যথাক্রমে ঃ

(১) বেলে মাটি (২) পলি মাটি (৩) এঁটেল বা কাদা মাটি (৪) দোআঁশ মাটি (৫) লোনা বা নোনা মাটি (৬) লাল মাটি (৭) চুণা মাটি (৮) কালো মাটি (৯) কাঁকড় মাটি (১০) বোদ বা পিট মাটি।

বিভিন্ন প্রকারের মাটির উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

মাটির বিভিন্ন প্রকারভেদে উপাদান ও চরিত্রের পার্থক্য হয়। এই পার্থক্য নির্ভর করে মাটিতে কী ধরনের মাটি কণা ও জৈব এবং অজৈব পদার্থ আছে। উপাদান অনুযায়ী দশ ধরনের মাটির চরিত্র এবং প্রতিটিতে কী ধরনের উপাদান আছে তা নীচে দেওয়া হল।

বেলে মাটি ঃ এই মাটিতে বালি কণা থাকে ৮০ শতাংশেরও বেশি। কাদা ও পলি কণার উপস্থিতি ১০ শতাংশ। বালি কণা মোটা ও মিহি, দু'ধরনের হয়। বালির সঙ্গে কাঁকড়ও মিশে থাকে।

বালি কণা যেহেতু পরস্পরের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে না, এ ধরনের মাটির জলধারণ ও জল নিষ্কাশনের ক্ষমতা খুব কম। অন্যদিকে জল শোষণের ক্ষমতা বেশি। বালিমাটিতে জল দাঁড় করিয়ে বা ধরে রেখে ফসলের চাষ খুবই অসুবিধাজনক। বালি বা বেলে মাটিতে ছিদ্র বড় হওয়ায় মাটির মধ্যে জল ও বাতাসের চলাচল ভাল। বেলে মাটিতে জল শুকিয়ে যায় দ্রুত এবং রোদের তাপে মাটি খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়। বেলে মাটি খুব হালকা ধরনের মাটি। এই মাটি চাষ করা সহজ।

পলি মাটি ঃ এই মাটিতে পলি কণা থাকে ৫০-৬০ শতাংশ, মিহি বালি কণা থাকে ১৫-২০ শতাংশ এবং ২০-৩০ শতাংশ থাকে কাদা কণা। নদীমাতৃক ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পলি মাটি দেখা যায়।

এই মাটি খুব উর্বর হয়। নরম, মোলায়েম, জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পলি মাটি খুব আঠালো হয়। উদ্ভিদের খাদ্য ধারণ ক্ষমতাও বেশি হয় এই মাটির।

এঁটেল বা কাদা মাটি ঃ এই মাটি ৪৫-৫০ শতাংশ কাদা কণা, ১০-২০ শতাংশ মিহি বালি কণা, ২০-৩০ শতাংশ পলি কণা এবং জৈব পদার্থের মিশ্রণে তৈরি।

এঁটেল বা কাদা মাটির জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এই মাটির মধ্যে জল ও বাতাস চলাচল ভাল হয় না। মাটি খুব নরম হয়। জল নিকাশের ক্ষমতা কম হওয়ায় বৃষ্টি বা সেচের পর মাটির ওপরে জল দাঁড়িয়ে থাকে। জল পড়লে এই মাটি আঠালো হয়ে যায়। জল শুকিয়ে গেলে এঁটেল মাটির জমিতে ফাটল চোখে পড়ে। এই মাটি ভারী হয় এবং শুকনো অবস্থায় হাল দেওয়া বেশ কষ্ট।

দোআঁশ মাটি ঃ এই মাটিতে বালি ও পলি কণা প্রায় সমান পরিমাণে থাকে। এর সঙ্গে থাকে কিছু পরিমাণে কাদা কণা, জৈব পদার্থ ও চুন।

দোআঁশ মাটি এঁটেল বা কাদা মাটির মতো ভারী, শক্ত ও আঠালো হয় না। আবার বালি মাটির মতো হালকা ও ঝুরঝুরেও নয়। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা খুব বেশি নয়। দোআঁশ মাটি তিন ধরনের হয়। মাটিতে বালির পরিমাণ পলির থেকে বেশি হলে বলে বেলে দোআঁশ। পলির পরিমাণ বালির চেয়ে বেশি হলে তাকে বলে পলি দোআঁশ। আর, পলি ও বালির থেকে কাদা কণা বেশি থাকলে সেই দোআঁশ মাটিকে বলে কাদা বা এটেল দোআঁশ মাটি।

নোনা মাটি ঃ এই মাটিতে বালি, পলি ও কাদা কণার সঙ্গে লবণের আধিক্য বেশি থাকে। সাধারণত সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকার মাটি লবণাক্ত হয়। নোনা মাটিতে জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়াম ক্লোরাইড জাতীয় ধাতব লবণ বেশি পাওয়া যায়।

অল্প নোনা মাটিতে আমন ধান, তুলা ও সবজি চাষ করা যায়।

লাল মাটি ঃ যেসব এঁটেল মাটিতে লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম ঘটিত যৌগ বেশি থাকে তাকে লাল মাটি বলে। এই যৌগ থাকার কারণে, এ মাটির রঙ লাল হয়।

লাল মাটি সবসময় অম্লভাবাপন্ন। সেজন্য এই মাটিতে ফসল চাষের আগে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করা দরকার। এর সঙ্গে জৈব সার দিতে হবে।

চুনা মাটি ঃ এই মাটি এক ধরনের বেলে মাটি যাতে চুন বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আধিক্য থাকে। সাধারণত চুনাপাথরের পাহাড় বা সংলগ্ন এলাকায় এই মাটি দেখা যায়।

চুনা মাটির চরিত্র ক্ষারীয়। এর জলধারণ ক্ষমতা বেশি। রোদের তাপে এই মাটি তাড়াতাড়ি গরম হয়। এই মাটি থেকে চুন নিকাশ না করলে ফসল চাষের উপযোগী হয় না।

কালো মাটি ঃ কালো লাভা প্রস্তর থেকে এই মাটি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই মাটিতে কাদার ভাগ বেশি থাকায় জলধারণ ক্ষমতা বেশি।

এই মাটি তুলা চাষের জন্য খুব উপযোগী।

কাঁকড় মাটি ঃ যে মাটিতে বেশি পরিমাণে কাঁকড়, মোটা দানা বালি এবং খুব অল্প কাদা কণা থাকে তাকে কাঁকড় মাটি বলে। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা প্রায় নেই। মাটি রোদের তাপে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গরম হয়ে যায়।

বোদ বা পিট মাটি ঃ এ মাটির ওপরে পচা প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ জৈব পদার্থের জমাট বাঁধা স্তর থাকে। পচনক্রিয়া সাধিত হয় এক প্রকার জীবাণু দ্বারা। বোদ আসলে জৈব পদার্থ, যার প্রচলিত নাম হিউমাস। মাটিতে হিউমাসের উপস্থিতি অনুযায়ী বোদ মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এদের বলে হালকা বোদ মাটি, কাঁচা বোদ মাটি ও পিট বোদ মাটি।

হালকা বোদ মাটিতে ক্ষার বেশি থাকে। এর জলধারণ ক্ষমতাও বেশি। কাঁচা বোদ মাটিও ক্ষারধর্মী। হালকা রোদ মাটিতে গাছের পচা অংশ এবং প্রাণীর গলিত দেহ থাকে। কিন্তু কাঁচা বোদ মাটি গাছের দেহাংশ ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের পচনের থেকে তৈরি হয়। এই মাটিও ক্ষারধর্মী। অন্যদিকে পিট বোদ মাটিতে পচাগলা প্রাণীদেহ অধিক পরিমাণে থাকে। এই মাটি অম্ল অথবা ক্ষারধর্মী হয়। এর জলধারণ ক্ষমতা থাকে। মাটির রং সাধারণত বাদামী।

পশ্চিমবঙ্গের মাটির শ্রেণীবিভাগ

মাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গঠন অনুসারে এ রাজ্যের মাটিকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

পার্বত্য বাদামী মাটি ঃ দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী অঞ্চলে সমুদ্রোপকূল থেকে ১৫০-৬০০ মিটার উপরে এরূপ মাটি দেখা যায়। এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হয়, বার্ষিক গড় প্রায় ৩৫০০ মিমি। মাটি হাল্কা বেলে দোঁয়াশ। জলধারণ শক্তি কম। জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে আছে। গ্রহণযোগ্য ফসফেট কিছু কম। গ্রহণযোগ্য পটাশ মাঝারি মানের। কিন্তু এ অঞ্চলে ভালো ফলনের প্রধান অন্তরায় হল—জমির মাটি অগভীর, মাটির অম্লত্ব এবং কম তাপমাত্রা ও কম সূর্যালোক। অম্লত্বের জন্য দ্রবণীয় অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির আধিক্য এবং কয়েকটি অণুখাদ্যের অভাব দেখা যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চা বাগান এ অঞ্চলে আছে। ধান, ভূট্টা, আলু ও শাকসবজি ভালোভাবে চাষ করা সম্ভব।

পাহাড়ের পাদদেশের তরাই ও তিস্তার পলিমাটি ঃ হিমালয় পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা ইত্যাদি খরস্রোতা নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার কিছু অংশ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর অঞ্চল গঠিত হয়েছে। হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশে, প্রধানত সারা জলপাইগুড়ি জেলা তরাই মাটির অর্ন্তভুক্ত। এ মাটি অগভীর ও মাটিতে বালির ভাগ বেশি। মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম। অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাতের ফলে (১৫২৫ থেকে ২৫৪০ মি.মি.) এখানকার মাটি থেকে

চুণজাতীয় পদার্থ জলের সঙ্গে চুঁইয়ে বেরিয়ে যায়, ফলে মাটি অম্লভাবাপন্ন। জৈব পদার্থ বেশি থাকলেও বেশি অম্লত্বের দরুন পচন তাড়াতাড়ি হয় না। ফলে জমিতে গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেনের অভাব আছে। গ্রহণযোগ্য ফসফেট কম পরিমাণে দেখা যায়। দ্রবণীয় অ্যালুমিনিয়াম, লোহার সাথে ফসফেটের যৌগ মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। গাছ গ্রহণ করতে অসুবিধায় পড়ে। চুন বা ডলোমাইট ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

গাঙ্গেয় পলিমাটি ঃ গঙ্গা নদীর বাহিত পলিমাটি মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বেশ কিছু অংশে রয়েছে। এই এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত ১৫২৪ মি.মি এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে জুনের মাঝমাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত প্রায় বছরের ৮০% বৃষ্টিপাত হয়। এই মাটি কৃষিকার্যের খুবই অনুকূল এবং উর্বর। মাটি মৃদু অম্ল বা স্বাভাবিক বা অল্প ক্ষারধর্মী (পি. এইচ ৬.০ থেকে ৮.০)। মাটিতে পলি ও এঁটেলের পরিমাণ বেশি। তাই উদ্ভিদখাদ্য ধরে রাখার ক্ষমতাও বেশি। জৈব পদার্থ মাঝারি পরিমাণে থাকে। তবে ইদানীং জৈব পদার্থের, বিশেষ করে নাইট্রোজেনের অভাব দেখা যাচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় অণুখাদ্য দস্তার অভাব দেখা যায়। আউশ চাষের সময় গ্রহণযোগ্য লোহার অভাব দেখা যায়। বৃষ্টি হলেই ঐ লোহা আবার গ্রহণযোগ্য অবস্থায় এসে যায়। তাই সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না। এ অঞ্চলের মাটিতে সুষম সার প্রয়োগে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বিন্ধ্য পর্বত উদ্ভূত নদীসমূহের পলিমাটি ঃ এই মাটি সৃষ্টি হয়েছে দামোদর, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদী বাহিত পলিমাটি দিয়ে। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশের মাটি এই শ্রেণীতে অর্ন্তভুক্ত। এ অঞ্চলের মাটি স্বাভাবিক ও সামান্য অম্লভাবাপন্ন (পি. এইচ ৫ থেকে ৭.২)। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৭০ মি.মি থেকে ১৫২০ মি.মি। মাটি হাল্কা, তাই উপরের স্তরের সবরকম ধাতুই নীচের স্তরে জমতে থাকে। চুনজাতীয় পদার্থ আলাদা হয়ে ঘুটিং তৈরী করে। মাটিতে গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ, ফসফেট কম থাকে। ফসফেট কোনও কোনও জায়গায় মাঝারি মানের থাকে। গ্রহণযোগ্য পটাশ মাঝারি থেকে বেশি পরিমাণে থাকে।

লাল ও লাল কাঁকুড়ে মাটি ঃ বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদহ ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশের মাটি এই শ্রেণীতে অর্ন্তভুক্ত। জমি সাধারণত অসমতল। কোনও অঞ্চলে শক্ত ও গভীরতা কম। রং লাল বা লালাভ বাদামী। অম্ল ভাবাপন্ন (পি. এইচ ৪.৮ থেকে ৬.৫)। বৃষ্টিপাত ১২৭০ থেকে ১৫২৪ মি.মি। বেশি লোহার জন্য ফসফেটের গ্রহণযোগ্যতা কম। জৈবপদার্থ, গ্রহণযোগ্য পটাশ কম পরিমাণে দেখা যায়। উঁচু জমির মাটি তীব্র অম্ল, কিন্তু নীচু জমির অম্লতা বেশি নয়। ক্ষার জাতীয় পদার্থ বৃষ্টিপাতের ফলে চুঁইয়ে যায়। এ জমিতে অণুখাদ্য দস্তা ও বোরোনের ঘাটতি দেখা যায়। অম্লতার আধিক্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে। মাটিতে বিভিন্ন জীবাণুও অধিক অম্ল অবস্থায় সক্রিয় থাকতে পারে না।

ভূমি ও ভূমি সংরক্ষণের মাধ্যমে ও চুনজাতীয় পদার্থ বেসিক স্ল্যাগ প্রয়োগে ভালো চাষ করা যায়। রক ফসফেট সার ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্ত মাটি ঃ পশ্চিমবঙ্গে লবণাক্ত মাটি আছে ৪টি জেলায়। জেলাভিত্তিক লবণাক্ত জমির পরিমাণ নীচে দেওয়া হল।

উত্তর চব্বিশ পরগণা = ১,৪৭,১১২ হেক্টর

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা = ৩,৫০, ৬২৫ হেক্টর

পূর্ব মেদিনীপুর = ২,৬৫,১১২ হেক্টর

হাওড়া = ৫৭,৫৯৯ হেক্টর

অসংখ্য নদনদী, তাদের শাখাপ্রশাখা ও নালা বা খাল দিয়ে এই অঞ্চল পূর্ণ এবং পরিবেষ্টিত। পশ্চিমবঙ্গে গাঙ্গেয় সমভূমির মত এই অঞ্চলও নদীর পলি দ্বারা গঠিত। নদীগুলির জল নোনা হওয়ায় উপকূলবর্তী জমিও নোনা। মাটি ভারী ও জল নিঃসরণ ক্ষমতা খুব কম। ম্যাগনেসিয়াম বেশি থাকায় কোনও অঞ্চলের মাটি রবি মরশুমে প্রচণ্ড শক্ত। চাষের জমিতে গাছের সংখ্যাল্পতা ও পতিত জমিতে সাদা নুনের আস্তরণ থেকে নোনা জমির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই লবণাক্ত জমিতে কম বেশি লবণ থাকে।

ভূগর্ভস্থ উঁচু জলস্তর থেকে নোনাজল উপরে উঠে বাষ্পীভূত হয় ও চাষের জমির নোনাভাব বাড়িয়ে দেয়। এই মাটিতে দ্রবণীয় লবণগুলি হচ্ছে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড ও সালফেট, কার্বোনেট লবণ। এই লবণের পরিমাণ নির্ভর করে বাষ্পীভবনের হার ও বৃষ্টিপাতের উপর।

ভূগর্ভস্থ জলস্তর অগভীর এবং জলনিকাশি ব্যবস্থার অভাবে বর্ষাকালীন চাষের পর জমির 'জো' আসতে সময় লাগে। প্রবল জোয়ারে উপচিয়ে ওঠা নোনা জল ঐ নদী নালা ও খালের মাধ্যমে বারবার সমুদ্রজলে অনুপ্রবেশ করে মাটিতে লবণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

এই অঞ্চলের কিছু জায়গায় আবার মাটির তীব্র অম্লতা লক্ষ্য করা গেছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে মাটির বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়ে অ্যাসিড সালফেট মাটির সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের মাটির সমস্যা পুকুর খননে সমাধান হয় না। হেক্টর প্রতি ৮-১০ টন চুন ব্যবহারে ভালো ফলন আশা করা যায়।

১.৫ মাটি পরীক্ষা

প্রচলিত পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষা

কীভাবে নমুনা সংগ্রহ করবেন ঃ

প্লট অনুযায়ী মাটির নমুনা সংগ্রহ করা দরকার।

জমিটি যদি একই অবস্থানের অর্থাৎ উঁচু নীচু না হয় এবং যদি ঐ জমিতে একই মরশুমে একই ফসলের চাষ হয়ে থাকে, তাহলে সেই জমির ১০-১৫ জায়গায় মাটি সংগ্রহ করে একত্রে মিশিয়ে কেবল মাত্র একটি নমুনা পাঠাবেন। অন্যথায় জমিটি যদি উঁচু নীচু হয়, তাহলে উঁচু নীচু অনুসারে জমিটিকে ভাগ করে নিয়ে, প্রত্যেক ভাগ থেকে আলাদা আলাদা নমুনা পাঠাবেন।

গাছের ছায়া, সারের গাদা, জমির আল, জলাবদ্ধ জমি বা সদ্য সার দেওয়া জমি থেকে নমুনা সগ্রেহ করা উচিত নয়। জমিতে ফসল থাকলে ফসল কাটার দশদিন আগে দু'সারির মাঝখান থেকে নমুনা নেওয়া চলবে।

জমির যেসব জায়গা থেকে নমুনা নেবেন, প্রথমে সেই জায়গাগুলি চিহ্নিত করুন। চিহ্নিত জায়গাগুলি থেকে ধান, গম, সরষে, শাক-সবজির জন্য ১৫ সেঃ মিঃ বা ৬ ইঞ্চি গভীরতা পর্যন্ত এবং পাট, আখ, আলু প্রভৃতি ফসলের জন্য ১২ সেঃ মিঃ বা ৯ ইঞ্চি গভীরতা পর্যন্ত মাটি নিতে হবে।

মাটি সংগ্রহের জন্য কোদাল, খুরপি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন। জমির উপর থেকে আগাছা সরিয়ে নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত একই রকমের পুরু মাটির চাপ কেটে নিন। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে নেওয়ার জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত একটি 'V' আকারের গর্ত করুন এবং ঐ গর্তের একপাশ থেকে এক ইঞ্চি পুরু এক ফালি মাটি সংগ্রহ করুন। সংগৃহীত মাটি একটি পরিষ্কার বালতি অথবা পলিথিনের প্যাকেটে রাখুন। সব জায়গার মাটি নেওয়া হয়ে গেলে, সমস্ত মাটি একটি পরিস্কার কাগজে ঢেলে গুঁড়ো করে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। মাটির সঙ্গে গাছপালার শিকড় বা আবর্জনা এবং কাঁকড় বা পাথরের টুকরো থাকলে বেছে ফেলুন। এরপর গুঁড়ো মাটিকে চারভাগে ভাগ করুন এবং বিপরীত ভাগ দু'টি ফেলে দিন। বাকী দু'টি ভাগকে আবার একত্রে মিশিয়ে নিন এবং চারভাগে ভাগ করে বিপরীত ভাগ দু'টি ফেলে দিন। এভাবে যখন আধ কেজি অর্থাৎ ৫০০ গ্রাম মাটি অবশিষ্ট থাকবে, তখন তা একটি পরিষ্কার কাপড় বা পলিথিনের থলিতে ভরে তথ্যপত্র সহ নমুনা হিসাবে পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দিন। মাটির নমুনা ভেজা থাকলে থলিতে ভরার আগে ছায়ায় শুকিয়ে নিন।

তথ্যপত্রে নিম্নলিখিত তথ্য দিতে হবে ঃ

১। কৃষকের নাম ঃ

২। কৃষকের ঠিকানা ঃ

৩। মৌজার নাম ও জে এল নং ঃ

৪। দাগ নং ঃ

৫। ব্লক ও জেলা ঃ

৬। জমির অবস্থান ঃ উঁচু/মাঝারি/নীচু

৭। মাটির প্রকার ঃ বেলে/দোআঁশ/এঁটেল

৮। সেচের সুবিধা ঃ আছে/নেই

৯। নিকাশি ব্যবস্থা ঃ আছে/নেই

১০। পূর্ববর্তী ফসল এবং ঐ ফসলে সার প্রয়োগের পরিমাণ ঃ

১১। কোন ফসলের/জাতের জন্য রাসায়নিক সারের সুপারিশ দরকার ঃ

মাটি সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও নমুনা সংগ্রহের তারিখ

সয়েল টেসটিং কিট-এর সাহায্যে মাটি পরীক্ষা

এই পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষার জন্য একটি 'সয়েল টেসটিং কিট' বা মাটি পরীক্ষার উপকরণ সহ বাক্স প্রয়োজন। এই বাক্সে প্রয়োজনীয় 'রিএজেন্ট' (রাসায়নিক বিকারক) থাকে যার সাহায্যে মাটির বিভিন্ন উপাদান, অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব এবং গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানের উপস্থিতি পরীক্ষা করে জানা যায়। কাজ করতে করতে রিএজেন্ট শেষ হয়ে গেলে আবার কিনে নিলেই কাজ করা যাবে। বাক্সটি আকারে ছোট, হালকা এবং দামও বেশি নয়। ফলে কম খরচে মাটি পরীক্ষা করা সম্ভব। কৃষক নিজেই নিজের জমির মাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। প্রয়োজনে অনায়াসে যে কোনও জায়গায় নিয়ে গিয়ে মাটি পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা মাটি পরীক্ষার কাজ যারা শিখছেন, তারাও এই বাক্স ব্যবহার করে মাটি পরীক্ষার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

বাক্সে কী কী থাকে

- একটি বই—যাতে মাটির পি. এইচ, জৈব কার্বন, গ্রহণযোগ্য ফসফেট, গ্রহণযোগ্য পটাশ এবং অ্যামোনিয়াকাল ও নাইট্রেট নাইট্রোজেন পরীক্ষার পদ্ধতির বর্ণনা আছে।
- কালার চার্ট—প্রতিটি পরীক্ষার জন্য আলাদা নম্বর যুক্ত চার্ট।
- পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ—দাগযুক্ত টেস্ট টিউব বা পরীক্ষার নল, ফানেল, রবার কর্ক, টেস্ট টিউব স্ট্যান্ড, মেজারিং সিলিন্ডার, ফিল্টার পেপার, বিভিন্ন মাপের চামচ (১ গ্রাম, ২ গ্রাম, ৫ গ্রাম), ড্রপার, সিরিঞ্জ, পরিশ্রুত জল (ডিস্টিলড ওয়াটার) এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ।
- পরীক্ষার জন্য রিএজেন্ট। এতে নাম লেখা থাকে না, ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকে। এই বইয়ে অবশ্য ক্রমিকসংখ্যার সঙ্গে প্রতিটির নাম জানিয়ে দেওয়া আছে।

(ক) মাটির পি. এইচ পরীক্ষার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ দাগযুক্ত পরীক্ষার নল, পরিশ্রুত জল, বেরিয়াম সালফেট (নং ৩), গ্ল্যাক্সো ইউনিভার্সাল ইনডিকেটর (নং ১)।

পদ্ধতি ঃ

(১) দাগযুক্ত পরীক্ষার নলে ৫ মিলি দাগ পর্যন্ত পরিশ্রুত জল নিতে হবে।

(২) ঐ নলে ২ গ্রাম মাটি ঢেলে তাতে ০.৫-১ গ্রাম বেরিয়াম সালফেট (নং ৩) কৌটো থেকে নিয়ে ঢেলে মিশিয়ে টিউবের মুখ রবারের কর্ক দিয়ে বন্ধ করে ২০ মিনিট ধরে মাঝে মাঝে ঝাঁকাতে হবে।

(৩) এরপর গ্ল্যাক্সো ইউনিভার্সাল ইনডিকেটর (নং ১)-এর শিশি থেকে ৫ ফোঁটা রঙীন তরল নলে ঢেলে আরও ৩০ সেকেন্ড ঝাঁকাতে হবে।

(৪) এবার নলটিকে স্থির ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলে মিশ্রণের মাটি নীচের দিকে থিতিয়ে পড়বে।

(৫) নলের মধ্যে মাটির ওপরে তরল মিশ্রণের রং এবার ১নং চার্টের সাথে মিলিয়ে পি.এইচ-এর মান নির্ধারণ করা যাবে।

(খ) মাটিতে গ্রহণযোগ্য ফসফেট পরীক্ষার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ দাগযুক্ত পরীক্ষার নল, ফানেল, ফিল্টার পেপার, পরিশ্রুত জল, $NaHCO_3$ (পি.এইচ-৮.৫) (নং ৪), ফ্রি অ্যাকটিভেটেড চারকোল (নং ৫), অ্যামোনিয়াম মলিবডেট (নং ৬), স্ট্যানাস ক্লোরাইড (নং ৭), ৩ নং কালার চার্ট এবং মেজারিং সিলিণ্ডার।

পদ্ধতি ঃ

(১) একটি দাগযুক্ত পরীক্ষার নলে নং ৪ রিএজেন্ট ১০ মিলি প্রথমে ঢালুন।

(২) এবার এই নলে ৫ গ্রাম মাটি ও ফ্রি অ্যাকটিভেটেড চারকোল (নং ৫) এক চিমটে ঢেলে নলের মুখ রবার কর্ক দিয়ে বন্ধ করে ৩ মিনিট ভালোভাবে ঝাঁকান।

(৩) নলের মিশ্রিত দ্রবণটি ফিল্টার পেপার দিয়ে ছেঁকে নিন।

(৪) এরপর আর একটি খালি দাগযুক্ত (দ্বিতীয়) পরীক্ষার নল নিন। এই নলে ফিল্টার পেপার দিয়ে ছাঁকা দ্রবণটি ২ মিলি দাগ পর্যন্ত ঢালুন। তারপর ৬ মিলি পরিশ্রুত জল যোগ করে নলের মুখ রবার কর্ক দিয়ে বন্ধ করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। জল ঢালার আগে ২ মিলি অ্যামোনিয়াম মলিবডেট (নং ৬) নলে ধীরে ধীরে ঢেলে নেবেন।

(৫) এবার কাজের জন্য ষ্ট্যানাস ক্লোরাইড দ্রবণ তৈরি করে নিতে হবে। এজন্য একটি ১০০ মিলি মাপের মেজারিং সিলিণ্ডারে ৬৬ মিলি দাগ পর্যন্ত পরিশ্রুত জল নিন। ঐ জলে ড্রপারের সাহায্যে ০.৫ মিলি ষ্ট্যানাস ক্লোরাইড (নং ৭) মেশালে কাজের দ্রবণ তৈরি হয়ে যাবে। এই দ্রবণ দিয়ে একদিনে বেশ কয়েকটি মাটির নমুনার গ্রহণযোগ্য ফসফেট মাপা সম্ভব।

(৬) ওপরে বর্ণিত দ্বিতীয় পরীক্ষার নলের মুখ থেকে রবার কর্ক খুলে এবার ১৫-২০ ফোঁটা ষ্ট্যানাস ক্লোরাইডের কাজের দ্রবণ ঢেলে ঐ নলের মুখ কর্ক দিয়ে আটকে আবার ঝাঁকিয়ে নিন।

(৭) এই ঝাঁকানোর পর দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে নলের মিশ্রণের রং নীল হয়ে গেছে। এই রং ৩নং কালার চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মাটিতে গ্রহণযোগ্য ফসফেটের পরিমাণ জানা যাবে।

(গ) মাটিতে গ্রহণযোগ্য পটাশিয়াম পরীক্ষার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ দাগযুক্ত পরীক্ষার নল, নর্মাল অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট (নং ১০), ইথাইল অ্যালকোহল (নং ১১), সোডিয়াম কোবালনাইট্রাইট দ্রবণ (নং ১২), ১নং কালার চার্ট।

পদ্ধতি ঃ

(১) একটি দাগযুক্ত পরীক্ষার নলে ১০ মিলি দাগ পর্যন্ত নর্মাল অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট (নং ১০) নিন প্রথমে।

(২) ঐ পরীক্ষার নলে ৫ গ্রাম মাটি ঢেলে রবার কর্ক দিয়ে মুখ বন্ধ করুন। তারপর এক মিনিট ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে মিশ্রণটি ভালোভাবে ছেঁকে নিন। এই ছাঁকা দ্রবণ পটাশিয়াম ও অ্যামোনিয়াকাল নাইট্রোজেন মাপার জন্য রেখে দিতে হবে।

(৩) এবার আর একটি (দ্বিতীয়) দাগযুক্ত পরীক্ষার নলে ২ মিলি দাগ পর্যন্ত ইথাইল অ্যালকোহল (নং ১১) নিতে হবে। এর সঙ্গে মিশিয়ে নিন ৬-৮ ফোঁটা তরল সোডিয়াম কেবালনাইট্রাইট (নং ১২)।

(৪) একটি সিরিঞ্জের সাহায্যে ওপরে লেখা ২নং পদ্ধতিতে তৈরি দ্রবণ ২ মিলি পর্যন্ত টেনে দ্রুত ৩নং পদ্ধতিতে বলা নলের মিশ্রণে ঢেলে দিন। ৫ মিনিট বাদে ৩ নং পদ্ধতিতে তৈরি তরল মিশ্রণে হলদে ঘোলাটে রং দেখা যাবে।

(৫) এবার ৪নং কালার চার্ট নিয়ে তরল ও মিশ্রিত দ্রবণটির মধ্যে দিয়ে তিনটি ঘন কালো, মাঝারি কালো ও হালকা কালো দাগ দেখার চেষ্টা করতে হবে।

যদি কোনও দাগ না দেখা যায় তবে পটাশিয়াম অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আছে বুঝতে হবে। পটাশিয়াম মাঝারি মানের আছে বোঝা যাবে, যদি ঘন কালো ও মাঝারি কালো দাগ দেখা যায় এবং হালকা দাগ দেখা না যায়। তিনটি দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে পটাশিয়াম কম পরিমাণে আছে।

(ঘ) মাটির অ্যামোনিয়াকাল ও নাইট্রেট নাইট্রোজেন পরীক্ষার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ দাগযুক্ত পরীক্ষার নল, পরিশ্রুত জল, নেসলার রিএজেন্ট (নং ১৪), অ্যামোনিয়াকাল নাইট্রোজেন নির্ণয়ের জন্য ৬নং কালার চার্ট, অম্ল ডাইফিনাইল অ্যামিন (নং ১৩), ৫ নং কালার চার্ট।

পদ্ধতি (অ্যামোনিয়াকাল নাইট্রোজেন) ঃ

(১) দাগযুক্ত পরীক্ষার নলে পটাশিয়াম নিষ্কাশন হয়ে যাওয়ার পর নিষ্কাশিত দ্রবণ ৪-৬ ফোঁটা নিতে হবে।

(২) ঐ নলে নেসলার রিএজেন্ট (নং ১৪) ২ ফোঁটা ঢেলে মিশিয়ে একটু পরিশ্রুত জল দিয়ে ৬নং কালার চার্টের সঙ্গে মেলাতে হবে।

পদ্ধতি (নাইট্রেট নাইট্রোজেন) ঃ

(১) একটি দাগযুক্ত পরীক্ষার নলে ১০ মিলি পর্যন্ত পরিশ্রুত জল নিয়ে ২ গ্রাম মাটি মিশিয়ে রবার কর্ক দিয়ে মুখ বন্ধ করে ৫ মিনিট ঝাঁকাতে হবে।

(২) এই মিশ্রণ ফিল্টার পেপারের সাহায্যে ছেঁকে নিলে দ্রবণে নাইট্রেট নাইট্রোজেন বেরিয়ে আসে।

(৩) এবার অন্য একটি (দ্বিতীয়) দাগযুক্ত পরীক্ষা নলে অম্ল ডাইফিনাইল অ্যামিন (নং ১৩) ৪-৫ ফোঁটা নিন। এর সঙ্গে আগে তৈরি জল ও মাটির দ্রবণ ২-৩ ফোঁটা মেশান। মেশাবার পর ২-৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর নীল রং দেখা যাবে।

(৪) ৫নং কালার চার্টের সঙ্গে এই নীল রং মিলিয়ে দেখলে নাইট্রেট নাইট্রোজেনের মাত্রা জানা যাবে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ মনে রাখবেন মাটিতে অ্যামোনিয়াম ও নাইট্রেটের পরিমাণ দ্রুত পরিবর্তন হয়। এ কারণে, ওপরের পদ্ধতিতে বের করা অ্যামোনিয়াম ও নাইট্রেট-এর মাত্রার পরিমাণ থেকে গাছের গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেনের মাত্রা জানা অসুবিধাজনক এবং চূড়ান্ত সঠিক পদ্ধতি নয়। পরিবর্তে জৈব কার্বন-এর পরিমাণ জেনে নিয়ে নাইট্রোজেনের সঠিক মাত্রা জানা সম্ভব। মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ কম হলে নাইট্রোজেনের উপস্থিতির মাত্রা কম এবং জৈব কার্বন বেশি হলে নাইট্রোজেনও মাটিতে বেশি পরিমাণে থাকে।

(ঙ) জৈব কার্বন পরীক্ষার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ দাগযুক্ত পরীক্ষার নল, পরিশ্রুত জল, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট (নং ১৫), সালফিউরিক অ্যাসিড (নং ১৬), ৭নং কালার চার্ট।

পদ্ধতি ঃ

(১) দাগযুক্ত পরীক্ষার নলে ৫ মিলি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট (নং ১৫) নিন।

(২) ঐ নলে ২ গ্রাম মাটির নমুনা ঢালুন।

(৩) এর পর নলে ৪ মিলি সালফিউরিক অ্যাসিড (নং ১৬) অতি সাবধানে ঢালুন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাড়াতে থাকুন।

(৪) নলে তৈরি দ্রবণটি ২০ মিনিট অন্ধকার জায়গায় রেখে দিন।

(৫) এভাবে প্রস্তুত দ্রবণের উপরিভাগের পরিষ্কার তরল অংশের রং ৭নং কালার চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে মাটির নমুনায় জৈব কার্বনের উপস্থিতির হার জেনে নিন।

১.৬ উর্বরতার ভিত্তিতে মাটিতে খাদ্যউপাদানের উপস্থিতি

উর্বরতার মাত্রা	জৈব কার্বন (%)	গ্রহণযোগ্য ফসফেট (কেজি/হেক্টর)	গ্রহণযোগ্য পটাশ (কেজি/হেক্টর)
বেশি	০.৭৫ বেশি ১.৫-এর বেশি (পার্বত্য এলাকায়)	৯০-এর বেশি	৩৪০-এর বেশি
মাঝারি	০.৫-০.৭৫ ০.৭৫-১.৫ (পার্বত্য এলাকায়)	৪৫-৯০	১৫০-৩৪০
কম	০.৫-এর কম ০.৭৫-এর কম (পার্বত্য এলাকায়)	৪৫-এর কম	১৫০-র কম

মাটির পি. এইচ-এর মাত্রা অনুযায়ী মাটির চরিত্র

মাটির পি. এইচ	মাটির চরিত্র
৫.৫-এর কম	অম্ল
৫.৫-৬.৫	সামান্য অম্ল
৬.৫-৭.৫	নিরপেক্ষ
৭.৫-৮.৫	ক্ষার ভাবাপন্ন
৮.৫-এর বেশি	ক্ষার

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ২ ❐ জৈব কৃষি

গঠন

২.১ জৈব কৃষি

২.২ নিবিড় চাষবাসে জৈব সারের পরিচর্যা

২.৩ জৈব চাষবাস—বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা

২.১ জৈব কৃষি

জৈব কৃষি হল এমন একটি কৃষি পদ্ধতি, যেখানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রাসায়নিক সার, রোগ-পোকা-আগাছা দমনের ওষুধ হরমোন বা গ্রোথ রেগুলেটরস, পশুখাদ্যে কৃত্রিমভাবে তৈরি সংযুক্তিকরণ দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এক কথায় 'জৈব কৃষি' বলতে কোনো প্রকার রাসায়নিক সার, রোগ-পোকা-আগাছা নাশক ইত্যাদি ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষবাসকে বোঝায়। ফলে, একে 'প্রাকৃতিক চাষবাস'ও বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে এলাকা ভিত্তিক ফসলের চাষ পদ্ধতি ও শস্য পর্যায় অনুসরণ করে ফসল উৎপাদন করার কথা বলা হচ্ছে। জৈবসার, জীবাণুসার, সবুজসার, জৈব রোগ, পোকা ও আগাছানাশক ওষুধপত্রের ব্যবহার ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে। সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে জৈব কৃষির সাহায্যে মাটির স্বাস্থ্য ভাল রেখে একই ধরনের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভালোভাবে বজায় রেখে ফসলের গুণমানযুক্ত ফলন এবং জৈব খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই চাষবাসের প্রধান সুফল হ'ল—পরিবেশ দূষণ কমানো, খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা, মাটির গঠন, গ্রথন ও ক্ষয় রোধ এবং উর্বরতা বৃদ্ধি, শক্তির অপচয় কমানো, উদ্ভিদ খাদ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা ইত্যাদি।

এই চাষ পদ্ধতিতে যতদূর সম্ভব শস্য পর্যায় অনুসরণ করে ফসলে আবর্জনা সার, প্রাণীজ সার, কম্পোষ্ট, শিম্বিগোত্রীয় ফসলের চাষ, সবুজ সার, চাষবাসের বহির্ভূত অন্যান্য জৈব সার এবং জৈব কৃষি বিষ ব্যবহার করে রোগ-পোকা-আগাছা দমন করতে হবে। এতে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে এবং কর্ষণ উপযোগী হবে। ফসলের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করা যাবে ও রোগ-পোকা-আগাছা তথা অন্যান্য ক্ষতিকর শত্রু দমন সম্ভব হবে।

ইতিহাস

রাসায়নিক কৃষি ছেড়ে দেশে বিদেশে আজকাল জৈবচাষ পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারণের কথা বলা হচ্ছে। চাষিদের কম খরচে উচ্চফলনশীল প্রযুক্তিতে, পরিবেশ দূষণরোধে এই চাষপদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন দেশে এই চাষবাস পদ্ধতিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হচ্ছে, যথা—জৈব কৃষি (Biological Farming), পুনর্জীবিকরণ কৃষি (Regenerative Farming), চিরায়ত চাষবাস (Sustainable Farming) ইত্যাদি।

ইউরোপীয় দেশগুলিতে একে জৈব চাষবাস বলা বেশি পছন্দ করছে। আমেরিকা এবং অন্যান্য উন্নত দেশে একে জৈব কৃষি বলা হচ্ছে। কেউ কেউ একে **বায়োডিনামিক কৃষি পদ্ধতি** (Biodynamic Farming) বলতে ভালোবাসেন। যেভাবেই বলা হোক না কেন, মোদ্দা কথা হ'ল—এই চাষবাসের দর্শন, কৃষিতে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি।

রুডল্‌ফ স্টেইনার, একজন অস্ট্রিয়ান দার্শনিক এবং এনথ্রপলজিস্ট এই 'বায়োডিনামিক' চাষবাসের জনক। আধুনিক জৈব চাষবাসের আন্দোলনের প্রধান জননী হলেন লেডি ইভ্ বালফোর, যাঁর জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। তিনি একজন ধনী ব্রিটিশ কন্যা। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল কৃষিতে।

১৯২০ এবং ১৯৩০ দশকে কৃষিতে গবেষণার ফসল স্বরূপ **"দি লিভিং সয়েল"** বইটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে 'দি সয়েল এ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। **'ব্রিটিশ অরগানিক ফার্মার্স'** এবং 'অরগানিক গ্রোয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন'—এই দুই সংগঠনের সঙ্গে **'দি সয়েল এ্যাসোসিয়েশন'** প্রভূত গবেষণা, উন্নয়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্বন্ধ গড়ে তোলে। এই সম্বন্ধ গড়ে ওঠে মাটি, গাছপালা, প্রাণীসম্পদ, মানুষ এবং বায়োস্ফিয়ারের সঙ্গে। উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যকর খাদ্য তৈরি এবং পরিবেশ সুরক্ষা প্রদান। গত শতাব্দীর আশি দশকের শেষভাগে আমেরিকায় প্রথম জৈবচাষ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়।

জৈব কৃষি এবং কৃষিবন

কৃষিবন বা 'এগ্রোফরেস্ট্রি' হ'ল জৈব কৃষির অন্যতম তোরণ। কৃষিবনের মাধ্যমে চিরায়ত জৈব কৃষির প্রকৃত পরিকাঠামো তৈরি সম্ভব। এতে উদ্ভিদ খাদ্যের চক্রাকার প্রধান কাজ জৈব চাষবাসে সম্ভব হবে। কৃষিবন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

তিনটি পদ্ধতিতে জৈব কৃষিকে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

(১) নির্দিষ্ট স্থানে এই পদ্ধতিতে প্রাণী বা গাছের উৎস থেকে সারের সংযুক্তিকরণ। একে 'ইনসিটু সার ব্যবহার' বলে। এতে প্রত্যক্ষভাবে সোজাসুজি মাটিতে গাছপালা বা প্রাণীসম্পদ থেকে জৈবসারের সংযোজন ঘটে।

(২) 'এক্সসিটু সার ব্যবহার' বা এক স্থান থেকে অন্যত্র জৈব সার এবং উদ্ভিদ খাদ্য নিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং চিরায়ত চাষবাস করা। এতে প্রাণীজ এবং গাছের বর্জ্যপদার্থ পচিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করে চাষবাস করা হয়।

(৩) উপরের দুটি পদ্ধতি ছাড়া শিম্বিগোত্রীয় ফসলের চাষ করে জৈব কৃষি করা যায়। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু শিম্বিগোত্রীয় ফসল বা গাছের শিকড়ে মুক্ত বায়ুমণ্ডলের বায়বীয় নাইট্রোজেন টেনে এনে শিকড়ের অর্বুদে জমা করে গাছকে খাদ্য জোগায়। পারস্পরিক মিথক্রিয়ায় এরা বেঁচে থাকে।

২.২ নিবিড় চাষবাসে জৈবসারের পরিচর্যা

বিগত ৬৫ বছরে ভারতের কৃষিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 'সবুজ বিপ্লব' প্রযুক্তিতে উচ্চফলনশীল জাত এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, সেচের সুবিধা এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ধান ও গমের ফলন বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতার জন্য সাময়িক সুফল প্রসারতা লাভ করেনি। দেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা নিবিড় শষ্যচাষ পদ্ধতিতে অবিরাম গবেষণা করে চলেছেন। মাটির উর্বরতা হ্রাসে এখন মাটির জৈব পদার্থ পরিচর্যা বিষয়ে বিজ্ঞানীরা কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে খাদ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। একই জমিতে তাই বাড়ছে বিভিন্ন ফসলে একাধিক চাষবাস। বহুমুখী শস্যচাষ পদ্ধতিতে এখন চাহিদা মাফিক পরিবর্তিত চাষ পদ্ধতির প্রচেষ্টা চলছে বিভিন্ন কৃষি জলবায়ুর এলাকায়। মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা বৃদ্ধিতে জৈবপদার্থের অবদান অপরিসীম। এখন তাই নিবিড় চাষবাসে প্রয়োজন জৈবসারের পরিচর্যা, মাটিতে জৈবসারের উপস্থিতি বজায় রাখা, জৈবসার প্রয়োগে মাটির ভৌত তথা রাসায়নিক ধর্ম রক্ষা করা এবং মালচিং, আচ্ছাদন ও অন্যান্য জৈব চাষ পদ্ধতির (ঢাকা শস্যের চাষ, কেঁচো সার, সবুজ সার প্রয়োগ ইত্যাদি) সাহায্যে এই পরিচর্যা করা এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। জমিতে উদ্ভিদ খাদ্য সংরক্ষণে এবং তার বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত বিভিন্ন জৈবসারের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। এতে নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসলের গুণমানযুক্ত উৎপাদন বাড়বে। এছাড়া সুষম সার ব্যবহারে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে জৈবসার ব্যবহার একান্ত জরুরি। জৈবসার ব্যবহারে মাটির গঠন, গ্রথন, জলধারণ ক্ষমতা, বাতাস চলাচল, অণুজীবীদের বৃদ্ধি খুব ভালো হয়।

যা করণীয়

(১) শস্যের অবশিষ্টাংশকে জমিতে চক্রাকারে ব্যবহার

সারা বছর ধরে কৃষকরা বিভিন্ন ফসল চাষ করে থাকেন। সেগুলির খড়, শিকড় ও অন্যান্য অবশিষ্টাংশকে ভালো করে মাটিতে মিশিয়ে বা পচিয়ে কম্পোষ্ট করে জমিতে প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা বাড়াতে হবে। প্রাচীনকাল থেকে এই প্রথা চলে আসছে। তবে আজকাল আমরা রাসায়নিক সার ব্যবহারে এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি যে, আগের মত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করি না। মাটির ক্ষয়ীভবন, খাদ্য উপাদান সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক তথা রাসায়নিক গঠনে জৈব পদার্থের অবদান যথেষ্ট। প্রতিটি ফসল চাষের পর তাই চক্রাকারে ফসলের বর্জ্য অবশিষ্টাংশকে মাটিতে ভালো করে মেশাতে হবে। সেচ এবং অসেচ এলাকায় এই কাজ নিয়মিতভাবে করতে হবে। সারা দেশে বিভিন্ন ফসলের এই অবশিষ্টাংশ প্রচুর পরিমাণে জমা হয়। এদের প্রকৃত পরিচর্যা করে জমিতে মিশিয়ে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা বৃদ্ধি এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে। এর ফলে মাটিতে কার্বন এবং নাইট্রোজেনের অনুপাত বৃদ্ধি পাবে, যা পরবর্তী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করবে।

সারা বছর জমিতে ফসলচাষের আগে কম্পোষ্ট সার ব্যবহারে মাটির কার্বন ঃ নাইট্রোজেনের অনুপাত বাড়ানো একান্তভাবেই আবশ্যক। এতে পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা ছাড়াও জমির গুণমান বৃদ্ধি পাবে এবং জৈব চাষবাসে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণমান উন্নত হবে। বিভিন্ন গবাদি পশুর গোবর, আখের ছিবড়া ও অন্যান্য ফসলের বর্জ্যপদার্থকে তাই চক্রবৎ জমিতে ভালোভাবে মেশাতে হবে।

(২) ভার্মিকম্পোষ্ট বা কেঁচো সার ব্যবহার

কেঁচো চাষি ও জমির বন্ধু এবং এরা জমিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ যুক্ত করে জমিকে উর্বরা করে তোলে। এরা প্রধান এবং অপ্রধান উদ্ভিদখাদ্য, ভিটামিন, বৃদ্ধিকারক হরমোন বা উৎসেচক এবং অণুজীবী বৃদ্ধি করে জমিকে উর্বর করে এবং শস্যের ফলন বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য পদার্থকে মিহি করে উন্নতমানের কেঁচো সার তৈরি করা সম্ভব। নিবিড় শস্য চাষে কেঁচো সার ব্যবহার করে উচ্চমূল্যযুক্ত উদ্যানজাত ফসলের চাষ করে কৃষকরা তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হবেন।

(৩) বিভিন্ন প্রকার শুঁটি বা শিম্বিজাতীয় ফসলের চাষ

শস্য পরিকল্পনায় অবশ্যই শিম্বিজাতীয় ফসলের চাষ রেখে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এদের শিকড়ে বিভিন্ন রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া বাতাস থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে অর্বুদ তৈরি করে এবং শিম্বিগোত্রের ফসলের চাষ করলে স্বভাবতই জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হয় এবং পরবর্তী ফসলচাষে উন্নত মানের ফলন বৃদ্ধি ঘটে। বারসিমকে গোখাদ্য হিসাবে চাষ করে মাটিতে নাইট্রোজেন উদ্ভিদখাদ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া ধৈঞ্চা, শন প্রভৃতি চাষ করে তাদের মূল ফসল চাষের আগে জমিতে মিশিয়ে দিলে জমি উর্বর হবে। পরবর্তী মূল ফসলের উৎপাদন বাড়বে।

(৪) শস্য পর্যায় বা শস্যক্রম, সাথী ফসলের চাষ, মিশ্রচাষ, মধ্যবর্তী ফসলের চাষ, পলি বা মাল্টি টায়ার ফসল চাষ পদ্ধতিতে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা

এইসব ফসল চাষে জীবাণু সার ব্যবহার খুবই উপকারী।

খামার পচা সার এবং কম্পোষ্ট সার ব্যবহারে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন আধুনিক সহজ পদ্ধতিতে এইসব জৈবসার খামারের একপাশে তৈরি করে নেওয়া যায় এবং সারা বছর মূল চাষের আগে তা ভাল করে জমিতে মেশান সম্ভব।

(৫) সুসংহত উদ্ভিদখাদ্য ব্যবহারে মাটিতে জৈবপদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা

এতে উদ্ভিদ খাদ্যের সুষম ব্যবহার বাড়ে। রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে তাই জমিতে প্রতি বছর ফসলচাষের আগে যথেষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের জৈব সার ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

(৬) যথাযথ কর্ষণের মাধ্যমে জমিতে জৈবপদার্থের সুরক্ষা এবং উদ্ভিদের ঠিকমতো খাদ্য আহরণ

শুখা তথা খরাপ্রবণ এলাকায় হাল্কা কর্ষণ বা বিনা কর্ষণে থুপি করে ফসলের চাষ খুবই উপকারী। এতে জমির রস এবং জৈব পদার্থ ভালোভাবে কাজে লাগে, সহজে নষ্ট হয় না।

উপসংহার

নিবিড় চাষবাসে মাটির অনবরত ক্ষয় হচ্ছে। অতি বর্ষণে উদ্ভিদখাদ্য নষ্ট হচ্ছে। বুহমূল্য মাটির সঞ্চিত রস নষ্ট হওয়ার ফলে মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্যপ্রাণের বিনাশ ঘটছে। সব মিলিয়ে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কমার ফলে চাষবাসের বিশাল ক্ষতি হচ্ছে। তাই মাটির জৈব পদার্থের প্রকৃত সংরক্ষণ, সংযোজন, চক্রাকারে ব্যবহার, বর্ষার আগে জমিতে হাল্কা কর্ষণ দেওয়া, জমির আল যথাসময়ে নির্মাণ করা, শিম্বিগোত্রীয় ফসল এবং গোখাদ্যের চাষ করা, এলাকাভিত্তিক বহুমূল্য আর্থিক ফসলের চাষবাস (সব্জি, ফল, বনজ গাছপালার চাষ ইত্যাদি) খুবই জরুরি।

ভবিষ্যৎ প্রয়োজনবোধে আমাদের মাটির পরিবেশ, বিশেষ করে নিবিড় চাষবাসে মাটির ভৌতিক এবং রাসায়নিক পরিবর্তন বিষয়ে অনুধাবন করে নিয়মিত চক্রাকারে জৈবসার প্রয়োগ, সবুজসার প্রয়োগ, কেঁচোসার প্রয়োগ প্রভৃতির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন প্রকার জৈবসার প্রয়োগে মাটির কার্বন এবং নাইট্রোজেনের অনুপাত বৃদ্ধি করতে হবে।

জৈবপদার্থ মাটিতে জমির খাদ্যপ্রাণ 'হিউমাস' গঠনে সাহায্য করে, মাটিকে উন্নত করে, বিভিন্ন উপকারী অণুজীবিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যথাসময়ে বীজবপন, চারারোপন, মালচিং বা খড় প্রভৃতির সাহায্যে মাটি ঢাকা দিয়ে মাটির রস সংরক্ষণ, সেচের জলের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি পরিচর্যার কাজগুলি করা দরকার। জীবাণুসার ব্যবহার করে এখন রাসায়নিক সার ব্যবহারের খরচ অনেকগুণ কমানো সম্ভব এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ নিয়ে কৃষকদের নিরন্তর উৎসাহ এবং প্রশিক্ষণের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই মাটির জৈবপদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং ফসলের উৎপাদন বাড়বে।

২.৩ জৈব চাষবাস—বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা

ফসল বৈচিত্রায়ন

ফসল বৈচিত্রায়ন—জৈব কৃষির এক অপরিহার্য অঙ্গ।

আধুনিক জৈব কৃষি দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো বহুল প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সূত্রের ওপর

ঐ সবক'টি সূত্রকে যদি ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে জৈব কৃষিতে অবশ্যই সাফল্য আসবে। এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে 'ফসলবৈচিত্রায়ন'।

বৈচিত্রপূর্ণ ফসলের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার জৈব কৃষির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। 'ফসলচক্র' এক্ষেত্রে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে। সাধারণত কৃষকেরা ফসল নির্বাচনে অর্থকরী ফসলগুলোকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে কারণ, তাদের ধারণা এর থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ ফেরৎ আসার সম্ভাবনা আছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় কিন্তু

এই ধারণা ভুল প্রমাণিত। তাই যে কোন ফসলচক্রে ফসল নির্বাচনের সময় **নিম্নোক্ত তথ্যগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন** করতে হবে ঃ

● যে কোন পরিবেশে/মাটিতে একই রকম প্রধান ফসল বারবার নয়। চার-পাঁচ বছরে একবার অন্তত ওই ফসল বাদ রেখে অন্য ফসল চাষ করা দরকার।

● ফসলচক্রে বছরে অন্তত একবার কোনও একটি শিম্বী গোত্রীয় ফসল চাষ করা হয় কারণ, এই ধরনের ফসলে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা থাকায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং তার ফলে পুষ্টি ব্যবস্থাপনায় সুবিধে হয়। এমনকী, এক্ষেত্রে পুষ্টি উপকরণ আলাদা প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ায় কৃষির খরচও কমে।

● ফসলচক্রে বিভিন্ন গোত্রের বৈচিত্রপূর্ণ ফসল নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলে ফসলে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গোত্রের ফসল নির্বাচন বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কমিয়ে দেয়। ফলে ফলন বৃদ্ধি হয় এবং রোগ-পোকা দমনের খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

● ফসল নির্বাচনে ফসলগুলির শিকড়ের জ্যামিতিক গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে ফসলের পুষ্টি ব্যবস্থাপনায় কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। মনে রাখা দরকার, বৈচিত্র্যপূর্ণ শেকড়ের গঠনের অর্থ হ'ল মাটিতে থাকা পুষ্টির সদ্ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা এবং সামগ্রিকভাবে পুষ্টি উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ কমানো। অন্য অর্থে, চাষের খরচ কমানো—যা এই মুহূর্তে কৃষি অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই বিশ্বাস।

● **বৈচিত্রপূর্ণ ফসলের ব্যবহারে শিকড় হতে নিঃসৃত রসও বৈচিত্রপূর্ণ হবে এবং মাটিতে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে। মাটিতে বসবাসকারী জীবাণু, ছোট বড় প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির বৈচিত্রায়নের** সামগ্রিক যোগফলে মাটিতে তৈরী হবে বৈচিত্রপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র এবং এতে উপকৃত হবে কৃষিই।

● জৈব কৃষিতে বিভিন্ন গোত্রের ফসল বা একই ফসলের বিভিন্ন জাতের সমন্বয়ে মিশ্র ফসলের চাষ খুবই উপকার সাধন করে। প্রয়োজনে আর্ন্তফসল ও সাথী ফসলের চাষকেও উৎসাহ দেওয়া দরকার। এই ধরনের বৈচিত্রময় ফসলের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানে ফলন বৃদ্ধির অবকাশ থাকে।

● কৃষিতে জলের সঠিক ব্যবহারের জন্যও বৈচিত্রপূর্ণ ফসলের নির্বাচন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বেশি জল লাগে এমন ফসলের পর কম জল লাগে ফসলের চাষ করা উচিত। যেমন, আলুর পর তিল অথবা কুমড়ো অথবা পাটের পর ফুলকপি কিংবা বাঁধাকপি কিংবা মূলো। মিশ্র চাষে সাথী ফসল দিয়ে জমি ঢেকে রাখতে পারলে রস সঞ্চিত হয় অর্থাৎ জলের সাশ্রয় হয়। যেমন, বাদামের সাথে ঢ্যাঁড়শ, ওলের সাথে বরবটি, তিলের সাথে মুগ ইত্যাদি।

● মাটিতে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং তাদের সক্রিয় রাখতে বৈচিত্রপূর্ণ ফসলের নির্বাচন

প্রয়োজন। কন্দ জাতীয় ফসল যথা কচু, ওল, মিষ্টি আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতি শস্য পর্যায়ে বা মিশ্র চাষে অন্তর্ভুক্ত করলে মাটিতে শেকড়ের চারপাশে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে।

● শস্য পর্যায় বা মিশ্র চাষে পাতা ঝরে যায় এমন ফসলের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঝরে যাওয়া পাতা মাটিতে জড়ো হয়ে পচে গেলে মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়ে, ফলে মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ঠিক একই কারণে সবুজ সারের ফসলের চাষ হওয়া দরকার। মাটি যদি এইভাবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হয় তাহলে উপকারী জীবাণু যেমন রাইজোবিয়াম, অ্যাজোটোব্যাকটার, আজোস্পিরিলাম, সিউডোমোনাস, ব্যাসিলাস ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যা ফসলের ফলন বাড়াতে দারুণভাবে সাহায্য করে।

● মিশ্র চাষে বৈচিত্রপূর্ণ ফসলের নির্বাচন অপকারী জীবাণু ও পোকার সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। বেগুনের সঙ্গে ভূট্টা বা জোয়ার চাষ করলে বেগুনের তুলসি রোগ কমে। টম্যাটোর সাথে বাদাম বা রেড়ি চাষে টম্যাটোর শেকড় ফোলা রোগ কমে। রজনীগন্ধার সাথে গাঁদা চাষে রজনীগন্ধার পুষ্পমঞ্জুরী কুঁকড়ে যাওয়া কমে।

● মিশ্র চাষে বৈচিত্রপূর্ণ বন্ধু ফসলের ব্যবহার ফলন বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন, শুঁটি জাতীয় ফসল প্রায় সব ফসলের সাথে লাগানো যায় (ব্যতিক্রম পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি)। এই তালিকায় থাকতে পারে ট্যমাটো, বেগুন ও লঙ্কা, তুলসি, পেঁয়াজ, ধনে পাতা ও গাঁদাফুল, কুমড়ো, শসা, বরবটি, মূলা।

● রাসায়নিক কৃষির ক্ষেত্রে ফসল ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি বহুলভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত। কিন্তু জৈব কৃষির ক্ষেত্রে কৃষকেরা অজ্ঞতার দরুন ফসল চক্রে ফসল নির্বাচন করতে বিভ্রান্তির শিকার হন। ইদানিং অবশ্য কিছু ফসলের ক্ষেত্রে জৈব চাষ পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রচার কৃষকদের সঠিক ফসল চক্র তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন, ধান চাষের ক্ষেত্রে সব্জী, তৈলবীজ, ডালশস্য কিংবা ঔষধি ফসলচক্রে ব্যবহার করা যায়। গম চাষে ধান, ভুট্টা, বাদাম ও ডালশস্যকে ফসলচক্রে ব্যবহার করা চলে। আলু চাষে ফসলচক্রে ব্যবহৃত ফসলগুলি হল ধান, তৈলবীজ ও ভুট্টা। বেগুনের একক ফসলে সীম অথবা ছোলাকে ফসলচক্রে ব্যবহার করা যায়। তবে, বেগুনের সাথে মিশ্র ফসল হিসাবে বরবটি, বীন, রসুন, ধনে এবং গাঁদার ব্যবহার ফসল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ৩ ❐ বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থা

গঠন

৩.১ জৈব কৃষি

৩.২ জৈব ও অজৈব কৃষির সমন্বয়ে কৃষি ব্যবস্থা

৩.৩ মিশ্র কৃষি

৩.১ জৈব কৃষি

এই কৃষি ব্যবস্থায় যে পদ্ধতিতে চাষবাস করা হয় তাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ থাকে না। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয় সব কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে। ফলে এ ধরনের কৃষিতে রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার একেবারেই হয় না। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, হরমোন, অ্যানটিবায়োটিকস জৈব কৃষিতে অচ্ছ্যুৎ।

৩.২ জৈব ও অজৈব কৃষির সমন্বয়ে কৃষি ব্যবস্থা

অজৈব কৃষি ব্যবস্থা জৈব পদার্থ ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে চাষবাসের পদ্ধতি এমন যে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, হরমোন, রাসায়নিক আগাছানাশক ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যে ফসলের উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়ে তোলা যায়। মাটির নিজস্ব উর্বরতা শক্তির বিকল্প এখানে রাসায়নিক সার। প্রাকৃতিক উপাদানের চেয়ে কৃত্রিম উপাদানের ওপর জোর দেওয়া হয় বেশি। মাটি, পরিবেশ ও প্রাণীজগতের কল্যাণের ব্যাপারটা না ভেবে এখানে শুধু গুরুত্ব পায় ফসলের অধিক উৎপাদন।

বর্তমানে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার দু'টি দিক আছে। প্রথমটি হচ্ছে, রাসায়নিক বস্তুর ওপর নির্ভরশীল চাষবাস। অন্যটি জৈব কৃষি। এই জৈব কৃষিতে একদল কৃষক আধুনিক পদ্ধতিতে জৈব চাষ করেন। আর একদল কৃষক, আর্থিক অক্ষমতার জন্য, আধুনিক জৈব চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন না। আবার ইচ্ছে থাকলেও পয়সা খরচ করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকও ব্যবহার করতে অসমর্থ হন।

জৈব ও বর্তমানে প্রচলিত রাসায়নিক বস্তুর ওপর নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থার ভালোমন্দ দু'টি দিকই আছে। তবে একথা ঠিক যে জৈব কৃষি সামগ্রিক বিচারে প্রাণীজগৎ ও পরিবেশের জন্য কল্যাণকর। অজৈব কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং চাষ থেকে আয়ের ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা সবসময় থাকে।

জৈব কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে অজৈব কৃষি ব্যবস্থার অপরিহার্য দিকগুলি একত্রিত করে সম্পূর্ণ সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব এখন বেড়ে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, এই ব্যবস্থাতেও জৈব কৃষির উপাদান ও পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এর জন্য সম্পূর্ণ সুস্থায়ী কৃষিতে একীকরণ করা হয়েছে, শস্যচাষ, পশুপালন, মৎস্যচাষ এবং বন তৈরি। এই একীকরণ কৃষকের হাতে থাকা সব উপদানের যথার্থ ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে।

৩.৩ মিশ্র কৃষি

মিশ্র কৃষি বা চাষ বলতে কোনও কৃষি খামারে উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিকল্পনামাফিক উর্বরতা বৃদ্ধি, শস্য ও উর্বরতা সংরক্ষণকারী শস্যের সঠিক অনুপাতে চাষ এবং শস্য ও গবাদিপশুর একত্রে চাষ ও উৎপাদনকে বোঝায়।

মিশ্রকৃষির মূল সুবিধা ঃ

(১) এই চাষ পদ্ধতিতে চাষী ও তাদের সংসারের অন্যান্য সদস্যরা অতিরিক্ত আর্থিক উপার্জনের সুযোগ পায়। শস্য চাষের পরে অতিরিক্ত অলস সময় তারা খামারের পশু-পাখির পরিচর্যায় ব্যয় করতে পারে। এতে গাছ ও প্রাণীদের একসাথে চাষ এবং পালন করা হয়।

(২) জমির উর্বরতা, অতিরিক্ত সার ব্যবহার, শিম্বিগোত্রীয় ও অন্যান্য গোখাদ্য ফসলের চাষে বৃদ্ধি পায়। শস্যপর্যায়ে শিম্বিগোত্রীয় শস্যচাষে বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন সহজেই মাটিতে বন্ধন হয় ও উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে গবাদিপশুর জন্য শস্যচাষে দুধ, ডিমের উৎপাদন প্রভৃতিও বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টির জল সযত্নে সংরক্ষিত হয়। অরণ্য নিজেই নিজের সার তৈরি করে।

(৩) নিবিড় কৃষি পদ্ধতিতে শস্য চাষে জমির ব্যবহার বাড়ে, ফসল বৃদ্ধি পায় এবং গবাদিপশু তথা চাষীর সংসারের প্রয়োজনীয় দানা, শাকসবজি খাদ্যের উৎপাদন ও চাহিদা মেটায়। মাটি সর্বদা বাড়তি উর্বরতা বহন করে।

(৪) কৃষির উপজাত দ্রব্যগুলি অধিকতর লাভে খামারের গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায় ও তাতে তারা অধিক পরিমাণে দুধ, মাংস, ডিম প্রভৃতি উৎপাদনে সক্ষম হয়। সুতরাং এতে চাষী পরিবার অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য পায় ও তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তখন তারা চাষের কাজে ভালভাবে শ্রমদান করতে পারে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ বর্জ্য পদার্থকে কার্যকরী পদ্ধতিতে জৈবসার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(৫) বর্ষাকালে খামারের জমিতে, আলের ধারে, পুকুরের পাড়ে স্থানীয় ঘাসের প্রাকৃতিক বৃদ্ধি খুব ভাল হয় এবং এতে খামারের গবাদিপশুর খাদ্যপ্রাপ্তি সহজ হয়।

(৬) অসময়ে যখন দানা শস্যের দাম কম থাকে, তখন চাষীদের জমিতে চাষের কাজও কম থাকে, এবং কম উৎপাদন হয়। শুষ্ক এলাকায় এই সময় গবাদিপশু পালনের থেকে চাষীরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

(৭) এই চাষ পদ্ধতিতে চাষীরা তাদের খামারে বিনা মূলধনে ও ব্যয়ে বলদটানা গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে আয় করতে পারে।

এইভাবে ভারতীয় চাষ পদ্ধতিতে পালানুযায়ী চাষ ও ফসল এবং গবাদিপশু চাষের সমন্বয় ঘটিয়ে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব। **এই মিশ্র চাষ ব্যবসাতে এদের একটি বা সবগুলি নিম্নলিখিত চাষ পদ্ধতিতে অনুসৃত হয়,** যেমন—

(১) উর্বরতা বৃদ্ধি ও উর্বরতা সংরক্ষণ করার জন্য শস্যের পর্যায়ক্রমিক চাষ, যথা—সবুজ সার, দানা ও শিম্বিগোত্রীয় গবাদিপশু খাদ্য হিসেবে চাষ।

(২) আর্থিকফসল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য চাষের সাথে শস্য পর্যায়ের মধ্যে মানুষের ব্যবহারের জন্য একটি শিম্বিগোত্রীয় দানা ফসলের চাষ।

(৩) কাটা এবং বহন পদ্ধতিতে একটি শিম্বিগোত্রীয় গোখাদ্য ফসলের চাষ। এগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে জমিতে গোবর ও গোমূত্র যোগানের বদলে ব্যবহার হবে।

(৪) শস্যচাষ এবং গবাদিপশুর চাষের সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়ে একই জমিতে ঘাস তথা শিম্বগোত্রীয় ফসলের সাথে খাদ্য ও আর্থিক ফসলের পর্যায়ক্রমিক চাষ, প্রভৃতি।

মডেল
ফসল-গবাদিপশু-হাঁসমুরগি পালন—মাছ
সমন্বিত সুসংহত খামার ব্যবস্থাপনা
(Management of Integrated Farming System)

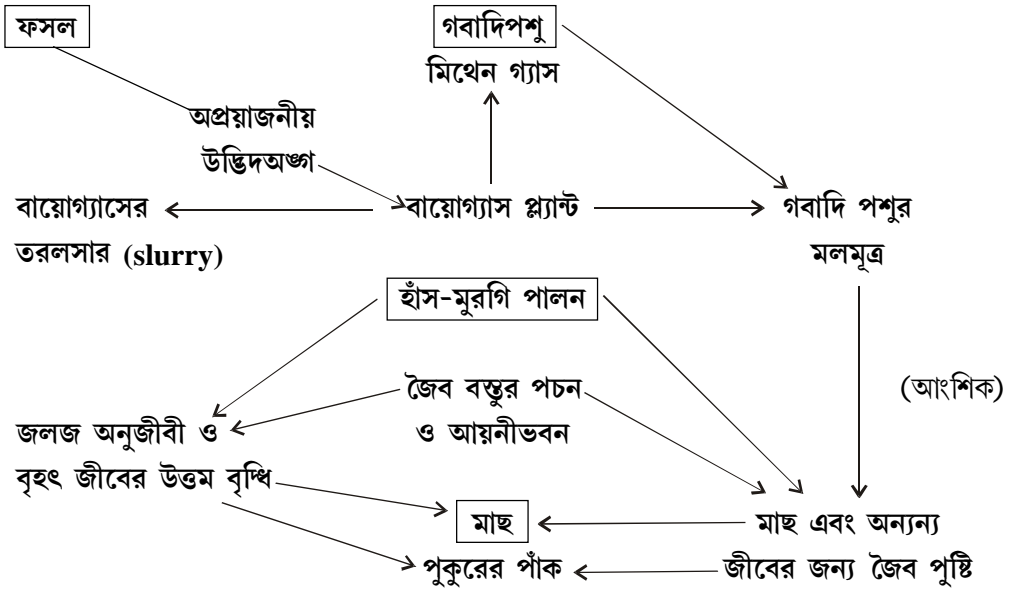

সার্বিক সুস্থায়ী উন্নয়নে মিশ্র চাষবাসের মাধ্যমে ফসল, গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন, মাছচাষ প্রভৃতি বিষয়গুলির সমন্বয়ে জৈব কৃষিব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে আমাদের পরিবেশবান্ধব চাষবাসের পথে এগোতেই হবে। এই ব্যবস্থাপনায় যেমন গোবরসার থেকে ফসল চাষে পুষ্টি জোগান দেওয়া সম্ভব হবে, তেমনি রোগ-পোকা-আগাছার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে, গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের ফলে রান্না এবং আলোর খরচে সাশ্রয় বাড়বে, বায়োগ্যাসের তরল সার মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেবে, মাছের জৈব পুষ্টি বাড়াবে এবং গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালনের মাধ্যমে জৈবসারের উৎপাদন বাড়বে।

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ৪ ❐ পৃথিবী জুড়ে জৈব কৃষির অগ্রগতির ইতিহাস

গঠন

৪.১ গোড়ার কথা

৪.২ স্ট্যাটাস বা সামাজিক পদমর্যাদা

৪.১ গোড়ার কথা

পৃথিবীকে কর্ষণ করে ফসল ফলানো এবং সে ফসল মানুষের, প্রধানত মানুষেরই কাজে লাগানো তথা তাদের গৃহপালিত পশুপাখীদের জন্য—এই চাষ পদ্ধতির বয়স খুব বেশি নয়, মাত্র দশ হাজার বছর। এক কথায় যতদিন মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে, এটা তার এক দশমাংশ মাত্র।

তার আগে মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রাহক। তাই বহুকাল কেটে গেছে কৃষিকে সমাজের অঙ্গ করে নিতে। অনেকদিন ধরেই খাদ্য উৎপাদক এবং সংগ্রাহকরা এই পৃথিবীতে পাশাপাশি বাস করেছে। এ নিয়ে বিস্তর লড়াই হয়েছে। কারণ পেটের খিদে বড় বালাই। তাই বোধ হয় ঈশ্বর আদম-ইভ্‌কে বলেছিলেন—'তোমরা ইডেন থেকে নির্বাসিত হলে ! যে ভূমি থেকে বিনা পরিশ্রমে খাচ্ছিলে, আজ থেকে সেখানে তোমাদের পরিশ্রম করে খেতে হবে।'

ইতিহাস ঘাঁটলে এই সার কথা উঠে আসে। ক্রমে কৃষিই হল ধনসৃষ্টির অন্যতম উপায়। ভারতবর্ষ এবং চিন, এই দু'টি রাষ্ট্র হচ্ছে জৈব কৃষির প্রধানতম দু'টি বৃহৎ দেশ। সময়কাল আশি শতাব্দী। সভ্যতার ক্রমবিকাশে তারপরেও যা ছিল জৈব কৃষি, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে তা পরিণত হ'ল রাসায়নিক কৃষিতে। আজ বিশ্বায়নের যুগে রাসায়নিক পদ্ধতির কৃষি অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের পরিবেশ হনন, মাটির স্বাস্থ্যহরণ, সার্বিক দূষণ, রোগব্যাধি এবং ক্ষুধার বিস্তার বেড়েই চলেছে।

এমতাবস্থায় জৈব চাষবাসের ব্যাপক প্রচলন অত্যন্ত জরুরি। দেশবিদেশে 'জৈব খামার' প্রস্তুতিকরণে কৃষি বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদরা মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের গবেষণা চলছে নিরন্তর। মাটির পুনর্বাসন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, মৃত্তিকা জীববিদ্যা এবং জৈব প্রকৌশলের গবেষণা আজ দিশা দেখাচ্ছে। প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি এবং বিকল্প কৃষি চর্চা জোরদার হচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

৪.২ স্ট্যাটাস বা সামাজিক পদমর্যাদা

ঐতিহাসিক পটভূমি

জৈব কৃষি শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, যখন কৃষকরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেই শুধুমাত্র চাষবাস শুরু করেন। প্রাচীন সাহিত্য এবং পুঁথিপত্র, যথা—ঋক্‌বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিতে বেশ কিছু জৈব কৃষি-উপকরণের উল্লেখ রয়েছে।

নীচে এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে জৈব কৃষির ঘটনাবলী তুলে ধরা হল ঃ

১. প্রাচীন সময়কাল

● **প্রাচীনতম পদ্ধতি ঃ** ১০,০০০ বছরের পুরাতন, নিওলিথিক যুগের ও আগে থেকে মেসোপটেমিয়া, হোওয়াং হো বেসিন ইত্যাদির প্রাচীন সভ্যতায় জৈব চাষবাস শুরু হয়।

● **রামায়ণ ঃ** মাটিতে সমস্ত মৃত পচা বস্তু, ও আবর্জনা মিশিয়ে মাটিকে উর্বর করে চাষবাস করার উল্লেখ আছে।

● **মহাভারত ঃ** (৫৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব) ঃ এখানে 'কামধেনু'র কথা বলা হয়েছে, যা হল পবিত্র গাভী এবং মানুষের জীবনে ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে যার প্রভাব রয়েছে।

● **কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র** (৩০০ খ্রিষ্টপূর্ব) ঃ এখানে অনেক জৈবসার যথা, বিভিন্ন তেলের খোল, প্রাণীর বিষ্ঠা মাটিতে প্রয়োগ করে চাষবাসের কথা বলা হয়েছে।

● **বৃহৎ সংহিতা** (বরাহমিহির দ্বারা রচিত) ঃ ঋক্‌বেদে জৈবসার (১,১৬১,১০, ২৫০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) ; অথর্ববেদে (১১,৮,৩, ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব) সবুজ সারের ব্যবহার ; শুক্র শাস্ত্রে (IV, V, ৯৪, ১০৭-১১২) গাছের স্বাস্থ্য বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে ছাগল, ভেড়া, গরু, জল এবং মাংস ব্যবহারের মাধ্যমে। সুরপলার 'বৃক্ষ আয়ুর্বেদ' শাস্ত্রে জৈব সার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে (অক্সফোর্ড, নং ৩২৪বি, ৬, ১০৭-১৬৪)

● **পবিত্র কোরান** (৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ফসলের ফলনোত্তর অবশিষ্টাংশ জমিতে ব্যবহার করে জৈব চাষবাসের কথা বলা হয়েছে।

২. বর্তমান সময়কাল

● **স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড** (১৯০০-১৯৪৭ সাল) ঃ এঁকে আধুনিক জৈবকৃষির (Organic Agriculture) 'জনক' বলা হয়। ইনি জৈব কম্পোস্ট পদ্ধতি (মাইকোরাইজাল ছত্রাক) উদ্ভাবন করেন পুসা, সমস্তিপুরে।

● **রুডল্‌ফ স্টেইমার** (১৯৯২) ঃ ইনি একজন জার্মান আধ্যাত্মিক দার্শনিক। জার্মানিতে 'বায়োডিনামিক' খামার তৈরি করেছেন।

● **জে. আই. রোডেল** (১৯৫০), আমেরিকা ঃ ইনি 'সুস্থিত কৃষি' এবং জৈব চাষপদ্ধতি জনপ্রিয় করেছেন।

● **IFOAM** (International Federation of Organic Agriculture Movement, 1972) : আন্তর্জাতিক জৈব কৃষি আন্দোলনের ফেডারেশন।

● **'একটি খড়ের বিপ্লব'** ঃ এই বইটির লেখক প্রখ্যাত জাপানী অণুজীবিবিজ্ঞানী এবং প্রকৃতিবিদ মাসানোবু ফুকোওকা (১৯৭৫ সালে বইটি প্রকাশিত হয়)।

● **EU Regulation** (১৯৯১ সাল) ঃ জৈব খাদ্যে EU Regulation।

● **Codex** (১৯৯৯ সাল) ঃ Codex Guideline on Organic Standard।

কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার এবং পরবর্তী পরিস্থিতি

আগেই বলেছি জৈব কৃষি মানব সভ্যতার আদি কৃষিকাজ। হাজার হাজার বছর ধরে জৈব কৃষি পদ্ধতি বংশ পরম্পরায় কৃষকরা অবলম্বন করে এসেছেন নিজেদের জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য। শিল্প বিপ্লবের পর এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা মেটাতে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার শুরু হয়। এই কাজে ১৯৪০ সালে প্রথম পথ প্রদর্শন করেন জার্মান রসায়নবিদ জুস্টাজ ভন লিবিগ। নাইট্রোজেন যে উদ্ভিদের অন্যতম জরুরি খাদ্যউপাদান এবং জৈবসারের পরিবর্তে 'মিনারেল সল্টস' বা ধাতব লবণ দিয়েও গাছের পুষ্টি বৃদ্ধি সম্ভব, এই বিজ্ঞানীই প্রথমে তা আবিষ্কার করেন। এজন্য লিবিগ সারা পৃথিবী জুড়ে আজও 'সার শিল্পের পিতা' হিসেবে অভিহিত হন। কিন্তু সেই সময় ওঁর ধারণা ছিল না, বিকল্প এই সার বা জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ? রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার কৃষিকাজে শুরু হয়েছে রাসায়নিক সার ব্যবহার প্রয়োগ আরম্ভ হওয়ার অনেক পরে।

চাষের কাজে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ শুরু হওয়ার পর, কয়েকবছরের মধ্যেই এর খারাপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করল। এর মোকাবিলা করতে ১৯০৫ সাল থেকে মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমাদের ভারতবর্ষে শুরু হয় জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার কাজ। তৎকালীন ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে এই কাজ অবিভক্ত বাংলাতেও হয়েছে। বছর পাঁচেক পরে চিন, কোরিয়া ও জাপানও জৈব কৃষিতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। জার্মানিতে কৃষকদের শেখানো হয়, জৈব কৃষিতে পশু খামার, ফসলের চাষ এবং চাষের ক্ষেতের মাটির স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ইংরেজিতে 'অর্গানিক ফার্মিং' শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, ইংল্যান্ডের লর্ড নর্থবর্ন। রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে চাষ বনাম জৈব চাষ নিয়ে উনি একটি বইও লিখেছিলেন ১৯৩৯ সালে। এই বছরই বিজ্ঞানীরা চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে জৈব কৃষির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে জৈব কৃষি নিয়ে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি বই লিখে কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

১৯৪৭ সালে ফ্রান্সের ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা ক্যানসার ও মানসিক ভারসাম্য হারানোর অসুখের বাড়াবাড়ির জন্য ফসলের চাষে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারকে অন্যতম কারণ হিসেবে মত প্রকাশ করেন। এই মত প্রকাশ পৃথিবীর সব দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমেরিকা ১৯৫০ সালে চিরায়ত কৃষি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করলেও, নিত্যনতুন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে কীভাবে ফসলের উৎপাদন আরও বাড়ানো যায় সেই প্রয়াসও চলেছে। বিজ্ঞানীরা ওদেশের নাগরিকদের তখন উৎসাহ দিতেন বাড়ির বাগানে শুধু জৈব পদার্থ ব্যবহার করে ফুল, ফল ও সবজি উৎপাদন করতে।

১৯৫৯ সালে ফ্রান্সে 'অ্যাসোসিয়েশন অব অর্গানিক ফার্মার্স ফ্রম দা ওয়েস্ট' গড়ে উঠেছিল। এর তিন বছর পর ১৯৬২তে প্রথম জানা গেল ডিডিটি ও অন্যান্য রাসায়নিক কীটনাশক কীভাবে পরিবেশের ক্ষতি করছে। শুরু হল, পৃথিবী জুড়ে দূষণ ও পরিবেশের ওপর তার কুপ্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য সমবেত প্রয়াস। গুরুত্ব বাড়তে লাগলো জৈব কৃষির। এই গুরুত্ব আরও বাড়াতে বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষদের বললেন, স্থানীয় খামারে উৎপাদিত খাবার খেতে। তখন একটা স্লোগান চালু হয়েছিল, 'Know your farmer, know your food'। অর্থাৎ, কোন কৃষক কীভাবে চাষ করে সেটা জানো, জেনে নাও কী খাবার খাচ্ছো।

জৈব কৃষি নিয়ে পৃথিবী জুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ ১৯৭২ সালে ফ্রান্সে গড়ে ওঠে 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অর্গানিক এগ্রিকালচার মুভমেন্ট', সংক্ষেপে IFOAM। এই সংস্থার প্রধান কাজ, বিশ্ব জুড়ে জৈব কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও চিন্তাভাবনার বিনিময়। ১৯৮০ সালে বিশ্বের অনেক দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে জৈব কৃষির উপকারিতা সম্পর্কে দৃঢ় জনমত গড়ে ওঠে এবং ওইসব দেশের সরকারের ওপর জৈব কৃষির দ্রুত প্রসারের জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। শুরু হয় জৈব কৃষির প্রসারের জন্য সরকারী আইন প্রণয়ন এবং 'সার্টিফিকেশন' বা জৈব কৃষিতে উৎপাদিত বস্তুকে শংসাপত্র দেওয়া।

সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটাতে ১৯৯০ সাল থেকে উন্নত দেশগুলির খুচরো বাজারে জৈব কৃষির উৎপাদিত পণ্য বিক্রী শুরু হয়। ক্রমে তা ছড়িয়ে যায় পৃথিবীর আরও অনেক দেশে। আমাদের দেশেও এটা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর।

জৈব কৃষি ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে প্রথম ধাপ ছিল, চাষবাসের পুরো কাজটাই স্থানীয় জৈব বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করা। পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাসায়নিক পদার্থের উপর নির্ভরতা কমানো। একই সঙ্গে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থের ব্যাপক প্রয়োগে মাটি ও পরিবেশের যে ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছিল তার পুনরুদ্ধার।

সেই ১৮৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে জৈব কৃষির স্বপক্ষে যত জোরালো আন্দোলন ও জনমত গড়ে উঠেছে, জৈব কৃষির প্রসার কিন্তু ততটা হয়নি। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত কৃষি জমির খুব সামান্যই আজ পর্যন্ত জৈব চাষের আওতায় আনা গেছে। সমগ্র কৃষি উৎপাদনের খুব অল্প শতাংশই জৈব কৃষির

অবদান। তবে এই চিত্রটা বর্তমানে খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে। এর কারণ, সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি। উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশেও এ কারণে জৈব কৃষির এলাকা বাড়ছে। জৈব চাষের সম্প্রসারণে ওইসব দেশের সরকারও এগিয়ে আসছে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে। কৃষকরা সরকারী ভর্তুকি পাচ্ছেন। বাজারে উৎপাদিত ফসল বিক্রী করে মিলছে বেশি দাম। এক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছেন আর্থিক বিচারে দুর্বল কৃষকরা যারা টাকার অভাবে অতীতে চাষে উৎপাদন বাড়াতে দামী রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার করতে পারেননি।

বিশ্বে জৈব চাষের এলাকা

২০০৪ সালে এক সমীক্ষায় জানা যায়, সারা বিশ্বে ১০০টি দেশে জৈব চাষবাস হচ্ছে ২,৪০,৭০০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে, যা মোট চাষের জমির মাত্র ১.৬০ শতাংশ এবং ৪,৬২,৪৭৫ জৈব খামারগুলিতে। অস্ট্রেলিয়াতে সবচাইতে বেশি জমিতে (প্রায় ১০ মিলিয়ন হেক্টর) ১৩৮০ সংখ্যক জৈব খামারে জৈবচাষ হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা (প্রায় ৩ মিলিয়ন হেক্টর), আমেরিকা (প্রায় ১ মিলিয়ন হেক্টর), ইউ. কে. (০.৭২৪৫ মিলিয়ন হেক্টর), জার্মানি (প্রায় ০.৭ মিলিয়ন হেক্টর), চিন (প্রায় ০.৩০ মিলিয়ন হেক্টর), জাপান (০.০০০৫ মিলিয়ন হেক্টর), দক্ষিণ আফ্রিকা (০.০০৪৫ মিলিয়ন হেক্টর), ভারত (০.০৩৭৩ মিলিয়ন হেক্টর), পাকিস্থান (০.০০০২ মিলিয়ন হেক্টর), শ্রীলঙ্কা (০.০০১৫ মিলিয়ন হেক্টর) প্রভৃতি দেশ মিলিয়ে ১০০টি দেশে জৈবচাষ হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়া (ওসিয়ানিয়াতে ৪২% বিশ্বের জৈবচাষ), ল্যাটিন আমেরিকা (২৪.২%) এবং ইউরোপে (২৩%) জৈবচাষ হচ্ছে। আফ্রিকাতে ৩,২০,০০০ হেক্টর জমিতে মোট ৭১ হাজার জৈব খামার গড়ে উঠেছে। সারা এশিয়াতে এখন জৈব চাষের এলাকা ৮,৮০,০০০ হেক্টর, যা মোট চাষের এলাকার ০.০৭%।

২০০৫ সালের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ২৬ মিলিয়ন হেক্টরের বেশি জমিতে জৈব পদ্ধতিতে চাষবাস হচ্ছে। সে তুলনায় ভারতে মাত্র মোট চাষের জমির ০.০৩% জমিতে ৫১৪৭টির বেশি জৈব খামার গড়ে উঠেছে। এই বৃদ্ধি ২০০৪ সালের তুলনায় মাত্র ১০ শতাংশ বেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ২০০৫ সালে জৈব কৃষি হয়েছে ১১.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আর্জেন্টিনা (২.৮ মিলিয়ন হেক্টর)।

ভারতে জৈব কৃষি

পশ্চাৎপট

ভারতে ১৯৫০ সাল থেকে মূলত জৈব কৃষির সূচনা, যদিও তারও অনেক আগে থেকেই ভারতীয় কৃষি ছিল প্রধানত জৈবচাষ ভিত্তিক। ভারতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা ঘটে মধ্য ষাটের দশকে এবং তারপর থেকে এদেশে কৃষি উৎপাদনের বিবর্তন ঘটে। এই কৃষিবিপ্লব ঘটেছিল প্রধানত সেচ এলাকায় উচ্চফলনশীল জাতের

গম ও ধান চাষের মাধ্যমে। রাসায়নিক সার এবং রোগপোকা দমনে রাসায়নিক কৃষি বিষের ব্যবহারও এসময় ভালমতো শুরু হয়।

১৯৫০-৫১ সালে সারা দেশে যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫০.৮২ মিলিয়ন টন, ২০০৩-০৪ সালে এই উৎপাদন ৪ গুণ হয়ে দাঁড়ায় ২১২.০৫ মিলিয়ন টনে। কিন্তু পরবর্তীকালে বেহিসাবী ও যথেচ্ছ পরিমাণে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহারে কৃষির দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদনে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিল। মাটির স্বাস্থ্যের অবনতি, মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ স্বাস্থ্যের অবনতি ও পরিবেশ-বান্ধব চাষবাসে ভীষণ সংকট দেখা দিল। জৈব চাষের মাধ্যমে সুস্থিত কৃষিই একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করল।

১৯০০ সালে উত্তর ভারতে 'ইন্দোর পদ্ধতিতে' বায়বিক কম্পোষ্ট তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার হয়। ১৯৩৪ সালে শুরু হয় ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতিতে অবায়বিক কম্পোষ্ট তৈরি। ১৯৮০ সালে এক বিজ্ঞানী নাদেপ (NADEP) কম্পোষ্ট তৈরি করেন। এইভাবে ভারতে জৈব কৃষির যাত্রা শুরু।

২০০০ সাল জৈব কৃষিতে ভারতে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই ২০০০ সালে নিম্নোক্ত চারটি প্রধান ঘটনা ঘটেছে ঃ

(১) ২০০০ সালে ভারতের যোজনা পর্ষদ কৃষিতে একটি স্টিয়ারিং গ্রুপ গঠন করে। এই কমিটিই জৈব কৃষিকে জাতীয় চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং সুপারিশ করে দশম পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসাবে যেন চিহ্নিত করা হয়। এই গ্রুপ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় এবং যেখানে এগ্রোকেমিক্যালস্ (সার, কৃষিবিষ, প্রভৃতি) ব্যবহার হয় না বা খুবই কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয়, সেসব অঞ্চলে জৈবচাষ করার সুপারিশ করে।

(২) দ্বিতীয় ঘটনা হল, ২০০০ সালে জাতীয় কৃষি পলিসি সুপারিশ করে 'কৃষিতে দেশজ জ্ঞানের সম্প্রসারণ' ঘটিয়ে জৈব কৃষি এবং তার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উন্নয়ন ঘটানোর জন্য।

৩) ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এন্ড কো-অপারেশন, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার ২০০০ সালে জৈব কৃষির উপর একটি 'টাস্ক ফোর্স', গঠন করে। এই টাস্ক ফোর্স সুপারিশ করে জৈব কৃষির সম্প্রসারণের জন্য।

৪) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এপ্রিল ২০০০ সালে 'জাতীয় জৈব প্রকল্পে'র ভিত্তি স্থাপন করে এবং এপিডা (APEDA–Agricultural Processed Food Products Export Development Authority), National Programme for Organic Production (NPOP) চালু করে। এই NPOP-এর অধীনে জাতীয় স্ট্যান্ডার্ডস্, এক্রিডিটেশন (criteria for accrediting inspection and certification agencies) শুরু হয়।

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ জৈব কৃষির সংজ্ঞা

৫.৩ কেন জৈব কৃষি

৫.৪ জৈব কৃষির উপকারিতা

৫.৫ প্রকৃত জৈব কৃষিব্যবস্থা রূপায়ণে সমস্যা

৫.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক চাষবাসে অত্যধিক বিষাক্ত রাসায়নিক রোগ, পোকা এবং আগাছানাশক ওষুধ তথা রাসায়নিক সার ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের কুফল দেখা দেওয়ায় বিজ্ঞানীরা কৃষকদের সাবধানতা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন। পরিবেশ-বান্ধব প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে জৈব চাষবাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন বেশি করে জোর দিতে।

মানুষ তথা পশুপাখির সুস্থ জীবনধারণে দূষণমুক্ত পরিবেশ খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকরা অনেক সময় বিশেষ কিছু না জেনেশুনে উচ্চফলনশীল চাষবাসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষাক্ত কীটনাশক, আগাছানাশক বা রোগনাশক দ্রব্যাদি এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকেন। ফলে সবারই ক্ষতি হয়।

এই পৃথিবীতে সবাইকেই সহাবস্থানের নীতি মেনে চলতে হবে, বাস করতে হবে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা বজায় রেখে। এটাই জীব-বৈচিত্র্য (biodiversity) তথা পরিবেশ-বান্ধব সহাবস্থান বা বাঁচার মূল মন্ত্র। চাই সবার সুস্থ জীবন এবং নিষ্কলুষ পরিবেশ, যেখানে সবার দূষণমুক্ত আবহাওয়ায় বাঁচার অধিকার রয়েছে।

৫.২ জৈব কৃষির সংজ্ঞা

প্রাকৃতিক বা জৈব কৃষি (Organic Farming) হল আসলে পরিবেশ-বান্ধব চাষবাস। অর্থাৎ, একই সুস্থ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে প্রাকৃতিক বা জৈব পদার্থ দিয়ে চাষবাস করে বিষাক্ত অবশিষ্টাংশ (Residual Toxicity) দূর করা। তার মানে এই নয় যে, রাসায়নিক ওষুধপত্র, সার ব্যবহার ইত্যাদি আধুনিক চাষবাসে নিষিদ্ধ। তবে যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। মাটিতে উপকারী অণুজীবী পদার্থ, চাষবাসের বন্ধু কেঁচোর বা কেঁচোসারের (Vermicompost) উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়া বিষাক্ত পদার্থের অবশিষ্টাংশ যাতে কোনোভাবেই মানুষ

এবং গবাদি পশুপাখির ক্ষতি না করে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাটির উর্বরতাশক্তি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে জৈব চাষবাসের ওপর আজ সবাইকে জোর দিতে হব।

ড. মাসানোবু ফকুওকাও, জাপানের প্রখ্যাত প্রাকৃতিক কৃষিবিজ্ঞানীকে জৈব চাষবাসের প্রকৃত জনক বলা চলে।

উনি বলেছেন, জৈব কৃষিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এতে চাষবাসের খরচ বহুল পরিমাণে কম হবে, রাসায়নিক সার এবং রোগপোকার ওষুধের কোনো খরচ লাগবে না, শূন্য কর্ষণ বা সামান্য কর্ষণে যথেষ্ট পরিমাণ জৈবসার ব্যবহারের সাহায্যে ফসলের চাষবাস করতে হবে। জৈবসার হিসাবে কম্পোস্ট, খামারের আবর্জনা পচা সার, শিম্বিগোত্রীয় সবুজ সার, হাড়গুঁড়ো, শিংকুচো প্রভৃতি ভালো করে মাটিতে মিশিয়ে ফসলের চাষ করলে ফলন একই হবে বলে তিনি বলেছেন। এ ছাড়া এই প্রাকৃতিক চাষবাসে জীবাণুসার এবং জৈব রোগপোকা দমনের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। এতে মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, মাটির মধ্যে উপকারী জীবাণু, যেগুলি মাটির মধ্যেকার জৈবসার থেকে উদ্ভিদের শিকড়ের কাছে খাদ্যকে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে সেগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

জৈব কৃষি ব্যবস্থায় উৎপন্ন 'জৈবখাদ্য' বাজারে অনেক দামে বিক্রি হয়। উৎপন্ন জৈবখাদ্য সমস্ত ধরনের দূষণ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর স্বাস্থ্য ভালো থাকতে সাহায্য করবে।

আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানীরা হাইটেক প্রযুক্তির কৃষিতে সুষম সার ব্যবহার, সুসংহত রোগপোকা দমন, সঠিক মাত্রায় উদ্ভিদখাদ্যের জোগান দিয়ে উচ্চফলনশীল বা সঙ্কর জাতের ফসল চাষবাসের কথা বলেছেন। এখন দরকার দেশজ জ্ঞানের সঙ্গে এই হাইটেক প্রযুক্তির মেলবন্ধন।

৫.৩ কেন জৈব কৃষি

যেহেতু প্রতিদিন লোকসংখ্যা বাড়ছে, বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফসলের সঙ্কর জাত সৃষ্টি করে চলেছেন এবং নিবিড় চাষবাসের পরিকল্পনা করে কৃষকদের কাছে তার সুফল পৌঁছে দিচ্ছেন। অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য স্বভাবতই এইসব ফসলের চাষে রাসায়নিক উপকরণও অনেক বেশি লাগছে। কিন্তু অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োগে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এতে মাটির স্বাস্থ্যহানি, মৃত্তিকাস্থিত উপকারী জীবাণুর বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ও বহুমূল্য ভূগর্ভের তথা সেচের জল দূষণ ছাড়াও জলের গুণাগুণ, খাদ্যের পুষ্টি ও স্বাদ নষ্ট হচ্ছে। মাটির মধ্যে বিভিন্ন সারের নাইট্রেটঘটিত দ্রব্যের বিষক্রিয়ায় শস্যহানি ঘটতে পারে। সমস্ত জীবজন্তু, মানুষ-বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যে বিষপ্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে বিষাক্ত ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহারে। নিষিদ্ধ ডিডিটি এবং হাইড্রোকার্বন আইসোমার ওষুধপত্রের সামান্যতম উপস্থিতিতে মাটি, দানাজাতীয় খাদ্য, ডালশস্য, শাকসবজি জাতীয় ফসল, ফলমূল, গোরু ও মোষের দুধ, ঘি, মাখন, মাছ, মাংস, গবাদি পশুর খাদ্য এবং বিচালি ও পানীয় জলে বিষক্রিয়া ঘটে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছর কৃষিতে ব্যবহার করা এইসব ক্ষতিকর ওষুধপত্রের বিষক্রিয়ায় প্রায় ৩০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ২০,০০০ লোক মারা যান। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বর্তমানে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার।

৫.৪ জৈব কৃষির উপকারিতা

জৈব কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মাটি, উদ্ভিদজগৎ, পশুপাখি, মানুষ, এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী এবং সব মিলিয়ে আমাদের এই গ্রহের পরিবেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। এই উন্নতি চিরায়ত থাকবে। মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকলে উৎপাদিত ফসল হবে স্বাস্থ্যকর। আর, এই ফসল থেকে তৈরি খাদ্য খেয়ে মানুষ ও পশুপাখির স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল না হলে, কোনও প্রাণীর স্বাস্থ্যই সুস্থ থাকে না।

জৈব কৃষি পরিবেশের পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক চক্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় বলে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরঞ্চ, প্রকৃতির সব মৌলিক ব্যাপারগুলি বজায় থাকে। এই কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন নির্ভর করে প্রকৃতির নিয়ম মেনে সব উপাদানের পুর্নব্যবহারের ওপর। ফলে প্রকৃতি যা দেয়, প্রকৃতিকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চাষের বিভিন্ন উপাদানের সংরক্ষণ হয়। জৈব চক্র অপরিবর্তিত থাকে।

জৈব কৃষি ব্যবস্থায় কৃষির সঙ্গে জড়িত সব কিছুই যথাযথ গুরুত্ব পায়। এ কারণে, জৈব কৃষির সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিপণন ও বিতরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। সবাই মিলে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্যেই জৈব কৃষি। এই ভালো শুধু মানুষের নয়। উদ্ভিদ, অন্যান্য প্রাণী, এমনকী প্রতিটি জীবাণুর ভালো করাই জৈব কৃষির উদ্দেশ্য।

জৈব কৃষি ব্যবস্থার রূপায়ণ একটি ধারাবাহিক কাজ। এতে কোনও বিরতির অবকাশ নেই। খুব সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এই কৃষিকাজ করা হয় বলে কৃষক বা ফসল বিক্রেতা বা উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতা, কেউ একাকীত্ব বোধ করে না। সমগ্র জৈব কৃষি ব্যবস্থায় একটা উঁচুস্তরের মূল্যবোধ থাকে।

জৈব কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে, কৃষককে কারুর ওপর নির্ভর করে চাষবাস করতে হয় না। ধরতে গেলে, সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণে এবং ইচ্ছাধীন থাকে।

৫.৫ প্রকৃত জৈব কৃষিব্যবস্থা রূপায়ণে সমস্যা

জৈব কৃষি ব্যবস্থা অনুযায়ী জৈব চাষে প্রথম সমস্যা বা বাধা হয়ে দাঁড়ায় জৈব চাষে উৎপাদিত ফসলের বেশি দাম। সাধারণ মানুষ বেশি দামে খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারে না। এ কারণে জৈব চাষে উৎপন্ন ফসলের বাজার সীমিত।

জৈব চাষে উৎপাদিত ফসলের দাম বেশি হওয়ার কারণ এই চাষে অনেক ক্ষেত্রে খরচ বেশি। রাসায়নিক

ব্যবহার করে চাষ করলে যে সংখ্যক কৃষিশ্রমিক লাগে, জৈব চাষে প্রয়োজন হয় তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। এই চাষে আগাছা নিয়ন্ত্রণ, রোগপোকা দমন এবং সার প্রয়োগের কাজে বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এছাড়া নিয়মিত নজরদারির কাজ তো আছেই।

জৈব কৃষির রূপায়ণ বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। এজন্য, কৃষককে ধৈর্য ধরে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে হয়।

প্রচলিত কৃষি পদ্ধতিতে অভ্যস্ত কৃষককে জৈব চাষের প্রযুক্তি ও পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এই কাজটা কঠিনও খুব। প্রচলিত কৃষি থেকে জৈব কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে করতে হয়। রাতারাতি হয় না। এই রূপান্তরের কাজে সঠিক পরামর্শ খুব জরুরি।

কোনও ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি বা পদ্ধতি একশো শতাংশ নিখুঁত হয় না। তবে জৈব কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার চেয়ে নিঃসন্দেহে উচ্চমানের। এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কৃষকদের সর্বাগ্রে অবহিত করতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে জৈব চাষে উৎপাদিত ফসলের গুণাগুণ সম্পর্কে জাগ্রত করতে হবে চেতনা। এই দু'টি কাজও সময়সাপেক্ষ।

পরিশেষে, এটা খেয়াল রাখতে হবে যে জৈব কৃষি ব্যবস্থায় চাহিদা অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন তাড়াতাড়ি বাড়ানো অসম্ভব।

গঠন

৬.১ গাছের খাদ্য উপাদানের নাম

৬.২ গাছের দেহ গঠন ও বৃদ্ধিতে বিভিন্ন খাদ্যউপাদানের কাজ

৬.১ গাছের খাদ্যউপাদানের নাম

যে কোনও প্রাণীর মতো বেঁচে থাকার জন্য গাছেরও খাদ্য দরকার। বাতাস, জল ও মাটি থেকে গাছ খাদ্য গ্রহণ করে। স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য গাছের মোট ষোলটি খাদ্যউপাদান দরকার হয়। এগুলি যথাক্রমে ঃ

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, বোরন, মলিবডিনাম এবং ক্লোরিন।

উপরোক্ত ষোলটি খাদ্যউপাদানের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গাছ বাতাস ও জল থেকে সংগ্রহ করে। বাদবাকি তেরোটি খাদ্যউপাদান নেয় মাটি থেকে।

গাছের প্রয়োজনের কম বেশি বিচার করে ষোলটি খাদ্যউপাদানকে মোট দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে পড়ে প্রধান খাদ্যউপাদানগুলি এবং দ্বিতীয় ভাগে অনু খাদ্যউপাদনগুলিকে রাখা হয়েছে।

প্রধান খাদ্যউপাদান ঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম।

এই খাদ্যউপাদানগুলি গাছের বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এ কারণে এগুলিকে বলা হয় প্রধান খাদ্যউপাদান। এগুলির মধ্যে গাছ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম।

অনু খাদ্যউপাদান ঃ আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, বোরন, মলিবডিনাম ও ক্লোরিন। এই সাতটি খাদ্যউপাদানও গাছের দেহগঠন ও ফল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলিকে গাছ মাটি থেকে নেয় খুব কম পরিমাণে। সেজন্য এগুলিকে বলা হয় অনু খাদ্যউপাদান।

৬.২ গাছের দেহ গঠন ও বৃদ্ধিতে বিভিন্ন খাদ্যউপাদানের কাজ

গাছের দেহ গঠন ও বৃদ্ধিতে ষোলটি খাদ্য উপাদানের প্রতিটিই সুনির্দিষ্ট কাজ করে। এ কারণে, গাছ কোনও খাদ্যউপাদান কম বা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে গাছের দেহ গঠন ও বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন খাদ্য উপাদান কী কাজ করে তা নীচে দেওয়া হল।

কার্বন ঃ গাছের দেহে জল এবং সূর্যের আলোর সাহায্যে শর্করা প্রস্তুতে সাহায্য করে। যে পদ্ধতিতে এই শর্করা প্রস্তুত হয় তার নাম সালোকসংশ্লেষ।

অক্সিজেন ঃ সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজন হয়।

হাইড্রোজেন ঃ গাছের দেহে বিভিন্ন জৈব উপাদান তৈরিতে সাহায্য করে।

নাইট্রোজেন ঃ গাছের পাতা ও কাণ্ডের সবুজ অংশ তৈরি ও কোষ বৃদ্ধির জন্য এই খাদ্যউপাদানটি খুবই দরকার। নাইট্রোজেন ছাড়া গাছের দেহ গঠন ও বৃদ্ধি অসম্ভব।

ফসফরাস ঃ গাছের দেহকোষ তৈরি এবং বেড়ে ওঠার জন্য এই খাদ্যউপাদানটির বিশেষ প্রয়োজন। শিকড়, ফুল, ফল ও বীজের জন্যেও এর দরকার। গাছের দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এই খাদ্যউপাদান দিয়ে তৈরি হয়।

পটাশিয়াম ঃ মাটি থেকে বিভিন্ন খাদ্যউপাদান নিয়ে গাছের দেহে যে খাদ্য তৈরি হয়, পটাশিয়াম তাতে সাহায্য করে। গাছের দেহের মধ্যে খাদ্য চলাচলের জন্যেও পটাশিয়াম দরকার। কাণ্ড ও দেহকোষের শক্তি বাড়িয়ে পটাশিয়াম গাছ লতিয়ে পড়া বন্ধ করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

সালফার (গন্ধক) ঃ গাছের শিকড় বৃদ্ধি এবং পাতা ও কাণ্ডের সবুজ অংশ তৈরিতে সাহায্য করে। শুঁটি জাতীয় ফসলের শিকড়ের গুটির মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেন ধরে রাখার জন্য সালফার খুবই প্রয়োজনীয়।

ক্যালসিয়াম ঃ গাছের দেহকোষ তৈরিতে দরকার হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শিকড়ের সুস্থ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ম্যাগনেসিয়াম ঃ গাছের সবুজ অংশ তৈরির কাজে লাগে। মাটি থেকে গাছের নাইট্রোজেন ও ফসফরাস গ্রহণ করা নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাতার সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা বাড়িয়ে এই খাদ্যউপাদান গাছের দেহে তেল জাতীয় পদার্থ তৈরিতে সাহায্য করে।

আয়রন (লোহা) ঃ গাছের পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য দরকার।

ম্যাঙ্গানিজ ঃ গাছের দেহের ভিতর বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংগঠিত হতে কাজে লাগে।

বোরন ঃ গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি ও চলাচলে সহায়তা করে।

জিঙ্ক (দস্তা) ঃ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ব্যবহারে সাহায্য করা ছাড়াও গাছের দেহে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তৈরির কাজে লাগে।

কপার (তামা) ঃ গাছের দেহে ভিটামিন-এ এবং আরো অনেক যৌগপদার্থ তৈরির জন্য দরকার হয়।

মলিবডিনাম ঃ নাইট্রোজেনের ব্যবহার এবং মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার কাজে লাগে। এছাড়া, গাছের দেহে বিভিন্ন যৌগপদার্থ তৈরিতেও প্রয়োজন।

ক্লোরিন ঃ গাছের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শর্করা ও অন্যান্য যৌগ পদার্থ তৈরিতে সাহায্য করে।

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ৭ ❑ মাটিতে জৈবসারের পচন ও পরিবর্তন

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ জৈব পদার্থ পচনে উৎপন্ন সরল দ্রব্যাদি

৭.৩ বিভিন্ন অণুখাদ্য ও অন্যান্য

৭.৪ মাটিতে জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেনের রূপান্তর

৭.৫ জৈব ফসফরাস এবং মাটিতে তার রূপান্তর

৭.৬ ভিটামিন্‌স, অক্সিনস এবং অ্যান্টিবায়োটিক্‌স

৭.১ উদ্দেশ্য

মাটিতে জৈবসার প্রয়োগের পর বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর দ্বারা এর পচন ঘটে এবং ধূসর থেকে কালো-ধূসর রঙের পদার্থ তৈরি হয়, যাকে মাটির হিউমাস বলা হয়। এতে হিউমিক এবং অ-হিউমিক দ্রব্যাদি থাকে। শেষ পরিণতি হিসাবে অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হলে নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম বা নাইট্রেট-নাইট্রোজেন হিসাবে গাছ গ্রহণ করে। মাটি একটি মিশ্র পদার্থ। এর জটিল খাদ্য সরবরাহের পদ্ধতি এবং জৈবিক উৎপাদনশীলতা অনেক। বিনা সার প্রয়োগে বিভিন্ন গাছপালা দীর্ঘ বছর ধরে বেঁচে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদ খাদ্যের ধারাবাহিক জোগান বজায় রয়েছে। মাটিতে পরিমিত জৈব পদার্থ থাকলে মাটির গঠন খুব ভাল থাকে। জৈব পদার্থই মাটিতে হিউমাস সৃষ্টি করে মাটির খাদ্য ভাণ্ডার তৈরি করে। চাষবাসে এই হিউমাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় উপাদান।

ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাক্টিনোমাইসিটিস প্রভৃতি মৃত্তিকাস্থ জীবাণু এইসব জৈব পদার্থকে আর্দ্র বিশ্লেষণ, জারণ, বিজারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে জৈব পদার্থের জটিল খাদ্যউপাদানকে সহজ সরল অজৈব লবণে পরিণত করে ও উদ্ভিদের সহজলভ্য অবস্থায় এনে দেয়। এর জন্য জীবাণুগুলি দেহের জারক রসকে জৈব অণুঘটকের কাজে ব্যবহার করে। অবাত ও সবাত ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সবাত ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই পচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

আগে জৈবসারের নাইট্রোজেনবিহীন অংশের মধ্যে শর্করা, স্টার্চ, লিগনিন, সেলুলোজ প্রভৃতি এইসব ব্যাকটেরিয়া ভাঙতে শুরু করে। এদের মধ্যে প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকে। অবশেষে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল তৈরি হয়। সালফার পদার্থগুলি আগে সালফার ডাই অক্সাইড, পরে সালফিউরিক

অ্যাসিড এবং ফসফরাসঘটিত পদার্থগুলি ফসফরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। এইসব পচনে বাতাসের প্রয়োজন খুবই দরকার। এইভাবে পচনের ফলে নানা প্রকার জৈব অম্ল প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদদেহে যেসব অজৈব লবণ থাকে, সেগুলি পচনের পরও সেই অবস্থায় থেকে যায়। এইভাবে মাটিতে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট প্রভৃতি বিভিন্ন অজৈব লবণ তৈরি হয়।

অক্সিজেনের অভাব হলে অবাত ব্যাকটেরিয়াও এই পচনে অংশ নেয় এবং এদের পচনক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। এদের দ্বারা পচন খুব ধীরে ধীরে হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল ছাড়া কতকগুলি দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন সায়ানেট, হাইড্রোজেন সালফাইড, ইন্ডোল অ্যাসিডের কথা।

দু'প্রকার ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থকে সহজ সরল অজৈব পদার্থে ভাঙতে সাহায্য করে—(১) হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া এবং (২) অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া। প্রথম ব্যাকটেরিয়াগুলি জৈব পদার্থ থেকে কার্বন ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাকটেরিয়া অজৈব পদার্থের জারণ থেকে তাদের শক্তি সঞ্চয় করে এবং কার্বন সঞ্চয় করে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকেও। এদের দ্বারাই গন্ধক ও সালফার জারিত হয়ে উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত হয়। প্রথম প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা সব থেকে বেশি।

সাধারণত মাটিতে জৈবসার বা জৈব পদার্থ প্রয়োগের পর নানা প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে তা পচতে শুরু করে। এইসব জীবাণু জৈব পদার্থের কার্বন ও নাইট্রোজেন গ্রহণ করে আগে তাদের শরীর পুষ্ট করে। পচনের আগে যে কোনো জৈব পদার্থের C : N অনুপাত সাধারণত ৮ : ১ হয়। পচনের শুরু থেকে ক্রমশ এই অনুপাত কমতে থাকে এবং শেষকালে ১০ : ১ বা ১২ : ১-এ দাঁড়ায়। জমিতে শস্য থাকাকালীন কাঁচা জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হলে সেই জৈব পদার্থের সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন সহজেই ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা শেষ হয়ে যায় এবং তারপর ব্যাকটেরিয়াগুলি মাটির নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে শুরু করে। এর ফলে উদ্ভিদ ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেনের জন্য একটি অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। এটা শস্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সেজন্য কখনোই শস্য মাঠে থাকা অবস্থায় কাঁচা গোবর বা অন্য কোনো প্রকার জৈব পদার্থ জমিতে ব্যবহার করা উচিত নয়। চাষের ১-২ মাস আগে মাটিতে মেশানো উচিত।

৭.২ জৈব পদার্থ পচনে উৎপন্ন সরল দ্রব্যাদি

যখন জমিতে জৈবসার প্রয়োগ করা হয়, তখন বিভিন্ন অণুজীবী তথা জীবাণুর জারক রসের পরিবর্তনে মাটির জৈব পদার্থের পচন শুরু হয় এবং উৎপন্ন সরল দ্রব্যাদি মুক্ত হয়। এইসব উৎপন্ন সরল দ্রব্যাদি হল ঃ

নাইট্রোজেন ঃ অ্যামোনিয়াম, নাইট্রাইট, নাইট্রেট, গ্যাসীয় নাইট্রোজেন। সাধারণত ১-৩ শতাংশ নাইট্রোজেন

উদ্ভিদ দেহে থাকে এবং সমস্ত প্রোটিনের ১৬-১৮ শতাংশ গঠনের জন্য নাইট্রোজেন প্রধান খাদ্য হিসেবে অপরিহার্য। গাছ অ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রেট, এই দু'ভাবে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

ফসফরাস ঃ সাধারণত গাছের দেহে ০.০৫-১.০০ শতাংশ ফসফরাস থাকে এবং নিউক্লিও প্রোটিন, ফাইটিন ও লেসিথিন গঠনে ফসফরাসের মত দ্বিতীয় উদ্ভিদ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। অম্ল বা ক্ষার জমিকে সংশোধন করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফসফেট সার প্রয়োগ করা হয়। গাছ তিনভাবে ফসফরাস গ্রহণ করে।

পটাশিয়াম ঃ গাছে ০.৩-৬.০ শতাংশ পটাশ লবণ হিসাবে উদ্ভিদকোষে থাকে এবং প্রধানত কার্বোহাইড্রেট তৈরি ও পরিবহনের কাজে সাহায্য করে। গাছ অযুক্ত পটাশিয়াম গ্রহণ করে।

সালফার ঃ উদ্ভিদ কোষে ০.০৫-১.৫ শতাংশ সালফার বা গন্ধক থাকে। তৈলজাতীয় ফসল পেঁয়াজ, রসুন, বাঁধাকপি, মূলা, শালগম, চিনাবাদাম, ছোলা ও আলফা আলফা পশুখাদ্যে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক থাকে। গাছ সালফাইট এবং সালফেট সালফার খাদ্যউপাদান হিসাবে গ্রহণ করে।

৭.৩ বিভিন্ন অণুখাদ্য ও অন্যান্য

ক্যালসিয়াম ঃ উদ্ভিদকোষে ০.১-৪.০ শতাংশ ক্যালসিয়াম থাকে। এই খাদ্য উপাদানটি অম্লত্ব দূর করে, শুঁটি জাতীয় ফসলের বৃদ্ধি ও ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্ষমতা বাড়ায়, গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ম্যাগনেসিয়াম ঃ সাধারণত ০.০৫-১.০ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম উদ্ভিদ কোষে থাকে। ক্লোরোফিল তৈরি ও ফসফরাস পরিবহনে মুখ্য কাজ করে।

লোহা ঃ উদ্ভিদকোষে ১০-১০০০ পি.পি.এম লোহা থাকে। নানা প্রকার জারণ-বিজারণ ক্রিয়াতে উদ্ভিদ দেহে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাতার ক্লোরোফিল গঠনে প্রয়োজন।

ম্যাঙ্গানিজ ঃ গাছের পাতায় ৫-৫০০ পি.পি.এম পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ যৌগ থাকে। জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া, ক্লোরোফিল গঠনে প্রয়োজন হয়।

তামা বা কপার ঃ এটি উৎসেচকের কাজ করে। গাছে ২-৫০ পি.পি.এম পরিমাণ তামা থাকে।

জিঙ্ক বা দস্তা ঃ এটি প্রধানত উৎসেচকের কাজ করে। গাছে ৫-১০০ পি.পি.এম পরিমাণ জিঙ্ক থাকে।

বোরণ বা সোহাগা ঃ প্রধানত উৎসেচকের কাজ করে। সাধারণত গাছে ২-৭৫ পি.পি.এম পরিমাণ বোরণ থাকে।

মলিবডিনাম ঃ উৎসেচকের কাজ করে। গাছে ০.১-১০ পি.পি.এম পরিমাণ থাকে।

ক্লোরিন ঃ এটি উদ্ভিদের একটি প্রয়োজনীয় অনুপোষক। উদ্ভিদদেহে ১০-২৫০ পি.পি.এম বা আরও বেশি পরিমাণ থাকে।

অন্যান্য সরল দ্রব্যাদি ঃ জল, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

নিয়মিত শস্য উৎপাদনে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, খাদ্যউপাদানগুলি গাছের প্রচুর পরিমাণ লাগে। জৈব পদার্থ একটি পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মাটিতে 'খাদ্যভাণ্ডার' গড়ে তোলে।

৭.৪ মাটিতে জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেনের রূপান্তর

মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগের পর তার নাইট্রোজেনঘটিত অংশ বা প্রোটিনজাতীয় পদার্থ বিভিন্ন বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানা প্রকারের নাইট্রোজেন যৌগে রূপান্তরিত হয়। নীচে এই বিক্রিয়ার পদ্ধতিগুলি দেওয়া হল।

(১) **অ্যামাইনিকরণ ঃ** জৈব পদার্থের প্রোটিন ভেঙে অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়াকে অ্যামাইনিকরণ বলে। হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরা প্রোটিনকে ভেঙে ক্রমে অধিকতর সরল পদার্থ অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে, যথা—

জৈব পদার্থের প্রোটিন অংশ → মেটাপ্রোটিন → প্রোটিয়োসিস → পেপটোন → পলিপেপ্টাইডস্ → পেপটাইড্স → অ্যামিনো অ্যাসিড ও অ্যামাইড জাতীয় পদার্থ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড + শক্তি (energy)। এই শক্তি হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে থাকে। এইভাবে প্রস্তুত অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করতে পারে অথবা অ্যামোনিয়ামঘটিত পদার্থে পরিণত হতে পারে।

(২) **অ্যামোনিয়াকরণ ঃ** এই প্রক্রিয়ায় মাটির ব্যাকটেরিয়া অ্যামাইনো নাইট্রোজেনকে আমোনিয়াম নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত করে। কতগুলি হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া এতে অংশগ্রহণ করে। প্রথমে অ্যামাইনো নাইট্রোজেন ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত জারক রসের দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই অ্যামোনিয়াম গ্যাস পরে কার্বনিক অম্লের সঙ্গে মিশে পরিণত হয় অ্যামোনিয়াম কার্বোনেটে।

মাটিতে জল, ক্ষার ও বাতাসের সুবিধা থাকলে এই প্রক্রিয়া খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। এইভাবে প্রস্তুত অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন মাটিতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, যথা—

(ক) যেসব ব্যাকটেরিয়া এতে অংশগ্রহণ করে, তারা এর বেশ কিছু অংশ গ্রহণ করে;

(খ) উদ্ভিদ ও শস্য প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, এবং

(গ) অবশিষ্ট অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনের কিছু অংশ নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়।

(৩) **নাইট্রিকরণ ঃ** বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়ার দেহ-নিঃসৃত জারক রসের দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রেট

নাইট্রোজেনে রূপান্তরকে নাইট্রিকরণ বলে। দু'টি স্তরে এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়। প্রথম, নাইট্রোসোমোনাস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন জারিত হয়ে নাইট্রাস অ্যাসিড বা নাইট্রাইটে রূপান্তরিত হয় এবং পরে দ্বিতীয় স্তরে, নাইট্রাসোকক্কাস বা নাইট্রোব্যাকটারের দ্বারা নাইট্রাস অ্যাসিড জারিত হয়ে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়।

এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত ব্যাকটেরিয়াকে নাইট্রোব্যাকটেরিয়া বলে। এরা অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া। মাটিতে প্রচুর বাতাস বা অক্সিজেন, তাপমাত্রা (৮০°-৯০° ফাঃ), সুষ্ঠু আর্দ্রতা এবং প্রচুর পরিমাণে চুন বা ক্ষারজাতীয় পদার্থের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। তাই অম্ল মাটিতে নাইট্রিকরণ ভালো হয় না। এ ছাড়া সোডিয়াম নাইট্রেট, ফসফেট ও পটাশ জাতীয় সার ও বিভিন্ন প্রকার লবণের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। মাটিতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকলে হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং মাটির নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। ফলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায় ও নাইট্রিকরণ প্রক্রিয়া ভালোভাবে হয় না। তাই এই পদ্ধতির জন্য C : N আনুপাতিক হার কম হওয়া দরকার।

(৪) **ডি-নাইট্রিকরণ ঃ** যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মাটির নাইট্রেট নাইট্রোজেন বিজারণ পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়, তাকে ডি-নাইট্রিকরণ বলে।

এই প্রক্রিয়ায় মাটির নাইট্রেট নাইট্রোজেন অবাত ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বিজারিত হয়ে বায়বীয় নাইট্রোজেন, গ্যাস অথবা অ্যামোনিয়া গ্যাস হয়ে মাটি থেকে উড়ে যায়। এইসব অবাত ব্যাকটেরিয়া মাটির নাইট্রেট থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে। এটি মাটির নাইট্রোজেনের একটি ক্ষয় হওয়ার পদ্ধতি।

যেসব এলাকার মাটিতে অক্সিজেনের অভাব থাকে, সেখানে এইভাবে মাটির নাইট্রোজেন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জলাজমিতে যেখানে বহুকাল জল দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে মাটিতে সাধারণত অক্সিজেনের অভাব থাকে এবং অবাত ব্যাকটেরিয়া সেইসব স্থানে এই প্রক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া শক্ত মাটিতে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না বলে এই পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন ক্ষয় হয়। তাই এই প্রক্রিয়া যাতে ঘটতে না পারে তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

মাটি হচ্ছে একটি বিশাল প্রাকৃতিক জৈবিক পরীক্ষাগার। জমির উর্বরতা বজায় রেখে চিরায়ত এবং সুস্থায়ী কৃষির জন্য দরকার জৈব কৃষি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ধীরে ধীরে এগুতে হবে সুসংহত উদ্ভিদখাদ্য ব্যবস্থাপনার দিকে। এই ব্যবস্থায় জৈবসার, প্রাণীজ সার, অজৈব সার, অণুখাদ্য এবং অন্যান্য সারের সুসম সংমিশ্রণ তাই এমনভাবে ঘটাতে হবে, যাতে দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় এবং ধীরে ধীরে কৃষি রসায়নের ভয়াবহ বিষক্রিয়া থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচানো যায়। সুসংহত উদ্ভিদখাদ্য ব্যবস্থাপনা তাই গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৫ জৈব ফসফরাস এবং মাটিতে তার রূপান্তর

বাস্তবে মাটি থেকে বেশির ভাগ দ্বিতীয় প্রধান উদ্ভিদখাদ্য ফসফরাস, মাঠে থাকা ফসল বৃদ্ধি দশায় গ্রহণ করে জৈবিক রূপান্তরিত ফর্মে। অধিকাংশ মাটিতে জৈব ফসফরাস যৌগগুলি অর্ধেক পরিমাণের বেশি সংরক্ষিত এবং আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দেখা গেছে, মাটিতে এই জৈব ফসফরাসের পরিমাণ ২৫-৮০ শতাংশ।

মাটির হিউমাসের মধ্যে এইসব যৌগ ফসফরাসের প্রকৃতি, গবেষণার ফলে দেখা গেছে, বেশির ভাগই ফাইটিন বা তার গৌণ পদার্থ হিসাবে থাকে। নিউক্লিক অম্ল হিসাবে এর পরিমাণ ০-১০ শতাংশ। এর সঙ্গে থাকে স্বল্প পরিমাণ ফসফোলিপিড্স। এইসব যৌগ পদার্থ মাটিতে জৈব ফসফরাসের অন্তঃকরণ। এ ছাড়া কিছু অংশ অজানা সংযোগ হিসাবে বর্তমান।

মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর জৈব ফসফরাস বাড়ে বা কমে। তাই মাটির নীচের অংশে এর পরিমাণ কম এবং উপরিভাগে পরিমাণ বেশি। উপরিভাগের মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই জৈব ফসফরাসের পরিমাণ ০.৩ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশ।

পরীক্ষিত ফলাফলে দেখা গেছে, মাটিতে বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ ব্যবহার করে উদ্ভিদের জন্য বেশি পরিমাণ ফসফরাস খাদ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। চূণা মাটিতে কার্বন ডাই অক্সাইড ফসফরাস সহজলভ্য করতে সাহায্য করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাটির পি. এইচ কার্বন ডাই অক্সাইডের উপর বিস্তৃত প্রভাব ফেলে। তবে অম্ল জমিতে (পি. এইচ ৬ এর নীচে) এবং ক্ষারীয় মাটিতে (পি. এইচ ৮-এর উপর) ফসফরাস আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, যেখানে গাছ এই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। মাটিতে ফসফরাসের দ্রবণীয় অবস্থা বাড়াতে হিউমাস নির্যাস ব্যবহার খুবই কার্যকরী। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণা করে যে সুফল পেয়েছেন, তা হল ঃ

(১) ফসফো-হিউমিক যৌগ তৈরি করে গাছের জন্য ফসফরাসের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;

(২) হিউমেট আয়ন দ্বারা ফসফেটের অ্যানায়ন প্রতিস্থাপন করে ফসফরাসের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, এবং

(৩) হিউমাস দ্বারা সেসকুই অক্সাইডের আবরণ দিয়ে একটা সংরক্ষিত আবরণ তৈরি করে মাটির ফসফেট আবদ্ধতার মাত্রা কমানো।

মাটিতে জৈব পদার্থের পচনের ফলে কতকগুলি জৈব অম্ল সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় যৌগ পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং এতে মাটির যৌগ ফসফরাস মাটিতে আবদ্ধ হয়, যা গাছ সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এইসব যৌগ আয়ন মাটির নিরপেক্ষ পি. এইচ (চুন ব্যবহারে) পরিস্থিতিতে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে।

এই রূপান্তর একটি জটিল পদ্ধতি। অম্ল এবং ক্ষার জমিতে সহজলভ্য ফসফরাস, লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের সাথে বন্ধনে যুক্ত হয়ে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে। তাই শস্যচাষের অন্তত এক মাস আগে গুঁড়ো চুন, জিপসাম বা বেসিক স্ল্যাগ প্রভৃতি দিয়ে মাটি সংশোধন করে নিলে গাছের শিকড় সহজে ফসফরাস গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। মাটির পি. এইচ ৬.৫ এর নীচে হলে ফসফেট, লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে আবদ্ধ হয়।

একারণে, গাছের শিকড়ের কাছাকাছি ফসফেট সার প্রয়োগ করতে হয়। জলে ফসফেট সার আংশিক দ্রবণীয়। জলের গভীরতা যত বাড়বে, ফসফরাস খাদ্যের সহজলভ্যতা ততই বাড়বে। ধান, পাট, আখ, তুলা, শাকসব্জি জাতীয় অধিকাংশ শস্যে সুপার ফসফেট একটি আদর্শ ফসফেট সার। চাপান হিসাবে এই সার ব্যবহার করা হয় না। গাছের শিকড়ের কাছাকাছি 'ব্যান্ড প্লেসমেন্ট' হিসাবে মাটির গভীরে এই সার ব্যবহার করতে হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মাটিতে মোট ফসফরাসের পরিমাণ ০.০৩-০.২৩ শতাংশ।

ফসল চাষের আগে জমি তৈরির সময় তাই যে কোনও জৈব সার ভালোভাবে মেশাতে হবে। অন্যান্য উদ্ভিদখাদ্য গাছ সহজেই গ্রহণ করতে মোটামুটি সক্ষম হয়। বিভিন্ন অণুজীবীদের সাহায্যে মাটির জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে মাটির খাদ্য ভাণ্ডার 'হিউমাস' গঠিত হয়। হিউমাস গঠন একটি যৌগিক জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতি। হিউমাস একটি অবয়বহীন যৌগিক জৈব পদার্থ এবং প্রতিরোধশীল ধূসর বা কালো-ধূসর মিশ্র পদার্থ, যা বিভিন্ন অণুজীবীদের দ্বারা জৈব পদার্থ থেকে মাটিতে খাদ্য ভাণ্ডার তৈরি করে এবং এর থেকে গাছ ধীরে ধীরে বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন পরিবেশের ওপর মাটির জৈব পদার্থের মান এবং কার্যকারিতা নির্ভর করে।

কুমারী মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ সাধারণত বেশ কয়েক বছরের চাষ করা জমির মাটির থেকে অনেকটাই বেশি হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিদ সংখ্যার বৃদ্ধিতে মাটির নাইট্রোজেন এবং জৈব পদার্থ ৫০০-১০০০ বছর ধরে স্থিতিশীল থাকে বলে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের অভিমত।

মাটির কর্ষণ এবং চাষ পদ্ধতির জৈব পদার্থের উপর প্রভাব নিম্নরূপ ঃ

- শস্যের গোড়া, সবুজসার, খামারজাত সার, বনজ গাছের ঝরা পাতা এবং চারণভূমির সফল প্রভাব রয়েছে।
- মাটির তাপমাত্রার সামান্য পরিবর্তন ঘটে।
- মাটির মধ্যে উন্নত গ্যাসীয় পরিবর্তন ঘটে।
- মাটিতে জল এবং উদ্ভিদ খাদ্যের বর্ধিত চলাচল ঘটে এবং গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।
- মাটির বিভিন্ন উপাদানের পুনর্বন্টন ঘটে, বিশেষ করে জৈব পদার্থ এবং বিভিন্ন অণুজীবীদের পরিসর বৃদ্ধি হয়।
- মাটির বালি এবং কাদাকণার সংমিশ্রণ হয়।

- মাটিতে সারের প্রয়োগ স্থান এবং চুন ও জৈব রসায়ন পদার্থের ব্যবহার খুব ভাল হয়।
- মাটি থেকে বিভিন্ন ফসলের আগাছা এবং বৃহত্তর মাটির প্রাণীকূল নিয়ন্ত্রিত হয়।
- মাটির উত্তম আচ্ছাদন বৃদ্ধি পায় (ধূলা বা ঢেলা হিসাবে)।
- বীজের উত্তম অঙ্গুরোদ্গমের উন্নতি ঘটে এবং তাদের শিকড় ভালভাবে নীচের দিকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে।

এইসব প্রতিটি কারণ মাটিতে উত্তম গুণমানের জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে তৈরি হতে সাহায্য করে।

সালফার বা গন্ধকের রূপান্তর

প্রকৃতিতে সালফার বা গন্ধকের চক্র নাইট্রোজেনের মত একই ধরনের। যখন মাটিতে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ বর্জ্য ব্যবহার করা হয়, সেগুলি অণুজীবিদের দ্বারা পচে এবং সালফারের অজৈব অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের বর্জ্য বিভিন্ন প্রকার সালফারঘটিত যৌগ মাটিতে উৎপন্ন করে। এদের মধ্যে প্রোটিন সব চাইতে প্রধান, যার মধ্যে সালফার অ্যামাইনো অম্ল, সিস্টিন, সিস্টেইন ও মেথিওনাইন, পেপটাইড গ্লুটাথিওন, গ্লুকোসাইড্স, অ্যালকালয়েডস, থিয়ামিন, বায়োটিন এবং অন্যান্য যৌগ থাকে। অধিকাংশ জৈব সালফার অসম্পূর্ণ অক্সিডাইজ্ড অজৈব পদার্থ হিসাবে মুক্তিলাভ করে, যথা সালফাইড, সালফার, থায়োসালফেট, টেট্রাথায়োনেট, এবং পেন্টাথায়োনেট। গাছ গ্রহণ করার আগেই এরা অক্সিডাইজ্ড হয়ে সালফেট হয়। কর্ষণযোগ্য মাটিতে অন্যান্য সালফেটের তুলনায় খুব সামান্য পরিমাণ অজৈব সালফার থাকে।

মাটির অণুজীবিরা এইসব জৈব সালফারের অজৈব পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। যদি জৈব পদার্থে কার্বন ঃ সালফারের অনুপাত ২০০-র নীচে থাকে, তাহলে সালফেট মাটিতে সঞ্চিত হয়। যখন এই অনুপাত ৪০০-র বেশি হয়, সালফেট মাটির জৈব পদার্থের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটায়। তাই কার্বন ঃ সালফার অনুপাতের হার ২০০-৪০০ এর মধ্যে হলে সালফেট মুক্ত হয়, কিংবা জৈব পদার্থের সঙ্গে আবদ্ধ হয়।

মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে, গাছের বৃদ্ধি, জৈব পদার্থ থেকে উদ্ভূত সালফারের মুক্তি ভাল ফল দেয়। গাছের শিকড়ে বিভিন্ন জারক রস মাটির জৈব পদার্থকে পচাতে সাহায্য করে। অণুজীবিরাও এই কাজে সাহায্য করে।

৭.৬ ভিটামিন্স, অক্সিনস এবং অ্যান্টিবায়োটিক্স

চাষের জমির মাটিতে শস্যের বর্জ্য থেকে বিভিন্ন ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এবং অক্সিন যুক্ত হয়। তাই জমিতে জৈব পদার্থ ব্যবহারের পর মাটিতে বিভিন্ন প্রকার উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মাটিতে অক্সিন উৎপাদনে সুফল পাওয়া যায়, যথা বীজের অঙ্কুরোদ্গম, গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি এবং বায়বীয় শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধির ফলে গুণমানযুক্ত ফসলের ফলন বাড়ে।

বেশির ভাগ উর্বর জমিতে ভিটামিন-বি এর পরিমাণ ভালই থাকে, যার ফলে মাটিতে অণুজীবিদের বৃদ্ধি সহায়ক হয়। উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজ জৈব সারের মাটিতে পচনের ফলে তাই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এর জন্য বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন এবং ভিটামিন অগ্রদূত মাটিতে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, যথা থিয়ামিন, থিয়াজোল, ফাইরিমিডিন্স, বায়োটিন, রিপোফ্লাভিন, ইনোসিটোল, পাইরিডক্সিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড, পি-অ্যামিনো বেনজোয়িক অ্যাসিড, ভিটামিন-বি১২ এবং অন্যান্য।

বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি, অক্সিন্স মাটিতে প্রায় ভিটামিনের সমপরিমাণ থাকে বলে প্রমাণিত হয়েছে। একটি বিশেষ মাটির অক্সিন (ইনডোল-৪ অ্যাসেটিক অ্যাসিড) মাটির অসংখ্য অণুজীবিদের দ্বারা সৃষ্ট, যা গাছের শিকড় ব্যবস্থা এবং বায়বীয় শাখাপ্রশাখার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং গাছের ফল পাকাতে সাহায্য করে।

কতগুলি নিম্ন মলিকিউলার ওজনের জৈব অম্লেও বৃদ্ধিকারক গুণাবলী রয়েছে। একারণে জৈবসার প্রয়োগে মাটিতে উৎপন্ন বিভিন্ন ভিটামিন এবং বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি, অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থের সাথে একসাথে মিলে মাটির ভৌত-রাসায়নিক অবস্থার উন্নয়ন হয়। এইসব যৌগের কিছু পদার্থ চিলেটিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং অন্যান্যরা ফাঙ্গিটক্সিক হিসাবে গাছের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ৮ ❑ উদ্ভিদের খাদ্যউপাদান গ্রহণ ও ব্যবহার

গঠন

৮.১ উদ্ভিদের খাদ্যউপাদান গ্রহণ

৮.২ মাটিতে জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেনের রূপান্তর

৮.৩ খাদ্যউপাদানগুলি কিরূপে গাছ গ্রহণ করে

৮.১ উদ্ভিদের খাদ্যউপাদান গ্রহণ

উদ্ভিদ আয়নিক ফর্মে খাদ্য গ্রহণ করে, সে জৈব বা অজৈব যাই হোক না কেন। জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করার পর জীবাণুর দ্বারা এর পচন ঘটে। পরিণতি হিসাবে অজৈব পদার্থে রূপান্তর ঘটে। এই অজৈব পদার্থের মধ্যে অন্যতম হল উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) বা নাইট্রেট (NO_3^-) বা নাইট্রোজেন।

ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য মাটির মধ্যে থাকা জীবাণু নানা জৈব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জটিল খাদ্যকে সহজ সরল অজৈব লবণে পরিণত করে। ফলে গাছ সহজেই অজৈব লবণ গ্রহণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুর দেহের জারক রস জৈব অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। অবাত ও স্ববাত ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্ববাত ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের সাহায্যে এই পচন ক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

প্রথমে জৈব সারে নাইট্রোজেন বাহিত অংশের মধ্যে শর্করা, স্টার্চ, লিগনিন, সেলুলোজ প্রভৃতিকে ব্যাকটেরিয়া ভাঙ্গতে শুরু করে। এই সব জৈব বস্তুর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকে যা দিয়ে অবশেষে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল তৈরি হয়। সালফার জাতীয় পদার্থগুলি আগে সালফার ডাই অক্সাইড, পরে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ফসফরাস ঘটিত পদার্থগুলি ফসফরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। এই সব পচনে বাতাসের প্রয়োজন খুবই জরুরি। এইভাবে পচনের ফলে নানা প্রকার জৈব অম্ল প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদদেহে যে সব অজৈব লবণ থাকে, সেগুলি পচনের পরেও সেই অবস্থায় থেকে যায়। এইভাবে মাটিতে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট প্রভৃতি বিভিন্ন অজৈব লবণ আসে।

অক্সিজেনের অভাবে অবাত ব্যাকটেরিয়াও এই পচনে অংশ নেয় এবং এদের পচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। এদের দ্বারা পচন খুব ধীরে ধীরে হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড, জল ছাড়া কতগুলি দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয়।

দু'প্রকার ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থকে সহজে অজৈব পদার্থে ভেঙ্গে দেয়। এরা হল (১) হেটারোট্রপিক

ব্যাকটেরিয়া ও (২) অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া। প্রথম প্রকারের ব্যাকটেরিয়াগুলি জৈব পদার্থ থেকে কার্বন ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাকটেরিয়াগুলি অজৈব পদার্থের জারণ থেকে তাদের শক্তি সঞ্চয় করে এবং কার্বন সঞ্চয় করে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকেও। এদের দ্বারাই গন্ধক ও সালফার জারিত হয়ে উদ্ভিদ খাদ্যে পরিণত হয়। মাটিতে প্রথম প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেশি।

সাধারণত মাটিতে জৈবসার বা জৈব পদার্থ প্রয়োগের পর নানা প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে তা পচতে শুরু করে। এইসব জীবাণু জৈব পদার্থের কার্বন ও নাইট্রোজেন গ্রহণ করে আগে তাদের শরীর পুষ্ট করে। পচনের আগে যে কোন জৈব পদার্থের কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত সাধারণত ৮ : ১ হয়। পচনের শুরু থেকে এই অনুপাত ক্রমশ কমতে থাকে এবং শেষকালে ১০ : ১ বা ১২ : ১-এ দাঁড়ায়। জমিতে ফসলের গাছ থাকাকালীন কাঁচা জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হলে সেই জৈব পদার্থের সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন সহজেই ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা শেষ হয়ে যায় ও তারপরে মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। এর ফলে উদ্ভিদ ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেনের জন্য একটি অসম প্রতিযোগিতার শুরু হয়। এটা শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেজন্য কখনই ফসল মাঠে থাকা অবস্থাতে কাঁচা গোবর বা অন্য কোনো প্রকার জৈব পদার্থ জমিতে ব্যবহার করা উচিত নয়। চাষের ১-২ মাস আগে মাটিতে মেশানো উচিত।

৮.২ মাটিতে জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেনের রূপান্তর

মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগের পর তার নাইট্রোজেনঘটিত অংশ বা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থেকে নানা প্রকারে নাইট্রোজেনের রূপান্তর ঘটে যথা--

(১) অ্যামাইনিকরণ ঃ জৈব পদার্থের প্রোটিন ভেঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়াকে অ্যামাইনিকরণ বলে। হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরা প্রোটিনকে ভেঙ্গে ক্রমে অধিকতর সরল পদার্থ অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

(২) অ্যামোনিয়াকরণ ঃ এই প্রক্রিয়ায় মাটির ব্যাকটেরিয়া অ্যামাইনো নাইট্রোজেনকে আমোনিয়াম নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত করে। কতগুলি হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া এতে অংশ গ্রহণ করে।

মাটিতে জল, ক্ষার ও বাতাসের সুবিধা থাকলে এই প্রক্রিয়া খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। এইভাবে প্রস্তুত অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন মাটিতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, যথা—

(ক) যেসব ব্যাকটেরিয়া এতে অংশগ্রহণ করে, তারা এর বেশ কিছু অংশ গ্রহণ করে।

(খ) উদ্ভিদ দেহ গঠনের জন্য প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, এবং

(গ) অবশিষ্ট অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনের কিছু অংশ নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়।

(৩) নাইট্রিকরণ ঃ অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন কতগুলি বিশেষ ব্যাকটেরিয়ার দেহ নিঃসৃত জারক রসের দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রেট নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়। একে নাইট্রিকরণ বলে। দুটি স্তরে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। প্রথমে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন জারিত হয়ে নাইট্রাস অ্যাসিড বা নাইট্রাইটে রূপান্তরিত হয় এবং পরে দ্বিতীয় স্তরে নাইট্রাস অ্যাসিড জারিত হয়ে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়।

এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত ব্যাকটেরিয়াকে নাইট্রোব্যাকটেরিয়া বলে। মাটিতে প্রচুর বাতাস বা অক্সিজেন, তাপমাত্রা (৮০°-৯০° ফাঃ), সুষ্ঠু আর্দ্রতা এবং প্রচুর পরিমাণে চুন বা ক্ষারজাতীয় পদার্থের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। অম্ল মাটিতে নাইট্রিকরণ ভালো হয় না। এ ছাড়া সোডিয়াম নাইট্রেট, ফসফেট ও পটাশ জাতীয় সার ও বিভিন্ন প্রকার লবণের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।

(৪) ডি-নাইট্রিকরণ ঃ যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মাটির নাইট্রেট নাইট্রোজেন বিজারণ পদ্ধতিতে (reduction process) অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়, তাকে ডি-নাইট্রিকরণ বলে।

মাটিতে ফসফেট সারের পরিণতি

ফসফেট সার মাটিতে প্রয়োগের পরে জলীয় দ্রবণে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় এলে গাছ তা গ্রহণ করে। নিষ্কাশন, ক্ষয়ীভবন ও খনিজভবন পদ্ধতিতে ফসফেট গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। ফসফেট আয়নিক ফর্মে উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়। কিছুটা আবদ্ধীভবন প্রক্রিয়ায় মাটিতে জমা থাকে। কিছুটা জীবাণু কর্তৃক গৃহীত হয়।

মাটিতে পটাশের পরিণতি

উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণী থেকে যে পটাশ সার জৈব সারের মাধ্যমে জলীয় দ্রবণে পটাশিয়াম আয়ন হিসাবে আসে তা গাছ গ্রহণ করে। কিছুটা চুঁইয়ে নষ্ট হয়, কিছুটা উদ্ভিদ অপ্রয়োজনেও নেয়। শিলা থেকে মাটির উৎপত্তি হয়েছে। খনিজ পদার্থে বর্তমান পটাশিয়াম মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে উদ্ভিদের শিকড়ের দ্বারা গৃহীত হয়। পটাশিয়ামের ঘনীভূত সঞ্চালন, ব্যাপক বিস্তার ও আয়নিক ফর্মে উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়। সার হিসাবে ব্যবহৃত পটাশ সেচ ও বৃষ্টির জলের মাধ্যমে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় বিনিময়যোগ্য পটাশ আয়ন হিসাবে গৃহীত হয়। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর জৈব পদার্থের মাধ্যমে পটাশিয়াম পরিবেশে আবর্তিত হয়।

৮.৩ খাদ্যউপাদানগুলি কিরূপে গাছ গ্রহণ করে

(১) ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানগুলির মধ্যে কার্বন ও অক্সিজেন গাছ সরাসরি বাতাস থেকে গ্রহণ করে এবং হাইড্রোজেন গ্রহণ করে জল থেকে। কার্বন অবশ্য কিছুটা গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকেও নিতে পারে। তবে তার পরিমাণ খুব কম। শস্য শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে জল আহরণ করে। পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বাতাসের কার্বনডাইঅক্সাইড গাছের ভেতর প্রবেশ করে। সূর্যালোকের শক্তির সাহায্যে ও সবুজ কণিকা

ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে জল ও কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে সংশ্লেষিত হয় কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার। গাছের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোকসংশ্লেষ।

(২) নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতি অন্য তেরোটি খাদ্যউপাদান উদ্ভিদ মাটির রস থেকে শিকড়ের মাধ্যমে আহরণ করে। খাদ্য উপাদানগুলি কি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য হবে, তা নির্ভর করছে উপাদানগুলি মাটির রসে কতটুকু দ্রবণীয় আছে তার ওপর। নানা জৈবিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যউপাদানগুলি জটিল রাসায়নিক রূপ থেকে উদ্ভিদের সহজলভ্যরূপে পরিবর্তিত হয় ধীর গতিতে। মাটিতে কোনও খাদ্যউপাদান পরিমাণে অধিক থাকলেও শস্যের গ্রহণযোগ্যরূপে খুব কম পরিমাণে থাকে।

(৩) বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিনিময় পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদের শিকড় মাটির রস থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে। শিকড় মাটির রস থেকে খাদ্যউপাদান নিজের কাছে আকর্ষণ করে এবং হাইড্রোজেন, হাইড্রোক্সিল, বাইকার্বোনেট প্রভৃতি আয়নের পরিবর্তে খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের শিকড়ের উপাদান আকর্ষণ ক্ষমতা বিভিন্ন।

পরবর্তী সারণী থেকে দেখা যাবে, উদ্ভিদ নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রেট রূপে গ্রহণ করতে পারে। ফসফরাস কতটা ফসল গ্রহণ করবে, তা অনেকটা নির্ভর করে মাটির অম্লত্ব-ক্ষারত্বের উপর। মাটির পি.এইচ স্বাভাবিক হলে ফসফরাস সহজলভ্য হয়। জমি বেশি অম্লভাবাপন্ন হলে ফসফরাস H_2PO_4 রূপে বেশি থাকবে। আয়রন, ম্যাঙ্গানীজ ও কপার দু'রূপে গ্রহণযোগ্য হয়। জলপ্লাবিত জমিতে বা যেখানে বায়ু চলাচল ব্যাহত হয়, সেখানে আয়রণ ফেরাস রূপে, ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানাস রূপে এবং কপার কিউপ্রাস রূপে থাকে। পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক প্রভৃতি শুধু একটি রূপেই গ্রহণযোগ্য হয়।

সারণি ঃ মাটির রসে খাদ্যউপাদানগুলির সহজলভ্য রূপ

খাদ্যউপাদান	জটিল অদ্রবণীয় রূপ	শস্যের গ্রহণযোগ্য রূপ
১) নাইট্রোজেন	প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রভৃতি	অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) নাইট্রেট (NO_3^-)
২) ফসফরাস	ফাইটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, ফসফোলিপিড প্রভৃতি জৈব রূপ, খনিজ অ্যাপেটাইট রূপ; আয়রন অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতির সঙ্গে আবদ্ধ ফসফেট	মনো হাইড্রোজেন ফসফেট (HPO_4), ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট ($H_2PO_4^-$)
৩) পটাশিয়াম	মাইকা, ফেল্ডসপার প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এবং ইলাইট জাতীয় কাদা কণা	পটাশিয়াম (K^+)
৪) ক্যালসিয়াম	ফেল্ডস্পার, হর্ণব্লেন্ড, ক্যালসাইট, ডলোমাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ	ক্যালসিয়াম (Ca^{++})

৫) ম্যাগনেসিয়াম	মাইকা, হর্ণব্লেন্ড, ডলোমাইট প্রভৃতি	ম্যাগনেসিয়াম (Mg^{++})
৬) সালফার	প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রভৃতি জৈবরূপ পাইরাইট, জিপসাম প্রভৃতি অজৈব রূপ	সালফাইট (SO_2^-), সালফাইট (SO_4^-)
৭) আয়রন	অক্সাইড, সালফাইড, সিলিকেট প্রভৃতি অজৈব যৌগ রূপ	ফেরাস (Fe^{++}), ফেরিক (Fe^{+++})
৮) ম্যাঙ্গানীজ	—	ম্যাঙ্গানাস্ (Mn^{++}), ম্যাঙ্গানিক্ (Mn^{+++})
৯) জিংক	—	জিংক (Zn^{++})
১০) কপার	সালফাইড, হাইড্রো কার্বনেট প্রভৃতি অজৈব যৌগ	কিউপ্রাস্ (Cu^+), কিউপ্রিক্ (Cu^{++})
১১) বোরন	বোরোসিলিকেট, বোরেট প্রভৃতি	বোরেট (BO_3^-)
১২) মলিবডিনাম	সালফাইড, মলিবডেট প্রভৃতি	মলিবডেট (MoO_4^-)
১৩) ক্লোরিন	ক্লোরাইড	ক্লোরাইড (Cl^-)

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ৯ ❑ জৈব ও রাসায়নিক সার দিয়ে ফসলের চাষে সুষম পুষ্টি প্রয়োগ

গঠন

৯.১ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ

৯.১ জৈব ও রাসায়নিক সার দিয়ে ফসলের সুষম পুষ্টি প্রয়োগ

ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাপে এবং (অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের তাগিদে উচ্চফলনশীল জাতের শস্যের চাষ, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ফসল চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে জৈব সারের প্রয়োগ অত্যন্ত কমেছে। ফলস্বরূপ জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

প্রতিকার হিসাবে পরিবেশবিদ এবং কৃষিবিজ্ঞানীগণ জৈব সারের উপর এবং জৈব চাষ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে বলছেন। কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বজায় রাখতে হলে এক্ষুনি রাসায়নিক সার বন্ধ করে সম্পূর্ণ জৈব চাষে পরিবর্তন সম্ভব নয়। যা সম্ভব, তা হল অধিক উৎপাদনশীল ফসলে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে সুষম পুষ্টির ব্যবস্থা করা এবং ধীরে ধীরে জৈব চাষের সম্প্রসারণ করা, যাতে অদূর ভবিষ্যতে ফসলের প্রয়োজনীয় উৎপাদন বজায় রেখে সম্পূর্ণ জৈব চাষে পরিবর্তন করা যায়।

মাটির উর্বরতা রক্ষায় জৈব সারের ভূমিকা ঃ

(১) জমির মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বৃদ্ধি করে। এতে মাটির গঠন ও গ্রথনের (structure and texture) উন্নতি হয়। উদ্ভিদ খাদ্যউপাদান (প্রধান ও অপ্রধান বা গৌণ এবং অণুখাদ্য) ধারণ ক্ষমতা জৈবসার প্রয়োগে বৃদ্ধি পায়। এতে মাটির হিউমার্স-এর পরিমাণ বৃদ্ধি সহ মাটির সূক্ষ্ম কণা বেঁধে রাখতে সাহায্য করে। এক কথায় জৈবসার মাটির খাদ্য ভাণ্ডার এবং প্রাণ স্বরূপ।

(২) মাটিতে জৈবসার প্রয়োগের পর তা জীবাণুর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। জৈব পদার্থের অন্তর্নিহিত তাপশক্তি ও খাদ্যকণার সন্ধানে বিভিন্ন জাতের অণুজীবী অনুকূল পরিবেশে একে ভাঙতে থাকে—

($C_{16}H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + energy বা শক্তি)

ভাঙার পর এই তাপশক্তি এবং খাদ্যকণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে। তখন মাটি এই বিশাল কর্মকাণ্ডের এক কারখানায় রূপান্তরিত হয়। মাটির জৈব এবং অজৈব প্রক্রিয়াগুলি এতে গতি পায়। ফলে মাটি প্রাণবন্ত ও উর্বর হয়।

(৩) জৈবসার মাটিতে '**জৈবযৌগ**' (Organic compound) '**হিউমাস**' (humus) বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই **হিউমাস হল মাটির খাদ্যভাণ্ডার** (Storehouse of food in soil)। জৈব পদার্থের যে অংশ ভঙ্গুর নয়, তার সঙ্গে বিশ্লেষণ ঘটে জীবাণুরাশির দেহাবশেষের। এতেই তৈরি হয় এই নতুন জৈবযৌগ '**হিউমাস**'।

এই হিউমাসের কার্বন যৌগকণা অনেক বেশি খাদ্যকণা ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। এই খাদ্য ফসলের শিকড়কে জোগান দেয়। মাটিতে জল পেলে ফুলে ওঠে। এইজন্য জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি বেশি মাত্রায় জলধারণ করার ক্ষমতা রাখে।

(৪) মাটির মধ্যে আবদ্ধ ও অদ্রবণীয় খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য, জৈবসার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া চলাকালীন নির্গত জৈব রসায়ন মাটির এইসব আবদ্ধ ও অদ্রবণীয় ফসফেট ও অণুখাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

সুতরাং জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে। অধিক ফলনশীল ফসল চাষ করতে গেলে প্রয়োজন, জৈব ও রাসায়নিক সারের সমন্বয় ঘটিয়ে মাটিতে অবস্থিত উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ যাচাই করে (মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে) প্রয়োজন ভিত্তিক সার প্রয়োগ করা।

রাসায়নিক ও জৈব সারের অনুপাত হবে ২৪:১১ (পুষ্টির অনুপাত)। মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ মাটিতে অবস্থিত ফসলের প্রধান খাদ্যোপাদান নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশিয়াম-এর পরিমাণ নির্ণয় করে, প্রত্যেকটিকে ছয়টি মানে ভাগ করে তাদের উর্বরতার মান নির্ধারণ করা হয় ঃ

সারণি-১

প্রধান খাদ্য উপাদানের মাটির উর্বরতার মান

মাটির উর্বরতার মান	জৈব কার্বন (%)	গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন (কেজি হেক্টর প্রতি)	গ্রহণযোগ্য ফসফরাস (কেজি হেক্টর প্রতি)	গ্রহণযোগ্য পটাশিয়াম (কেজি হেক্টর প্রতি)
অতি উচ্চ	>১.০০	>৭০০	>৫০	>৩০০
উচ্চ	০.৮১-০.৬০	৫৬১-৭০০	৪১-৫০	২৫১-৩০০
মধ্যম	০.৬১-০.৮০	৪২১-৫৬০	৩১-৪০	২০১-২৫০
মধ্যনিম্ন	০.৪১-০.৬০	২৮১-৪২০	২১-৩০	২৫১-২০০
নিম্ন	০.২১-০.৪০	১৪১-২৮০	১১-২০	১০১-১৫০
অতিনিম্ন	<০.২০	<১৪০	<১০	<১০০

মাটি পরীক্ষার দ্বারা প্রত্যেকটি খাদ্যউপাদানের নির্দিষ্ট উর্বরতার মান জেনে

নিম্নোক্ত ফরমুলার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। যেমন ঃ

কোনও খাদ্যউপাদান × মান (কেজি প্রতি) = সেই সারের পরিমাণ

নাইট্রোজেন × ২.১৭ = ইউরিয়া

ফসফেট × ৬.২৫ = সিঙ্গল সুপার ফসফেট

পটাশিয়াম × ১.৬৭ = মিউরেট অফ্ পটাশ

নির্দিষ্ট জমিতে সার প্রয়োগের পরিমাণ ঠিক হলে প্রয়োগ পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। মোটামুটি নিয়ম হল ঃ

১। জৈব সার সবটা প্রথম চাষে জমির মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

২। নাইট্রোজেন ঘটিত সারের $^{১}/_{৪}$ ভাগ জমি তৈরীর সময়, $^{১}/_{২}$ ভাগ প্রথম চাপানে এবং $^{১}/_{৪}$ ভাগ দ্বিতীয় চাপানে প্রয়োগ।

৩। ফসফেট সারের সবটাই জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ।

৪। পটাশ সারের $^{২}/_{৩}$ অংশ জমি তৈরীর সময় এবং $^{১}/_{৩}$ অংশ দ্বিতীয় চাপান হিসাবে।

সুষম পুষ্টি প্রয়োগের জন্য জমিতে রাসায়নিক সার অনেকভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ভর করে কোন ফসলের চাষ হবে তার ওপর। খালি জমিতে বীজ বোনা বা চারা রোয়ার আগে সার ছড়ানো ছাড়াও প্রতিটি গাছের গোড়ায় আলাদা করে রাসায়নিক সার দেওয়া যায়। ফল ও সবজি চাষে, যেখানে দু'টি গাছের মধ্যে দূরত্ব বেশি থাকে, সেখানে সার ছড়ানো অপেক্ষা গাছের গোড়ায় বা গাছের দুই সারির মধ্যে অথবা নালীতে দেওয়া বেশি লাভজনক। এই পদ্ধতিতে অল্প পরিমাণে সার জমিতে সমান ভাবে দেওয়া যায় এবং সারের অপচয় হয় কম। জমিতে আগাছার বৃদ্ধি কম হয় এবং গাছের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে। সার মারফত প্রয়োগ করা খাদ্যউপাদানগুলি মাটিতে কম পরিমাণে আবদ্ধ হয়। সব মিলিয়ে এভাবে সার প্রয়োগ করলে সারের অপচয় কম হয় এবং ফসলের ফলন বেশি হয়।

ধান, পাট প্রভৃতি ফসলের চাষে চাপানে নাইট্রোজেন সার দেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে সার জমিতে সরাসরি না ছড়িয়ে জলে গুলে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হয়। এভাবে প্রয়োগের জন্য নাইট্রোজেন সার হিসেবে ইউরিয়াই সবচেয়ে উপযোগী। নাইট্রোজেন সার ছাড়াও অনুখাদ্য যুক্ত সারগুলিও এভাবে ছড়ানো যায়। এভাবে সার দিলে কম সারে বেশি জমিতে চাপান দেওয়া সম্ভব, সারের খরচ কমে এবং কার্যকারিতা বাড়ে।

নাইট্রোজেন সার হিসেবে চাপানে ইউরিয়া জমিতে প্রয়োগের আগে ৫-১০ গুণ বেশি ভেজা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ২-৩ দিন ছায়ায় রেখে তারপর জমিতে ছড়ান। এতে ইউরিয়া প্রয়োগ বেশি ফলদায়ক হবে।

সারণি-২

জৈব ও অজৈব সার থেকে ফসলের প্রধান খাদ্যউপাদান ব্যবহারের সুপারিশ

ফসল ঃ উচ্চ ফলনশীল বোরো, গম, হাইব্রিড ভূট্টা

মাটির উর্বরতার মান	নাইট্রোজেন (কেজি হেক্টর প্রতি)	ফসফরাস (কেজি হেক্টর প্রতি)	পটাশিয়াম (কেজি হেক্টর প্রতি)
অতি নিম্ন	১২০	৮০	৮০
নিম্ন	১২০	৭০	৭০
মধ্যম নিম্ন	১০০	৬০	৬০
মধ্যম	৯০	৪০	৪০
উচ্চ	৭৫	৩০	৩০
অতি উচ্চ	৬০	২০	০

মাটি পরীক্ষা না হলে সার প্রয়োগের সুপারিশে নাইট্রোজেনের মান ''নিম্ন'', এবং ফসফরাস ও পটাশ (উভয়ের মান) 'মধ্যম মিম্ন' ধরে সারের সুপারিশ করা হয়।

সারণি-৩

মাটি পরীক্ষা না করে কয়েকটি ফসলের সার প্রয়োগের সুপারিশ (কেজি/হেক্টরে)

ফসলের নাম	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
উচ্চফলনশীল ধান (খরিফ)	৮০	৪০	৪০
আলু	২০০	১৫০	১৫০
রাই সরিষা	১২০	৬০	৬০
চিনাবাদাম	২০	৬০	৮০
মুগ, মুশুর	২০	৪০	৪০
ফুলকপি, বাঁধাকপি	১৫০	১০০	১০০
বেগুন	১৫০	১০০	১০০

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ১০ ❑ জৈবসার এবং এর প্রকারভেদ

১০.১ জৈবসার

১০.২ খামারের সার

১০.৩ সবুজ সার

১০.৪ নীল সবুজ শ্যাওলা ও অ্যাজোলা

১০.৫ খইল বা খোল সার

১০.৬ প্রাণীজ জৈবসার

১০.৭ আবর্জনা বা ময়লা সার এবং তলানি সার

১০.৮ জীবাণু সার

১০.৯ অ্যাজাটোব্যাক্টর

১০.১০ অ্যাজোস্পিরিলাম

১০.১১ ফস্‌ফেট দ্রবণকারী জীবাণু

১০.১২ কৃষিক্ষেত্রে জৈব বস্তুর পুনর্ব্যবহার

১০.১ জৈবসার (Organic manure)

জৈব পদার্থ থেকে উৎপন্ন সারই হল জৈবসার। যেমন, কম্পোস্ট, গোবর সার, সবুজ সার, খামারের আবর্জনা সার, কেঁচো সার ইত্যাদি। চাষের ক্ষেত্রে জৈবসারের ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বর্তমান যুগে নতুনভাবে জৈব সারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

জৈবসারে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে বলে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি সাধনে এই সার যথেষ্ট সাহায্য করে। তবে মাটিতে প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে জৈবসার উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসতে পারে না। মাটির মধ্যে অবস্থিত জীবাণুগুলি দ্বারা জৈবপদার্থের পচন সম্পূর্ণ হলে খাদ্যউপাদানগুলি ধীরে ধীরে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। জৈবসার দীর্ঘদিন ধরে উদ্ভিদকে খাদ্যউপাদান যোগাতে সক্ষম। জৈব সারের মধ্যে খাদ্যউপাদানের শতকরা পরিমাণ অনেক কম থাকায় রাসায়নিক সারের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে জমিতে প্রয়োগ করতে হয়।

● জৈবসারের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Organic manure)

(১) প্রয়োজনীয় সবরকম উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানই জৈবসারে পাওয়া যায়, যদিও এগুলির পরিমাণ কম থাকে।

(২) জৈবসারের মধ্যে থাকা খাদ্যউপাদানগুলি ধীরে ধীরে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে।

(৩) জৈবসার মাটির গঠন ও গ্রথনের উন্নতি ঘটায় এবং ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

(৪) জৈবসার প্রয়োগের ফলে মাটির বায়ু চলাচল ক্ষমতা ও জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) মাটিতে অবস্থিত জীবাণুর কার্যতৎপরতা বা কার্যকারিতা বাড়ায়। এর ফলে রাসায়নিক সারের লভ্যতা বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ফসল বেশি করে খাদ্যউপাদান পায়।

● জৈবসারের প্রকারভেদ (Types of Organic manure)

বিভিন্ন প্রকার জৈবসারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) খামারের সার (Farm yard manure/FYM)

(খ) গোবর গ্যাস ও গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার

(গ) সবুজ সার

(ঘ) নীলাভ সবুজ শ্যাওলা ও অ্যাজোলা

(ঙ) খোল/খইল

(চ) প্রাণীজ জৈবসার

(ছ) আবর্জনা বা ময়লা সার এবং তলানি সার (Sewage and Sludge)

(জ) জীবাণু সার

(ঝ) মিশ্র জৈবসার বা কম্পোস্ট (Compost)

(ঞ) কেঁচো সার (Vermicompost) ইত্যাদি।

● জৈবসার কী? (What is an Organic manure?)

জীবাণুর সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত বস্তুর রূপান্তরের মাধ্যমে যে সার পাওয়া যায় তাকে জৈবসার বলা হয়। এই সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। জৈবসার বিভিন্ন প্রকার হয়। যথা ঃ (ক) গোবর সার, (খ) কম্পোস্ট সার, (গ) খামার সার, (ঘ) পাতা পচা সার, (ঙ) শিং ও হাড়গুঁড়ো, (চ) নিম, সরষে, মহুয়া, তিল, বাদাম, করঞ্জা, তিসি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত খইল, (ছ) কেঁচো সার।

● **জৈবসার তৈরির উপকরণ (Materials required for the preparation of Organic manure)**

যে কোন জৈব আবর্জনা, যেমন ফসলের খোসা, খইল, সবজি ফসলের শেষাংশ, আগাছা, তুষ, ধান ও গমের খড়, ধানের চিটে ও ধইঞ্চা জাতীয় ফসল, জমির ও বাড়ির আশেপাশের আবর্জনা, ঝরা পাতা, জলাশয়ের আগাছা, কচুরিপানা, গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, রাস্তার এবং বাড়ি ঘরের আবর্জনা, ছেঁড়া কাগজ, কাপড়, চটের বস্তা, বিভিন্ন পশুর চামড়া, হাড় প্রভৃতি থেকে জৈবসার তৈরি করা যায়।

● **জৈবসার ব্যবহারের সুবিধা (Advantages of organic manure)**

১. চাষীভাইরা ক্ষেতখামার ও বাড়ির আবর্জনা থেকে এই সার অতি সহজেই সারা বছর ধরে তৈরি করতে পারেন।

২. জৈব সার সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ করলে জমিতে অণুখাদ্যের প্রয়োগ না করলেও ক্ষতি হয় না।

৩. এই সার প্রয়োগের ফলে রোগপোকার প্রকোপ কম হয়, তাই রোগ প্রতিরোধক ওষুধ ও কীটনাশকের ব্যবহার কম লাগে।

● **জৈবসারের উপকারিতা (Benefits of organic manure)**

১. মাটি হালকা হয়। মাটির মধ্যে বাতাস চলাচল করতে পারে। এর ফলে শিকড়ের বৃদ্ধি ভালো হয়। পরিবেশ বা পৃথিবীর তাপ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

২. মাটিতে জৈববস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধি ঘটে।

৩. মাটির মধ্যে অদ্রবণীয় উদ্ভিদখাদ্যকে দ্রবণীয় বা সহজলভ্য করে তোলে।

৪. রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বেড়ে যাওয়ায় সার প্রয়োগ বাবদ খরচ কম হয়। এর ফলে মাটির স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

৫. জৈবসার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

১০.২ খামারের সার (FYM)

কৃষি খামারের বিভিন্ন পশুপাখির মলমূত্র এবং অন্যান্য আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থকে ভালোভাবে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে খামারের সার বা Farm yard manure (FYM) বলা হয়। এটি একটি অত্যন্ত উন্নত মানের জৈবসার।

খামারের সার তৈরির জন্য গোশালার কাছাকাছি একটি উঁচু জায়গায় ৩ মি. × ১.৫ মি. × ১০ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হলে ভালো হয়, কারণ তাতে খাদ্যউপাদানগুলি মাটিতে চুঁইয়ে যাওয়ার বা নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম থাকে। গর্তটি মাটির হলে গর্তের তলাটি ভালো করে পিটিয়ে নেওয়া দরকার। গর্তটিকে সমান কয়েকটি ভাগে ভাগ করে কাঠের তক্তা জাতীয় জিনিষ দিয়ে সাময়িকভাবে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে ভাগ করে নিতে হয়।

খামারের পশুর মলমূত্র, খাদ্যের অবশেষ, আগাছা, তরকারির খোসা, খামার ও ঘরবাড়ির বর্জ্য আবর্জনা ইত্যাদি একসঙ্গে মিশিয়ে গর্তের এক একটি প্রকোষ্ঠে ভরতে হবে। গর্তটি ভর্তি হয়ে গেলে কাদা ও গোবরের প্রলেপ দিয়ে আবর্জনার স্তূপটি ঢেকে দিতে হবে। প্রায় ৪-৫ মাসের মধ্যেই সার তৈরি হয়ে যায়। গর্ত প্রতি ৩০-৪০ কেজি সুপার ফসফেট ভালো করে মিশিয়ে দিলে সারের মধ্যে ফসফেটের পরিমাণ বাড়ে ও মান উন্নত হয়। গোশালাটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে, গোমূত্র ও মল সবটাই সংগ্রহ করা যায়।

● গোবর গ্যাস ও গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার

সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত জৈবসার হল গোবর সার। গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ গোবর জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। আবার গোশালা থেকে গোবর সংগ্রহ করার সময় গোমূত্র অনেক সময় সংগ্রহ করা হয় না। ফলে পুষ্টিমৌলের পরিমাণ অনেকটাই হ্রাস পায়। এই ত্রুটিগুলি সহজেই শুধরে নেওয়া সম্ভব। গোবর গ্যাস তৈরির পর যে অবশিষ্টাংশ বাহির হয়, তা জৈবসার হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট এবং এই জৈব সারকে কাজে লাগিয়ে ২৫-৩০ শতাংশ বেশি ফসল উৎপাদন করা যায়।

১০.৩ সবুজ সার

জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সবুজ গাছপালা চাষ করে নরম অবস্থায় লাঙ্গল বা ট্রাক্টর দিয়ে চষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া (সবুজ সার) অথবা কিছু কিছু গাছের নরম সবুজ পাতা ও পাতা সংলগ্ন নরম ডাঁটা কেটে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার (সবুজ পাতাসার) পদ্ধতিই হল সবুজ সার প্রয়োগ পদ্ধতি।

● সবুজ সার প্রয়োগের উপকারিতা

(১) সবুজ সার উৎপাদনকারী শুঁটি জাতীয় ফসলগুলি হেক্টর প্রতি ১০-২৫ টন সবুজ সার উৎপাদন করে। এদের মাধ্যমে যা পুষ্টি উপাদান মাটিতে সংযুক্ত হয় তার পরিমাণ প্রায় ৩-৮ টন খামার সারের সমতুল্য।

সারণি - ২

সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফসলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শস্যের নাম	বপনের সময়	বীজের হার (হেক্টর প্রতি কেজিতে)	হেক্টর প্রতি সবুজ অংশ উৎপাদন (টন)	শস্যে নাইট্রোজেনের ভাগ (শতাংশ)	হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন উৎপাদনের পরিমাণ (কেজিতে)
শন	এপ্রিল-জুলাই	৫০-৬০	১৮-২৮	০.৪৩	৬০-১০০
ধইঞ্চা	এপ্রিল-জুলাই	৪০-৪৫	২০-২৫	০.৪২	৮৪-১০৫
বিউলি	এপ্রিল-জুলাই	২০-২২	১০-১২	০.৪১	৪০-৪৯
মুগ	এপ্রিল-জুলাই	২০-২২	৮-১০	০.৪৮	৩৮-৪৮
গুয়ার	এপ্রিল-জুলাই	৩০-৪০	২০-২৫	০.৩৪	৬৪-৬৫
জোয়ার	এপ্রিল-জুলাই	৪০-৫০	২০	০.৩৪	৫৬
সেনজি	অক্টোবর-	২৫-৩০	২৬-২৯	০.৫১	১২০-১৩৫
বারসীম	ডিসেম্বর	২০-৩০	১৬	০.৪৩	৬০
মটর	অক্টোবর-	৮০-১০০	২১	০.৩৬	৬৭

(২) সবুজ সার হেক্টর প্রতি ৬০-১০০ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ করে; তাছাড়া ফসফরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদি উপাদানের সহজলভ্যতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ে।

(৩) সবুজ সার তৈরির ফসলগুলি মাটিকে ঢেকে রাখে (cover crop), ফলে পুষ্টিমৌলের হ্রাসের পরিমাণ কমে যায়। মাটি সংরক্ষিত হয়। মাটির ক্ষয় কম হয়।

(৪) মাটির উপকারী জীবাণুগুলির কার্যকারিতা বাড়ে, জমিতে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৫) জমির জলধারণ ক্ষমতা, বায়ু চলাচল ক্ষমতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটে।

(৬) দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে জমির ক্ষারত্বের পরিমাণ কমে। মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়।

(৭) সাধারণত শুঁটি জাতীয় ফসল সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এরা বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে মূলের অর্বুদের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে এবং মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হয়।

সবুজ সারের উপযোগী ফসল

সবুজ সার তৈরির উপযোগী ফসলগুলিকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) **শিম্বীগোত্রীয় শস্য ঃ** ধঞ্চে, বরবটি, শণ, বিউলি, অড়হর, সেসবানিয়া, বুনো নীল, বাঘাধঞ্চে, সয়াবিন, মটর, ছোলা, খেসারি ইত্যাদি।

(খ) **সবুজ পাতাসারের জন্য ফসল ঃ** কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, গ্লাইরিসিডিয়া, স্থলকলমি, ক্রোটোলারিয়া, সুবাবুল, সেসবানিয়া, ক্যাসিয়া ইত্যাদি গাছের পাতা।

● সবুজ সারের উপযোগী শস্যের বৈশিষ্ট্য

(১) কাণ্ড নরম, শাঁসালো হবে, গাছের পাতার পরিমাণ বেশি থাকবে।

(২) গাছে ফুল ও ফল আসার সময় দীর্ঘ হবে। তবে গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়বে।

(৩) গাছের মূল মাটির গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে এবং তাতে মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) সবরকমের মাটিতে এবং সহজে চাষ করা যাবে অর্থাৎ সব পরিস্থিতিতে চাষ করার যোগ্য হবে।

● সবুজ সার প্রয়োগের পদ্ধতি (Method of application of green manure)

খরিফ ঋতুতে সাধারণত জুন-জুলাই মাসে সবুজ সার প্রয়োগ করা হয়। এর জন্য সাধারণত মে মাস নাগাদ সবুজ সার উৎপাদনের শস্যগুলি লাগানো হয়। সবুজসার শস্যগুলি মূলত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। তবে, নিয়মিত বৃষ্টি না হলে ১০-১২ দিন অন্তর জমিতে জলসেচ দিতে হয়।

সবুজ সার হিসেবে শুঁটি জাতীয় ফসল চাষ করা হলে ফসফেট প্রয়োগ করা দরকার। এই জাতীয় ফসলের শিকড়ের গুটিতে বসবাসকারী জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন বন্ধনে সাহায্য করে।

কচি ও নরম অবস্থায় সবুজ সারের গাছকে জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। ডাঁটা শক্ত হয়ে গেলে সহজে পচন হয় না। পচনের জন্য প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। সেইজন্যই সেচের বন্দোবস্ত না থাকলে খরাপ্রবণ এলাকায় সবুজ সার ব্যবহার করার অসুবিধা আছে। শুঁটি জাতীয় ফসলগুলিকে সাধারণত ৫-৬ সপ্তাহ বয়সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে জমির মাটির গুণাগুণ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সঠিকভাবে বজায় থাকে।

গাছগুলি জমিতে মেশানোর ৪-৫ সপ্তাহ পরে জমিতে মূল অর্থাৎ প্রধান ফসল চাষ করা যায়।

১০.৪ নীল সবুজ শ্যাওলা ও অ্যাজোলা (Blue green algae and Azolla)

অ্যাজোলা হল জলে ভাসমান একটি ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ। এই অ্যাজোলার পাতার উপরের খণ্ডে নীলাভ সবুজ শৈবাল বসবাস করে, যা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করতে সক্ষম। নীলাভ সবুজ শ্যাওলা সূর্যের উপস্থিতিতে প্রতি হেক্টরে ৩০-৪০ কেজি পর্যন্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে পারে। অন্যদিকে অ্যাজোলা ধানের জমিতে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করলে যথেষ্ট পরিমাণে জৈবসার এবং হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি নাইট্রোজেন উৎপন্ন বা যোগ করতে পারে। জমিতে নীল সবুজ শ্যাওলা শুকনো করেও জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

● সবুজসার হিসেবে অ্যাজোলার ব্যবহার (Azolla as green manure)

ধান রোয়ার অন্তত ২০ দিন আগে জমিতে ভালোভাবে চাষ দিয়ে ১০-১৫ সেমি জল ধরে রাখা হয়।

এরপর, ঐ জমিতে একর প্রতি ৮০০ কেজি অ্যাজোলা ছড়িয়ে দিয়ে ৩০-৩৫ কেজি রক ফসফেট প্রয়োগ করা হয়। ২০ দিন পর অ্যাজোলা জমিকে প্রায় ঢেকে ফেলে, যার ওজন প্রায় ৬-৮ টন। এরপর ঐ জমিতে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে অ্যাজোলা মিশিয়ে দেওয়া হয়।

● **ধানের সঙ্গে অ্যাজোলার চাষ**

৫-৭ দিন পর একর প্রতি ২০০-৪০০ কেজি সতেজ অ্যাজোলা ধানের জমিতে প্রয়োগ করা হয়। জমিতে অ্যাজোলা দেওয়ার পর রক ফসফেট দিলে অ্যাজোলার বৃদ্ধি ভালো হয়।

অ্যাজোলা ফসলকে নাইট্রোজেন যোগান দেওয়া ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে জৈবসার যোগান দেয় এবং জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

১০.৫ খইল বা খোল সার (Oil Cake)

বিভিন্ন তৈলবীজ থেকে তেল বের করে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাকেই খোল বলে। তৈলবীজ ছাড়াও নিম, করঞ্জা, মহুয়া, তুলোবীজ থেকেও খোল পাওয়া যায়। খোলের মধ্যে অন্যান্য জৈবসারের তুলনায় উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানগুলি বেশি পরিমাণে থাকে। নীচে সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার খোল থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদ খাদ্যের শতকরা পরিমাণ দেওয়া হল।

সারণি-৩

খোলের নাম	নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাশ (%)
সরষের খোল	৪.৫—৫.০	২.০	১.৩—১.৫
বাদামের খোল	৬.৫—৭.৫	১.৩—১.৫	১.৫
নিম খোল	৫.০—৫.৫	১.০	১.২—১.৪
মহুয়া খোল	২.০—২.৫	০.৮—১.০	১.৮—২.০
তিলের খোল	৬.০—৬.২	২.০	১.২—১.৪
তিসির খোল	৪.৯—৫.০	১.৪—১.৫	১.৩—১.৪
করঞ্জা খোল	৪.৯—৪.০	০.৯—১.০	১.২
নারকেল খোল	৩.৯—৪.০	১.৯—২.০	১.৮
নাইজার খোল	৪.৮	১.৮	১.৩—১.৪
ক্যাস্টর বা সরগুঁজার খোল	৫.৫—৫.৯	১.৮	১.০
তুলো (খোসা ছাড়ানো)	৬.৫—৬.৬	২.৮	২.০—২.১
তুলো (খোসাসহ)	৩.৯—৪.০	১.৮	১.৬—১.৭

বীজ বোনা বা রোয়ার ১৫-২০ দিন আগে জমিতে খোল প্রয়োগ করা উচিত। প্রায় ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খোল পচে এবং এর মধ্যে থাকা উদ্ভিদ খাদ্যের প্রায় ৫০-৮০ শতাংশ উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। তবে মহুয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি সময় লাগে। তাই প্রায় ২ মাস আগে মহুয়ার খোল জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। খোল পচার জন্য জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা দরকার। এছাড়া জমিতে সেচেরও সুবিধা থাকা আবশ্যক। ব্যবহারের আগে খোলকে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিতে হয়।

আখ, তুলা, শাকসবজি, আলু, ফল, তামাক, ধান, গম ইত্যাদি ফসলের ক্ষেত্রে খোল ব্যবহার করা হয়। ফুল ও পান চাষে খোল সার প্রয়োগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিম, করঞ্জা, রেড়ি ও মহুয়ার খোল তেতো স্বাদের হয়। জমিতে কীটপতঙ্গ দমনের ক্ষেত্রে এরা সহায়ক হয়।

১০.৬ প্রাণীজ জৈবসার (Organic manure from animal body)

হাড়ের গুঁড়ো (Bone meal), মাছের গুঁড়ো (fish meal), রক্তের গুঁড়ো (blood meal), মাংসের গুঁড়ো (meat meal), পাখির মাংসের গুঁড়ো (poultry meal) ইত্যাদি হল বিভিন্ন রকমের প্রাণীজ জৈবসার। এগুলি জলে অদ্রাব্য। কিন্তু মাটিতে প্রয়োগের পর বিভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়ায় এদের মধ্যস্থ উদ্ভিদ খাদ্যউপাদান, মূলত ফসফেট ও নাইট্রোজেন ধীরে ধীরে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। তাই এই সারের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী। বিভিন্ন রকম প্রাণীজ জৈবসার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যউপাদানের শতকরা পরিমাণ নিচে দেওয়া হল।

সারণি-৪

জৈবসারের নাম	নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাশ (%)
হাড়গুঁড়ো সার	৩.৫-৪.৫	১৮-২৫	—
শিং ও খুর গুঁড়ো সার	১০.০-১৫.০	১.০	—
রক্তের গুঁড়ো সার	১০.০-১২.০	১.০-২.০	১.০
মাংসের গুঁড়ো সার	৯.০-১১.০	০.১-৩.৫	—
মাছের গুঁড়ো সার	৪.০-১০.০	৩.০-৯.০	০.৩-১.৫

সারণি-৫

জৈব সারে উদ্ভিদ খাদ্যের শতকরা পরিমাণ

জৈব সারের নাম	শতকরা পরিমাণ		
	নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাশ (%)
গোবর সার	০.৫ - ১.৫	০.৪ - ০.৮	০.৫ - ১.৯
গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার	১.৬ - ১.৮	১.১ - ২.০	০.৮ - ১.২
গ্রামের কম্পোস্ট সার	০.৪ - ০.৮	০.৩ - ০.৬	০.৭ - ১.০
শহরের কম্পোস্ট সার	১.০ - ২.০	১.০	১.৫
সবুজ সার (কাউপি)	০.৭১	০.১৫	০.৫৮
সবুজ সার (ধইঞ্চা)	০.৬২	—	—
শুকনোমাছ থেকে তৈরি সার	৪.০ - ১০.০	৩.০ - ৯.০	০.৩ - ১.৫
পাখির মল	৭.০ - ৮.০	১১.০ - ১৪.০	২.০ - ৩.০

১০.৭ আবর্জনা বা ময়লা সার এবং তলানি সার (Sewage and sludge)

শহরের নর্দমা ও অন্যান্য পয়ঃপ্রণালীর তলায় প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ খাদ্যউপাদান থাকে, যাকে তলানি সার বলে। কিন্তু অশোধিত অবস্থায় এই সার ব্যবহার করলে জমির ভৌত ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি কিছু পরিমাণে বিঘ্নিত হয়। তাই সিউয়েজ খামারে তলানি সার থিতানোর জন্য মেশিন বসিয়ে বাণিজ্যিকভাবে সার তৈরি করা হয়। তলানি সার থেকে কম খাদ্যোপাদান যুক্ত কাদার কণা বাদ দিয়ে, নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পচিয়ে **পচানো তলানি সার** পাওয়া যায়। কিন্তু **মনে রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই তলানি সার দেওয়া জমির ফসল কাঁচা অবস্থায় খাওয়া উচিত নয়।**

● আবর্জনা থেকে জৈবসার তৈরির এক সহজ পদ্ধতি

গৃহপালিত পশুপাখির মলমূত্র ও ক্ষেত-খামারের অনেক জৈব আবর্জনা সংরক্ষণের অভাবে অপচয় হয়। সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতিও অনেক কৃষকের জানা নেই। তাছাড়া ধানের খড় গৃহ নির্মাণে ও গোখাদ্যরূপে এবং ধানের খোসা হাঁস মুরগির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ফলে জমিতে প্রয়োগ করার জৈব পদার্থের অভাব দেখা যায়। চাষীভাইরা একটু চেষ্টা ও যত্ন নিলে ক্ষেত-খামারের বিভিন্ন আবর্জনা ও গোবর, গোমূত্র মিশিয়ে নিজেরাই জৈব সার তৈরি করতে পারেন। নিচে জৈবসার তৈরির এক সহজ পদ্ধতি দেওয়া হলো।

(ক) গোশালার কাছাকাছি প্রয়োজনমতো দৈর্ঘ্যের ৩-৪ ফুট প্রস্থের, ২ ফুট গভীরতার একটি গর্ত করতে হবে। গর্তের চারপাশে ও নিচে গোবর গোলা কাদামাটিসহ প্রলেপ দিতে হবে।

(খ) প্রতিদিনের সংগৃহীত গোবর, গোমূত্র বিচালির সাথে মিশিয়ে এই গর্তে ফেলতে হবে।

(গ) ধান, গম, পাট, শাকসবজি প্রভৃতি ফসলের অবশিষ্টাংশ, ধানের খোসা, কাঠের গুঁড়ো, গাছের ঝরে পড়া পাতা, কচুরিপানা ইত্যাদি ঐ গর্তে ফেলতে হবে।

(ঘ) এভাবে প্রথম স্তরের ওপর দ্বিতীয় স্তর আবর্জনা ফেলে গর্ত ভরে ফেলতে হবে।

(ঙ) প্রতি টন আবর্জনার সাথে ১-২ লিটার গো মূত্র বা কিছু তরল সার প্রয়োগ করলে জীবাণুঘটিত পচন-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে এবং জৈব সারের মান উন্নত হবে।

(চ) গর্ত ভর্তি হবার পর আবর্জনার স্তূপ গর্তের ওপরে প্রায় এক থেকে দেড় ফুট উঁচু হয়ে গেলে তার ওপর আচ্ছাদন দিতে হবে, যাতে রোদের তাপে জৈব বস্তু শুকিয়ে না যায় অথবা বৃষ্টির জল অতিরিক্ত মাত্রায় গর্তে ঢুকে না যায়।

(ছ) মাঝে মাঝে এই স্তূপে হালকাভাবে জল ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে জৈব পদার্থে জলের পরিমাণ শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ থাকে।

(জ) জৈব সার তৈরির সময় কিছুটা রক ফসফেট মিশিয়ে দিলে সার হিসেবে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সুষম হয়।

এই পদ্ধতিতে ক্ষেত-খামারের আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরি করতে প্রায় এক মাস সময় লাগে।

সঠিকভাবে তৈরি আবর্জনা সারে কার্বন/নাইট্রোজেন (C/N) অনুপাত ১ ঃ ১০-১৫ মধ্যে থাকে। এর বেশি অনুপাত থাকলে বুঝতে হবে জৈব পদার্থ সম্পূর্ণরূপে পচেনি। সম্পূর্ণরূপে না পচা জৈব সার জমিতে প্রয়োগ করলে জীবাণুরা মাটির গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে নেয় বা আবদ্ধ করে নেয়, ফলে ফসল তা গ্রহণ করতে পারে না।

মাটিকে জৈব খাদ্যে সমৃদ্ধ করার জন্য সুপারিশকৃত তরল সার ঃ

(১) সঞ্জীবক ঃ ২০ কেজি গোবর, ১০ লিটার গোমূত্র, ৫০০ গ্রাম ঝোলা-গুড়, ৩০ লিটার জলে গুলে আবদ্ধ ড্রামে ১০ দিন পচানো হয়। তারপর ওই মিশ্রণ জলে মিশিয়ে ২০ গুণ বৃদ্ধি করে মাটিতে বা সেচের জলের সাথে ১ একর জায়গাতে প্রয়োগ করা হয়।

(২) পঞ্চগব্য ঃ ৪ কেজি গোবর গোলা, ১ কেজি টাটকা গোবর, ৩ লিটার গোমূত্র, ২ লিটার গোরুর দুধ, ২ লিটার দই, ১ কেজি মাখন অয়েল মিশিয়ে ৭ দিন আবদ্ধ পাত্রে পচানো হয়। প্রত্যহ ২ বার করে নাড়ানো হয়। ২০ লিটার পঞ্চগব্য জলে গুলে ৬৫০ লিটার মিশ্রণ তৈরি করে ১ একরে স্প্রে করা হয়। বীজ শোধনের কাজেও এটি ব্যবহার করা যায়।

(৩) সমৃদ্ধ পঞ্চগব্য ঃ ১ কেজি টাটকা গোবর, ৩ লিটার গোমূত্র, ২ লিটার গোরুর দুধ, ২ লিটার দই, ১ কেজি দেশি ঘৃত, ৩ লিটার আখের রস, ৩ লিটার নারকেলের জল, ১২টি কলা একসঙ্গে ভালোভাবে

মিশিয়ে আবদ্ধ পাত্রে ৭ দিন পচানো হয়। ২০ লিটার এই মিশ্রণে ৬৫০ লিটার জল গুলে ১ একর জমির মাটির ওপরে স্প্রে করে সেচ দেওয়া হয়।

(৪) জীবাস্রুত ঃ ১০ কেজি গোবর, ১০ লিটার গোমূত্র, ২ কেজি ঝোলা গুড়, ২ কেজি গমের ময়দা ও ২ কেজি জীবন্ত-বস্তু যুক্ত মাটি ২০০ লিটার জলে গুলে ৫-৭ দিন পচানো হয়। পচানোর সময় প্রতিদিন ৩ বার দ্রবণটিকে নাড়ানো হয়। ঐ মিশ্রণ সেচের জলের সঙ্গে মিশিয়ে এক একরে প্রয়োগ করা হয়। একটি ফসলে মোট ৩ বার প্রয়োগ করা উচিৎ। প্রথমবার বীজ বোনার আগে, দ্বিতীয় বার বীজ বোনার ২০ দিন পর এবং তৃতীয় তথা শেষ বার ৪৫ দিন পর।

- **পাখির মল থেকে তৈরি জৈবসার**

(ক) মুরগির ঘরে বিচালি, পাতা, কাঠের গুঁড়ো প্রভৃতি দিয়ে পুরু শয্যা তৈরি করা হয়। এর ওপর প্রতিদিন মুরগির মল পড়ে।

(খ) প্রতি সপ্তাহে একবার করে পাখির থাকার ঘরের শয্যা উল্টে দেওয়া হয়।

(গ) এক বছর পর জমিয়ে রাখা তৃণাদির গাদা সাররূপে ব্যবহারের উপযোগী হয়। জীবাণু দ্বারা জৈব পদার্থ এবং পাখির মলের পচন হয়।

(ঘ) সাধারণত ৩৩-৪০টি মুরগির শয্যা থেকে এক টন জৈবসার পাওয়া যায়।

(ঙ) পোলট্রির সারে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশের শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে ৩ : ২ : ২। তাছাড়া এতে অল্প অনুখাদ্যও থাকে।

(চ) **গোবর সার কিংবা আবর্জনা সারের চেয়ে পোলট্রির সার থেকে ফসল সহজে খাদ্যউপাদান গ্রহণ করতে পারে।** তাছাড়া পোলট্রির সারে কয়েকটি হরমোন থাকায় গাছের এবং শিকড়ের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়।

- **প্রাণীর মলমূত্র থেকে জৈবসার তৈরির পদ্ধতি**

মলমূত্র থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে এর সাথে গ্রামীণ জৈব আবর্জনা মেশাতে হবে। গ্রামের নানান জৈব আবর্জনার এক ঘন ফুটের ওজন ৮ থেকে ১১ কেজি, আর তাতে জলীয় ভাব থাকে ৩০-৪০ শতাংশ। মলমূত্র থেকে কম্পোস্ট সার তৈরির পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো।

(ক) গর্তের মধ্যে প্রতিদিন মলমূত্র ফেলতে হবে। মলমূত্রের স্তর ২-৩ ইঞ্চি পুরু হলে পুনরায় আবর্জনার স্তর তৈরি করতে হবে।

(খ) উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের, ৫-৬ ফুট প্রস্থের, ৩-৪ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তের নীচে ক্ষেতখামারের জৈব আবর্জনা ৬-৯ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে।

(গ) জৈব পদার্থের পচনের ফলে ধীরে ধীরে আবর্জনার আয়তন কমে গিয়ে মূল গভীরতার অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ দাঁড়ায়; ৪-৬ মাস পর এই মলমূত্র ও আবর্জনার স্তূপ সার হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

(ঘ) এইভাবে জৈব আবর্জনা এবং মলমূত্র স্তরীভূত করতে হবে, যতক্ষণ অবধি না তা মাটির উপরে প্রায় এক ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়।

(ঙ) আবর্জনা ও মলমূত্রের স্তূপকে গোবরগোলা জল ও কাদামাটি দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য একটা ছাউনি বা চালা তৈরি করতে হবে।

১০.৮ জীবাণু সার (Bio-fertilizer)

প্রকৃতিতে কিছু উপকারী জীবাণু আছে যারা বাতাসের নাইট্রোজেনকে শিকড়ের অর্বুদে আবদ্ধ করে গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে অথবা মাটির অদ্রাব্য ফসফেটকে দ্রবীভূত করে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, অর্থাৎ জমির উর্বরতা বাড়ায়। পরীক্ষাগারে বিশেষ উপায়ে এইসব জীবাণু কালচার (culture) করা হয়। কালচার করা এইসব জীবাণু জমিতে প্রয়োগ করা হলে এদের জীবাণুসার বলা হয়। প্রতি গ্রাম কালচারের সঙ্গে পাঁক বা কাঠ-কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি ১ : ৩ অনুপাতে মিশিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে প্যাকেট করা হয়। এরকম প্রতিটি প্যাকটের ওজন হয় প্রায় ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম বা ১ কেজি। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে জীবাণুর নাম, পরিমাণ, কোন কোন ফসলে ব্যবহার করা যাবে, প্রয়োগ পদ্ধতি ও কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে সেই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া থাকে।

প্রকৃতিতে বহু সংখ্যক উপকারী জীবাণু পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মূলত তৈরি করা হয় রাইজোবিয়াম, অ্যাজেটোব্যাকটার, অ্যাজোস্পাইরিলাম ও ব্যাসিলাস ফার্মাস প্রভৃতি জীবাণুকে। নীচে কোন জীবাণু কোন ফসলে ব্যবহার করা যাবে তা সারণির মাধ্যমে দেখানো হল।

সারণি-৬

জীবাণু সার	প্রকৃতি	ফসল	একর প্রতি কতটা N/P যোগায়
১. রাইজোবিয়াম লেগুমিনোসারাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	মটর, মুসুর, খেসারি	২০-৩৬ কেজি
২. রাইজোবিয়াম জাপোনিকাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	সয়াবিন	৩০-৪০ কেজি
৩. রাইজোবিয়াম প্রজাতি	,,	মুগ, ছোলা, কলাই অড়হর	১৮-৩৬ কেজি ৪০-৫০ কেজি
৪. অ্যাজেটোব্যাকটার	,,	পাট, আলু, আখ, সর্ষে, ভুট্টা, গম, তুলো, সূর্যমুখী, ফুল, সকল প্রকার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সবজি।	৮-১২ কেজি

জীবাণু সার	প্রকৃতি	ফসল	একর প্রতি কতটা N/P যোগায়
৫. অ্যাজোস্পাইরিলাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, আলু, সর্ষে ও সকল প্রকার সবজি।	৮-১২ কেজি
৬. ব্যাসিলাস ফার্মাস	ফসফেট দ্রবণকারী	সমস্তরকম তন্ডুল জাতীয় শস্য, ডালশস্য, তৈলবীজ ও সকল প্রকার সবজি।	৯-১০ কেজি

জীবাণু সার কী?

জীবাণু সার হল এক বা একাধিক জীবাণুর মিশ্রণ, যা উপযুক্ত পরিবেশ বা ছায়ায় রেখে কম পরিমাণে ফসলে প্রয়োগ করা হয়। এরা মাটির উর্বরতা শক্তিকে বাড়ায় এবং ফসলে উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখে।

● **জীবাণু সারের শ্রেণীবিভাগ (Types of biofertilizer)**

জীবাণু সারকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুসার

(খ) ফসফেট/পটাশ দ্রবীভূতকারী জীবাণুসার

(গ) জৈব পদার্থ পচনে সাহায্যকারী জীবাণুসার।

(ঘ) পটাশ বহনকারী জীবাণুসার

● **নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু সার (N-fixing biofertilizer)**

প্রতি বছর যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপাদন হয় তার প্রায় চারগুণ নাইট্রোজেন বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা মাটিতে আবদ্ধ হয়।

নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু সার দুই প্রকারের। যেমন—

(১) মিথোজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু।

(২) মুক্তজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু।

(১) **মিথোজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু রাইজোবিয়াম**

রাইজোবিয়াম গোত্রীয় ব্যাকটিরিয়া শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ—ছোলা, মুসুর ও সমস্ত ডাল জাতীয় ফসল এবং বাদাম, সয়াবীন প্রভৃতি ফসলের শিকড়ে অর্বুদ তৈরি করে বাস করে। বাতাসের নাইট্রোজেনকে ঐ সমস্ত গাছের শিকড়ে আবদ্ধ করে গাছকে নাইট্রোজেন যোগান দেয়, তার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ে। অনুকুল পরিবেশে রাইজোবিয়াম গোত্রীয় ব্যাকটিরিয়া একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত করে।

জীবাণুঘটিত ছত্রাকনাশকের সাহায্যে বীজ শোধন করলে জীবাণু সারের উপর তার কুপ্রভাব পড়বে না। এক্ষেত্রে জীবাণুর পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে হবে। প্রথমে ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করার পর বীজের সঙ্গে জীবাণু সার মেশাতে হবে।

অম্লমাটিতে ৪০০ গ্রাম জীবাণু সার ২ কেজি গুঁড়ো চুণ রাইজোবিয়াম মিশ্রিত বীজের সঙ্গে, বীজ ভিজে থাকাকালীন মিশিয়ে জমিতে বুনলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বিশেষ প্রজাতির রাইজোবিয়াম বিশেষ ধরনের ডালশস্যের শিকড়ে অর্বুদ তৈরি করে নাইট্রোজেন জমা করতে পারে। বীজ শোধনের আগে সঠিক প্রজাতির জীবাণু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

(২) **মুক্তজীবী নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু (Free-living N-fixing bacteria)**

মাটিতে স্বাধীনভাবে বসবাসকারী বেশ কিছু ব্যাকটিরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটিতে আবদ্ধ করতে পারে।

এরমধ্যে অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাসিটোব্যাক্টর এবং অ্যাজোস্পাইরিলামের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা বেশি থাকায় জীবাণু সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১০.৯ অ্যাজোটোব্যাক্টর (Azotobactor chroococcum)

অ্যাজোটোব্যাক্টরের প্রজাতিগুলির মধ্যে অ্যাজোটোব্যাক্টর ক্রোকোক্কাম এখানকার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। এরা গাছের শিকড়ের কাছাকাছি বসবাস করে এবং বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে গাছকে সরবরাহ করে। সাধারণত বছরে একর প্রতি ৮-১২ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যোগান দেয়। অ্যাজোটোব্যাক্টর গাছের বৃদ্ধিবর্ধক পদার্থ, যেমন থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, পাইরিডক্সিন, ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, নিকোটিনিক এবং জিব্রালিন অ্যাসিড প্রস্তুত করে থাকে। এরা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপযোগী হয় এবং গাছকে রোগমুক্ত করতে সাহায্য করে।

অ্যাজোটোব্যাক্টরের কার্যকারিতা নিরপেক্ষ পি.এইচ. যুক্ত মাটিতে ভালো হয়। পি.এইচ. ৫.৫ এর নীচে অথবা ৮.৫ এর উপর গেলে কার্যকারিতা লোপ পায়। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় অ্যাজোটোব্যাক্টর ভালোভাবে কাজ করে। জমিতে জল জমে থাকলে বা তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর হলে কার্যকারিতা খুবই কমে যায়।

ধান, গম, ভুট্টা, আখ, সবজি, পাট, ডাল এবং তৈলবীজ জাতীয় ফসলে অ্যাজোটোব্যাক্টর প্রয়োগ করা হয়। বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি এবং বায়ু চলাচলে সক্ষম শুকনো মাটিতে অ্যাজোটোব্যাক্টর ব্যবহারের সুফল পাওয়া যায়।

১০.১০ অ্যাজোস্পাইরিলাম (Azospirillum)

অ্যাজোস্পাইরিলামের তিনটি প্রজাতির মধ্যে অ্যাজোস্পাইরিলাম ব্রাসিলেন্স ও অ্যাজোস্পাইরিলাম লিপোফেরাম প্রকৃতিতে বেশি পাওয়া যায়। এগুলি কৃষিক্ষেত্রে জীবাণু সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরা গাছের শিকড়ের পাশে থাকে এবং বাতাস থেকে নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ করে। অ্যাজোস্পাইরিলাম ভিটামিন ও গাছের বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ তৈরি করে। অধিক পরিমাণ খামারজাত সার মিশ্রিত পি. এইচ. নিরপেক্ষ মাটি অ্যাজোস্পাইরিলামের কার্যকারিতার পক্ষে অনুকূল। তবে অম্ল মাটিতেও অ্যাজোস্পাইরিলাম কাজ করতে পারে। সাধারণত ৩২ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এর পক্ষে আদর্শ। কিন্তু তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রির নীচে নেমে গেলে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

সাধারণত এঁটেল বা এঁটেল দোআঁশযুক্ত ভারী মাটি, যেখানে বায়ু চলাচল কম হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকলে অ্যাজোস্পাইরিলাম ব্যবহার করা ভালো। **ধানের জমিতে অ্যাজোস্পাইরিলাম প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।**

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ অ্যাজোটোব্যাক্টর এবং অ্যাজোস্পাইরিলাম বিভিন্নভাবে ফসলে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেমন—

● **বীজশোধন পদ্ধতি ঃ**

প্রতি কেজি বীজের জন্য ১০-২০ গ্রাম জীবাণুসার, ৪০ মিলি ভাতের মাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে লেই প্রস্তুত করা হয়। তারপর ঐ মিশ্রণে বীজ মাখিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকানো প্রয়োজন।

● **আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতির শোধন পদ্ধতি ঃ**

বীজের আয়তন অনুসারে ২০-৫০ লিটার জলে ১ কেজি জীবাণু মেশাতে হবে। তারপর ঐ মিশ্রণে ১ একর জমির বীজ ২৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে লাগাতে হবে।

● **চারা শোধন পদ্ধতি ঃ**

বীজতলায় যে সমস্ত ফসলের চারা তৈরি করে মূল জমিতে লাগাতে হয় তার জন্য চারা তোলার পর বান্ডিল বেঁধে শিকড়গুলো ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া দরকার। এরপর ১ কেজি জীবাণু সার ৫-১৫ লিটার জলে মিশিয়ে এক একর জমির প্রয়োজনীয় চারা ঐ মিশ্রণে ২৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে মূল জমিতে বসাতে হবে।

● **ধানের ক্ষেত্রে ঃ**

২ বর্গমিটার জায়গায় ১ কেজি জীবাণু সার জমিতে জলের সঙ্গে মিশিয়ে একর প্রতি জমির প্রয়োজনীয় চারা ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা ঐ মিশ্রণে রাখা দরকার।

● **জমিতে প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ**

২ কেজি জীবাণু সার ৫০-১০০ কেজি জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে সেচ দেওয়ার আগে জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

● **আলু এবং আখের ক্ষেত্রে ঃ**

মাটি দেওয়ার সময় জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

● **ফল এবং বনজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঃ**

২৫ গ্রাম জীবাণু সার ৫০০ গ্রাম জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়।

● **জীবাণু সার সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা যায় অথবা বীজে বা শিকড়ে প্রয়োগ করা যায়।** খেয়াল রাখা দরকার যে, **একই ফসলে কমপক্ষে দুটি পদ্ধতিতে জীবাণু সার প্রয়োগ করলে বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়।**

● **জীবাণু সার ব্যবহারের উপযোগিতা (Advantages of biofertilizer)**

(১) নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুরা সাধারণত একর প্রতি ৬-১২ কেজি নাইট্রোজেন এবং ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুগুলি হেক্টর প্রতি ৫-৬ কেজি ফসফেট উদ্ভিদকে দিতে পারে।

(২) জৈব পদার্থ যোগ করে মাটির গঠন ও উর্বরতা বাড়ায়।

(৩) গাছের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) পরিবেশ দূষণের পরিমাণ কমে, খরচের সাশ্রয় হয়।

(৫) ফসলের ফলন প্রায় ১০-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

● **সতর্কতা (Precautions)**

(১) জীবাণু সারের সঙ্গে জৈবসারও অবশ্যই প্রয়োগ করা দরকার।

(২) জীবাণু সার মেশানোর অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে এবং মেশানোর পর আর কোন রোগনাশক বা কীটনাশক মেশানো চলবে না।

(৩) জীবাণু সার প্রয়োগের এক সপ্তাহ আগে ও পরে অথবা জীবাণু সারের সঙ্গে অন্য সার, কীটনাশক, রোগনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) জীবাণু সারের প্যাকেট কখনোই রোদে রাখা উচিত নয়।

(৫) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই প্যাকেটের জীবাণু সার ব্যবহার করে ফেলতে হবে।

(৬) নির্দিষ্ট ফসলের জন্য নির্দিষ্ট জীবাণু সার ব্যবহার করতে হবে।

● **ফসফেট /পটাশ দ্রবীভূতকারী জীবাণু সার**

মাটিতে আবদ্ধ ফসফরাস এবং পটাশিয়ামকে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কিছু কিছু জীবাণু বা অণুজীবী সাহায্য করে। অদ্রাব্য বা আবদ্ধ ফসফরাস ফলে দ্রাব্য, সরল এবং গ্রহণযোগ্য রূপে চলে আসে। সিউডোমোনাস *(Pseudomonas),* ব্যাসিলাস *(Bacillus),* পেনিসিলিয়াম *(Penicillium),* অ্যাস্পারজিলাস

(Aspergillus) ইত্যাদি বহু অণুজীবী এই কাজে সাহায্য করে। এরা কিছু জৈব অ্যাসিড প্রস্তুত করে, যারা মাটিতে আবদ্ধ বা অদ্রাব্য ফসফরাসকে মুক্ত করে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও সহজলভ্য করে তোলে।

- **জৈব পদার্থ পচনে সাহায্যকারী জীবাণু সার**

ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস্ ইত্যাদি জীবাণু মাটির মধ্যে বসবাস করে এবং মাটিতে কোনো জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হলে তার উপর ক্রিয়া শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা জটিল জৈবসারকে সহজ, সরল অজৈব লবণে পরিণত করে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় এনে দেয়। যে সমস্ত ব্যাকটিরিয়া জৈব পদার্থের পচনে সাহায্য করে সেগুলি হল ঃ

চেইটোমিয়াম *(Chaetomium),* ট্রাইকোডার্মা *(Tricoderma),* সেফালোস্পোরিয়াম *(Cephalosporium),* হিউমিকোলা *(Humicola)* প্রভৃতি।

১০.১১ ফস্‌ফেট দ্রবণকারী জীবাণু [Phosphate Solubilising Microorganism (PSM)]

মাটিতে ফসফরাস জটিল রাসায়নিক পদার্থ ফসফেট হিসাবে অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে যেটা উদ্ভিদ এর বৃদ্ধিতে কোন সাহায্যে আসে না। ঐ জাতীয় ফসফেটকে দ্রবীভূত করার জন্য দু'জাতীয় জীবাণু ব্যবহার হয়। এরা হল ব্যাকটিরিয়া, যেমন ব্যাসিলাস, সিউডোমোনাস জাতীয় আর একটি ছত্রাক বংশোদ্ভুত যেমন অ্যাসপারজিলাস ও পেনিসিলিয়াম জাতীয়। এই জীবাণুগুলি মাটিতে যখন বংশ বৃদ্ধি করে সেই সঙ্গে মাটির অম্লত্বও বৃদ্ধি করে, যার ফলে অদ্রবীভূত অবস্থার ফসফেট দ্রবীভূত অবস্থায় পরিণত হয়। মাটিতে ফসফরাসের পরিমাণ বাড়ায় এবং গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

গম ও আলু উৎপাদনে ব্যাসিলাস ও সিউডোমনাস ঘটিত জীবাণুসার ব্যবহারে ভল ফল পাওয়া যায়।

ধানেতে অ্যাজোস্পিরিলাম ও সিউডোমনাস জীবাণুসার মিশ্র ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এর ফলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ বেশ কিছুটা কমানো যায়, এবং সেইসঙ্গে পারিপার্শ্বিক দুষণের মাত্রাও কমানো যায়। রাইজোবিয়াম ও ব্যাসিলাম ঘটিত জীবাণু সারেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

পটাশ (পটাশিয়াম) বহনকারী/জমায়েতকারী জীবাণুসার

গাছের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ছাড়া পটাশিয়ামেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। মাটিতে পটাশিয়াম অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে যেমন সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ইত্যাদির সঙ্গে জটিল অবস্থায় থাকে, যার ফলে গাছ সোজাসুজি সেটা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারে না। পটাশিয়াম বিভিন্ন রাসায়নিক

দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় যেমন মিউরিয়েট অফ পটাশ; পটাশিয়াম সালফেট ও পটাশিয়াম ফসফেট। যৌগ অবস্থায় থাকা পটাশিয়ামকে মুক্ত অবস্থায় আনার জন্য একজাতীয় জীবাণু ব্যবহার করা হয় যার নাম ফ্রাটুরিয়া-আরেনসিয়া (Fraturia aurantia)। এই জীবাণুসার ব্যবহারে ভাল ফল দেখা যায়। যেহেতু, পটাশিয়াম গাছের বৃদ্ধির জন্য একটা অন্যতম উপাদান এই জাতীয় জীবাণুসার ধান, গম, নানাজাতীয় শস্য ও তৈলবীজ এবং সবজি উৎপাদনকারী ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পটাশিয়াম গাছের কান্ডকে শক্ত করে ও নানা রোগপোকার আক্রমণ থেকে বাঁচার ফলে ফসলের উৎপাদন বর্ধিত হয় এবং গুণমানও বাড়ে।

১০.১২ কৃষিক্ষেত্রে জৈব বস্তুর পুনর্ব্যবহার (Reclying of Organic Matter in Agriculture)

● গুরুত্ব

কৃষিক্ষেত্রে ক্ষেতখামার থেকে আরম্ভ করে শহরের আবর্জনা বস্তুকে পুনর্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আজকাল চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা। সারা বছর নিবিড় চাষবাসের ফলে জমি থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদখাদ্য প্রচুর পরিমাণে অপসারিত হচ্ছে। ফলে গাছ বা ফসলের চাহিদা এবং মাটির যোগানে একটা বিস্তর ফারাক থেকেই যাচ্ছে। মাটির ক্ষুধা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য দরকার সমস্ত প্রকার উদ্ভুত বর্জ্যবস্তুকে মাটিতে আবার কাজে লাগানো। বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তার থেকে ফসল খাদ্য আহরণ করে। এতে বর্জ্যবস্তু থেকে পরিবেশ সুরক্ষিত হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে জৈববস্তুর পুনর্ব্যবহারে ফসলের ফলন খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। গাছের বাকি খাদ্য রাসায়নিক সারের মাধ্যমে জমিতে প্রয়োগ করে চাহিদা পূরণ করা হয়।

অত্যধিক চাষবাসের ফলে আমাদের কৃষিজমি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সবুজ বিপ্লবের শুরু থেকেই উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে শুধুমাত্র উচ্চমাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার হয়ে আসছে। এতে প্রয়োজনীয় জলের ভান্ডার রাসায়নিক সারের বিষক্রিয়া মাটিতে জমে থাকছে। ফলে মাটিতে জীবাণু তথা অণুজীবীর কার্যক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। কৃষিজমির মাটির প্রাণশক্তি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। বারবার ফসল চাষে অত্যধিক কর্ষণের ফলে মাটির জৈব বস্তু ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এতে মাটির গঠন বিন্যাস নষ্ট হচ্ছে। মাটির জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে রাসায়নিক সারের রূপান্তর ব্যাহত হচ্ছে এবং বেশি মাত্রায় সারের অপচয় হচ্ছে। নিত্য নতুন উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষবাসে মাটিতে দেখা দিচ্ছে বেশ কতকগুলি অণুখাদ্যের ঘাটতি।

● ভারতে সার ব্যবহার এবং কৃষি ফলন উৎপাদন চিত্র

প্রতি বছর ভারতের মাটিতে কীভাবে সঞ্চিত উদ্ভিদখাদ্য নিঃশেষিত হচ্ছে এবং মাটি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, নীচের সারণী থেকে তা সহজেই বিশ্লেষণ করা যাবে।

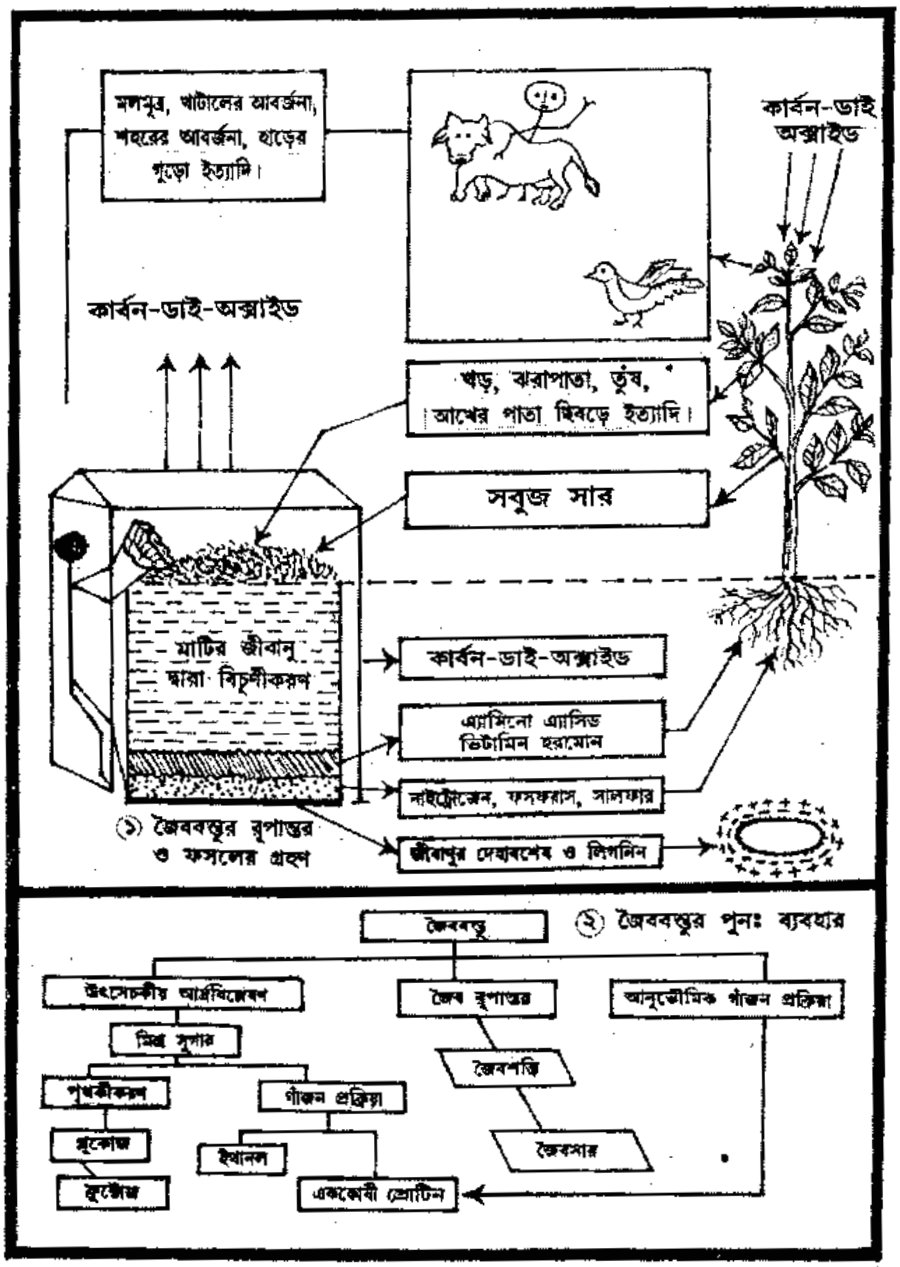

একটা কথা জেনে রাখা দরকার, এইসব জৈবসারের গুণমান নির্ভর করে জৈবসার তৈরির সময় নিয়োজিত জৈববস্তুর মান, উৎস এবং রাসায়নিক গঠনের ওপর। এইভাবে ধঞ্চে থেকে পাওয়া এবং কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরি জৈবসারের মান ভিন্ন মানের এবং প্রকৃতির হবে। পোল্ট্রির লিটার দিয়ে প্রস্তুত জৈবসার এইভাবে উন্নতমানের হবে।

● কৃষিক্ষেত্রে জৈববস্তুর পুনর্ব্যবহার প্রয়োগ পদ্ধতি

(১) সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করে মাটিতে মেশানো

এই পদ্ধতিতে চাষের আগে জমি প্রস্তুতের সময় শেষ চাষের মাথায় জৈববস্তুকে মাটিতে সরাসরি প্রয়োগ করে ভালো করে মেশাতে হবে। এতে খরচ কম। সবুজ সার চাষের পর যেমন মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে পচনক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়, তেমনি সরাসরি জৈববস্তু প্রয়োগের পর পচনক্রিয়ার মাধ্যমে তার অর্ন্তনিহিত উদ্ভিদখাদ্য মাটিতে যুক্ত হয়। মাটিতে 'হিউমাসের' পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মাটির আবদ্ধ ও অদ্রবণীয় উদ্ভিদখাদ্যের মুক্তি ঘটে, মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মাটি উর্বর হয়। এই উর্বর মাটিতে যে কোনো ফসলের উন্নত প্রযুক্তিতে চাষবাসের ফলে ফলন বেশি হয়। সাধারণত ২.৫ থেকে ৫ টন হেক্টর প্রতি এই জৈববস্তুর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। এটা নির্ভর করবে জৈববস্তুর গঠন, নাইট্রোজেনের পরিমাণ, পচনক্ষম অংশের পরিমাণ এবং মাটির গঠন, গ্রথন প্রকৃতি, জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর।

এতে জমিকে একমাসের মতো এমনি ফেলে রাখতে হয় জৈববস্তুর পচনক্রিয়ার জন্য। ঐ সময় কোনো ফসল চাষ করা যায় না।

(২) মালচিং বা আচ্ছাদন হিসাবে প্রয়োগ

সাধারণত দানাশস্যের খড়, ঝরা পাতা, জমির আগাছা ও অন্যান্য আবর্জনার আচ্ছাদন মাটির ভূমিক্ষয়রোধ, আর্দ্রতা সংরক্ষণ, বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্য করা, মাটির মধ্যে অণুজীবীর বংশবৃদ্ধি ঘটানোর কাজে সাহায্য করে। এ ছাড়া আচ্ছাদিত জৈববস্তু পচনক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে জমিতে শস্যের খাদ্যউপাদানের যোগান দেয় এবং ক্রমাগত মাটিকে উর্বর করে তোলে, মাটিতে উদ্ভিদখাদ্যের সাম্য আনতে সাহায্য করে।

(৩) কম্পোস্টের মাধ্যমে প্রয়োগ

খামার বাড়িতে বা অন্যত্র জৈববস্তু নিয়ে গিয়ে নির্ধারিত জৈবসার প্রস্তুতের গর্তে (ছাউনিযুক্ত) উপযুক্ত পদ্ধতিতে পচনক্রিয়া ঘটানো হয় এবং ২-২$\frac{১}{২}$ মাসের মধ্যে কম্পোস্ট প্রস্তুত হয়। তারপর এই কম্পোস্ট সার ফসল চাষের আগে জমি প্রস্তুতের সময় শেষ চাষে মেশানো হয়।

এই পদ্ধতিতে অণুজীবী জীবাণুরা অনুকূল পরিবেশে তাদের বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে জৈববস্তুকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সময়ে কম্পোস্ট সার তৈরিতে সাহায্য করে। এতে পরিমাণ মতো জল, বাতাসের উপস্থিতিতে অণুজীবীরা জৈববস্তুর অন্তর্নিহিত তাপশক্তি এবং খাদ্যকণার সন্ধানে তাকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকে। তাপশক্তি এবং খাদ্যকণা সরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে।

সুষ্ঠুভাবে এই প্রক্রিয়া দ্রুততরভাবে সম্পাদনের জন্য ২.৫-৫ সেমি আকারের জৈববস্তুর ব্যবহার, স্তূপের আকার (১.৫ মি. উচ্চতা, ২.৫ মি. প্রস্থ এবং জৈববস্তুর সরবরাহ পরিমাণের ওপর দৈর্ঘ্য) নির্ভর করে। এ ছাড়া প্রদত্ত জৈববস্তুতে কার্বন ঃ নাইট্রোজেনের কার্যকরী অনুপাত (C/N ratio), জলের পরিমাণ (৫০-৩০ শতাংশ—শুষ্ক জৈববস্তুর পরিমাপে), কাঁচা গোবর (শুকনো জৈববস্তুর ১০ শতাংশ), গোবর সার (১ শতাংশ), উর্বর জমির ঝুরঝুরে মাটি (১ শতাংশ), রকফসফেট (২ শতাংশ) ইত্যাদি উপকরণ প্রয়োজন। কম্পোস্ট পিটের ওপর খড়ের আচ্ছাদন, ১৫ এবং ৩০ দিনের মাথায় প্রয়োজনমতো জল ছিটিয়ে ভেজা জৈববস্তু শুকনোর সঙ্গে ভালো করে মেশানো এবং ওল্টানোর বিশেষ প্রয়োজন।

সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যেই এইভাবে উন্নত পর্যায়ের জৈবসার প্রস্তুত হয়। তৈরি জৈবসারে ০.৫-০.৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.৩-০.৬ ভাগ ফসফেট এবং .০০৭-১.০ ভাগ পটাশ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বেশ কিছু অণুখাদ্যও জৈবসারে থাকে, যা জমিতে ব্যবহারের পরবর্তীকালে ফসলকে তার শিকড়ের কাছে জোগান দেয়। সম্প্রতি আই. সি. এ. আর-এর পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত কিছু নীচুমানের রকফসফেট (যেমন—পুরুলিয়া ও মুসৌরিফস) ও পাইরাইট সহযোগে উন্নতমানের কম্পোস্ট সার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। একে **''ফসফোকম্পোস্ট''** (Phospho-Compost) বলা হয়। এর মান সিঙ্গল সুপার ফসফেটের সমান বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সুপারকম্পোস্টে ২-৩ ভাগ নাইট্রোজেন, ৭-৮ ভাগ ফসফেট এবং ১-২ ভাগ পটাশ থাকে।

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ১১ ❑ কম্পোস্ট সার প্রস্তুত পদ্ধতি

গঠন

১১.১ মিশ্র জৈবসার বা কম্পোস্ট

১১.২ কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবকের ভূমিকা

১১.১ মিশ্র জৈবসার বা কম্পোস্ট

কম্পোস্ট হল সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এবং সম্পূর্ণরূপে বা ভালোভাবে পচানো জৈবসার। বহু ধরনের পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ বা বর্জ্য পদার্থ থেকে প্রাপ্ত সারকেই কম্পোস্ট বা মিশ্র সার বলা হয়। কম্পোস্ট তৈরি হয় একটি জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেখানে অবাত এবং সবাত শ্বসনকারী জীবাণুগুলি বিভিন্ন রকম জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে তাদের মধ্যে অবস্থিত কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কমিয়ে দেয় এবং উদ্ভিদের খাদ্যউপাদানগুলিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শেষে যে ভালোভাবে পচানো সার পাওয়া যায়, তাকেই কম্পোস্ট বলে। **অন্যান্য সারের তুলনায় এই মিশ্র জৈব সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ,** কারণ এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ মাটিতে যোগ হয়, এছাড়া এতে থাকে উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী ও উপকারী আরো কিছু মুখ্য খাদ্যউপাদান।

কম্পোস্টের মধ্যে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাদ্যউপাদানের পরিমাণ নির্ভর করে বর্জ্য পদার্থগুলির উপাদান ও অনুপাতের উপর, যাদের পচিয়ে এই সার তৈরি করা হয়। সবাত জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন তাপ উৎপাদন করে এবং এর থেকে বিক্রিয়ার শেষে মুক্ত জীবাণু পাওয়া যায়। জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন এই তাপ ও মুক্ত জীবাণু কম্পোস্টের প্রত্যাশিত বা আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রূপান্তরিত জৈব পদার্থ বা হিউমাস, বা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অত্যাবশ্যক খাদ্যউপাদান, যেমন নাইট্রেট, সালফেট, ফসফেট ইত্যাদি কম্পোস্ট তৈরির সময়ে উৎপন্ন হয়।

● কম্পোস্ট সার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত গর্তের বিবরণ

বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়। মাটির উপরে আবর্জনা স্তূপাকৃতি করেও কম্পোস্ট প্রস্তুত করা হয়, আবার মাটিতে গর্ত বা পিট তৈরি করেও এই সার তৈরি করা যায়। পদ্ধতি অনুসারে গর্তের আকার বিভিন্ন হয়। সাধারণত অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় সার তৈরির জন্য যে গর্ত বা চৌবাচ্চা তৈরি করা হয় তা ৭-৮ ফুট চওড়া (২.১-২.৪ মি.) ও ৩ ফুট গভীর (৯০-১০০ সেমি.) এবং ৩০ ফুট লম্বা (৯ মিটার) হয়। তবে, লম্বা সাধারণত সুবিধা মত দৈর্ঘ্যের হয়। চৌবাচ্চাটি উঁচু এবং সমতল জায়গাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যেখানে

বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। চৌবাচ্চাটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে স্থায়ী হবে। চৌবাচ্চাটি মাটির তল থেকে প্রায় ১ ফুট (৩০ সেমি) উঁচুতে হলে ভালো হয়। এতে বৃষ্টির জল ঢুকতে পারবেনা। অন্যথায়, পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গর্ত করে কম্পোস্ট সার তৈরির অসুবিধা হল এতে স্থান / জায়গা নির্দিষ্ট বা স্থির হয়ে যায়, পরে সুবিধামত স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এতে কাজের অসুবিধা হতে পারে। এছাড়া খরচও বেশি হতে পারে।)

● কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

কম্পোস্ট প্রস্তুত করার সময় খেয়াল রাখার দরকার যেন কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল, খাদ্য উপাদানের জোগান (জীবাণুর জন্য), অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মান বা পি. এইচ-এর মান, টুকরো বা দানার আকার ইত্যাদি যেন সঠিক মাত্রায় এবং প্রয়োজন অনুসারে থাকে।

আমাদের দেশে **কম্পোস্ট তৈরির দু'টি পদ্ধতি** বিশেষভাবে প্রচলিত। এগুলি হল **হাওয়ার্ড ইন্দোর পদ্ধতি,** যা মূলত সবাত পদ্ধতি এবং **আচার্যের ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি,** যেখানে প্রাথমিকভাবে সবাত কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অবাত শ্বসনের মাধ্যমে কম্পোস্ট সার তৈরি করা হয়। এছাড়াও হাচিনসন ও রিচার্ডের অ্যাডকো পদ্ধতি ও এবং ফাউলারের সক্রিয় কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত আছে। এইসব পদ্ধতি মিলিয়ে মিশিয়ে আমাদের কিছু স্থানীয় বা দেশি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে।

ইন্দোর পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে গর্ত বা স্তূপ তৈরি করে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে, প্রথমে একটি উঁচু জমি, যার উপরিতল সমান, এমন স্থান বাছাই করে গর্ত খোঁড়া হয়। সাধারণত গর্তটির দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট (৯ মিটার), প্রস্থ ১৪ ফুট (৪.২-৪.৫ মিটার) এবং গভীরতা ৩ ফুট (৯০ সেমি বা প্রায় ১ মিটার) হয়। গর্তের চারধারে পৃষ্ঠটি ঢালু রাখা হয়। এরপর এই বড় গর্তটি (pit) দৈর্ঘ বরাবর সমান ৬টি ভাগে ভাগ করে, যে কোনও দিকের প্রথম অংশটি ফাঁকা রেখে দ্বিতীয় অংশ থেকে আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করা হয়। (গর্তের উপর ছাউনি থাকলে ভালো হয়।)

গর্তের মধ্যে আবর্জনা ভরাটের পদ্ধতি

(১) প্রথমে গাছপালার বিভিন্ন অংশ, উদ্ভিদ বা ফসলের অবশেষ ইত্যাদি বিছিয়ে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি) পুরু একটি স্তর তৈরি করতে হবে।

(২) এই স্তরের উপরে গোয়ালঘরের আবর্জনা, ফসলের বর্জ্য অংশ, খামারের আগাছা, খড়, খামার সার ইত্যাদি ৫ সেন্টিমিটার (২ ইঞ্চি) পুরু করে ছড়িয়ে দিতে হবে।

(৩) এর উপরে গোমূত্র দ্বারা ভেজা মাটি ও কাঠের ছাই অথবা শুধু মাটি দিয়ে একটি খুব পাতলা স্তর তৈরি করতে হবে।

(৪) এই স্তরের উপরে অল্প করে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

(৫) এইভাবে আগে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় দেড় মিটার (৫ ফুট) না হচ্ছে।

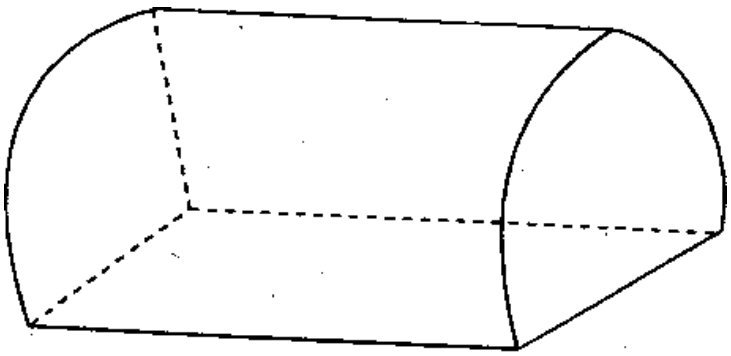

স্তূপ/গাদা (হিপ পদ্ধতি)

(৬) এরপরে ওই স্তূপের মধ্যে বায়ু চলাচলের জন্য শাবল দিয়ে খাড়াভাবে তিনটি সুরু ছিদ্র বা ফুটো করতে হবে, যার ব্যাস প্রায় ১০ সেন্টিমিটার। ইন্দোর পদ্ধতিতে যে গর্তের মধ্যে কম্পোস্ট সার তৈরি করা হয়, তার প্রস্থ হয় প্রায় ১৪ ফুট, অর্থাৎ ৪.২ মিটার। এই ৪.২ মিটার চওড়া গর্তের ঠিক মাঝখানে একটি ছোট সরু ছিদ্র করতে হবে এবং তার থেকে, আর দু'ধারের থেকে সমান দূরত্বে, প্রথম ছিদ্রটির দু'পাশে আরও দুটি ছোট সরু ছিদ্র করতে হবে। এইভাবে প্রায় ১ মিটার দূরত্ব রেখে পরপর তিনটি সরু ছিদ্র করতে হবে।

(৭) মূল বড় গর্তটি যা ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়, তার ৫টি অংশ আর্বজনা দিয়ে ভর্তি করতে হবে, বাকি একটি অংশ খালি রাখতে হবে, যাতে অন্য গর্তের আবর্জনা উল্টিয়ে রাখা যায়।

(৮) গর্তের আবর্জনাগুলি ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে একবার এবং ৫ সপ্তাহের মাথায় আর একবার উল্টেপাল্টে দিতে হবে।

সাধারণত এই পদ্ধতিতে প্রায় ৮০-১০০ দিনের মধ্যে সারটি ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে।

ইন্দোর পদ্ধতির সুবিধা

(১) গর্তের সমস্ত অংশে দ্রুত পচন শুরু হয়।

(২) মূল গর্তটি ছ'টি সমান অংশে বিভক্ত থাকায় কোন একটি ভাগের বা পার্টিশনের মধ্যে বর্জ্য জৈব পদার্থ দিয়ে ভরাট করার সময় তার উপর দাঁড়াতে হয় না। এর ফলে বেশি চাপ না পড়ায় আঁটসাঁট ভাবটা কম হয়, এতে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয় এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পচন দ্রুত হয়।

(৩) এই পদ্ধতিতে শহরের বর্জ্য পদার্থ এবং মল থেকেও কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা যায়।

(৪) অপেক্ষাকৃত কম সময়ে জৈবসার প্রস্তুত হয়।

ইন্দোর পদ্ধতির অসুবিধা

(১) কম্পোস্ট সারের মধ্যে উপস্থিত উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানের নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।

(২) ইচ্ছে মত স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

(৩) গর্তের উপর ছাউনি না দিলে বৃষ্টির জল ঢুকে অসুবিধা করতে পারে।

মিশ্র জৈবসার বা কম্পোস্ট ঠিকমত তৈরি হয়েছে কিনা জানার উপায়

(১) জৈবসারের রং তামাটে বা কালচে তামাটে বা কালো হয়।

(২) সমস্ত আবর্জনা ভালোভাবে পচে যাবে, তাতে কোনোরকম অপচা, না পচা বা আংশিক পচা দেহাংশ থাকবে না।

(৩) কোনও দুর্গন্ধ থাকবে না।

(৪) এক মুঠো জৈব সার হাতে নিয়ে চাপ দিলে সহজে গুঁড়িয়ে যাবে।

কম্পোস্ট তৈরির ব্যাপারে যে বিষয়গুলি জেনে রাখা খুবই প্রয়োজন

(১) আবর্জনাতে বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে জীবাণু মিশিয়ে দিলে পচন দ্রুত হয়। গোবর, গোমুত্র, মাটি ও জৈবসারের মধ্যে জীবাণু থাকে। তাই এগুলি উদ্ভিদের দেহাংশের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে পচন তাড়াতাড়ি হয়। আলাদা করে পাওয়া গেলে সরাসরি আবর্জনার সঙ্গে জীবাণু মিশিয়ে দেওয়া ভালো।

(২) সারের গাদায় বায়ু চলাচল যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। গাছের বেশি কচি ও সবুজ দেহাংশ ব্যবহার না করাই ভালো। বায়ু চলাচলের জন্য স্তূপটি মাঝে মাঝে উল্টে-পাল্টে দিতে হবে। বায়ু চলাচল ব্যাহত হলে—

(ক) জৈব সার তৈরি হতে বেশি সময় লাগবে;

(খ) সারটি দুর্গন্ধযুক্ত হবে;

(গ) কিছু অপচা বা আংশিক পচা জৈব দ্রব্য থেকে যাবে, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

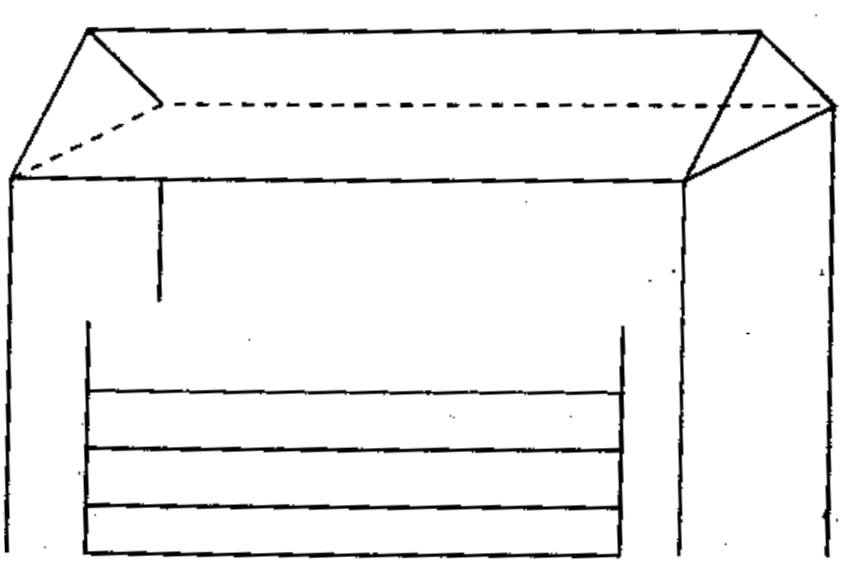

খাদ/গর্তে বিভিন্ন স্তর (পিট পদ্ধতি)

(৩) মিশ্র জৈবসার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জলের পরিমাণ সঠিক মাত্রায় বজায় রাখা খুবই জরুরি। পচনের শুরুতে জৈব দ্রব্যের মধ্যে প্রায় ৪৫-৫০ শতাংশ জল থাকে, যা পচনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে এবং অবশেষে ৩০-৪০ শতাংশে গিয়ে স্থির হয়। সূক্ষ্ম জৈব পদার্থগুলি, যেমন—তুষ, ভুষি ইত্যাদিতে জল দিলে জমাট বেঁধে যায়। তাই শুরুতে অল্প পরিমাণ জল দিতে হয়। পরে প্রয়োজনমত জলের ছিটা দেওয়া দরকার। জলের পরিমাণ কম হলে জীবাণুর সক্রিয়তা কমে গিয়ে পচন ব্যাহত হয়। আবার বেশি হয়ে গেলে বায়ু চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পচন ধীরে ধীরে হয়। এর ফলে সার তৈরিতে সময় বেশি লাগে এবং সারটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

(আবর্জনার উপরিতল ঢেকে রাখা দরকার, প্রয়োজনে উপরে ছাউনি দিয়ে নিতে হবে।)

● স্তূপে জলের পরিমাণ সঠিক আছে কিনা বোঝার উপায়

স্তূপের মধ্যে এক আঁটি শুকনো খড় ৫-৬ মিনিট ঢুকিয়ে রাখার পর যদি আঁটিটি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়, তবে ধরে নিতে হবে স্তূপে সঠিক পরিমাণে জল আছে। অন্যদিকে আঁটি বেশি ভেজা হলে বুঝতে হবে বেশি জল আছে। আবার আঁটি একেবারে শুকনো হলে জল কম আছে ধরে নিতে হবে।

● বাঙ্গালোর পদ্ধতি

আমাদের দেশের লোকসংখ্যা এখন একশো কুড়ি কোটিরও বেশি। এই বিশাল জনসংখ্যা থেকে উদ্ভূত মানুষের মল, মূত্র, কলকারখানার আবর্জনা, রাস্তার ময়লা, নর্দমার জঞ্জাল, কাঠের ছাই ইত্যাদিকে ব্যবহার করে

ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতির মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের কম্পোস্ট বা মিশ্র জৈব সার তৈরি করা যায়। সাধারণত এই পদ্ধতিতে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে শহরের আবর্জনা ও ময়লা ফেলে সার তৈরি করা হয়।

এই সার তৈরির জন্য শহর থেকে অন্তত এক মাইল দূরের কোনও স্থান (পশ্চিম দিকের অংশ ছাড়া যে কোনোদিকে) সুবিধামত আকারের গর্ত খুঁড়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়।

এই পদ্ধতিতে সার তৈরির সময়েও একটি উঁচু কিন্তু উপরিতল সমান এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। এই রকম জায়গায় একটি বড় গর্ত খুঁড়তে হবে যার প্রস্থ ১.৮-২.৪ মিটার (৬-৮ ফুট), গভীরতা ৯০-১০০ সেন্টিমিটার (৩ ফুট) এবং দৈর্ঘ্য হবে নিজস্ব সুবিধামত। তবে দৈর্ঘ্য ৯ মিটার (৩০ ফুট)-এর বেশি না হওয়াই ভালো। গর্তের মেঝেতে ঢাল রাখা দরকার এবং মেঝেটি পাকা হলে ভালো হয়।

● গর্ত ভর্তি করার পদ্ধতি

(১) প্রথমে গর্তটিকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এর জন্য একটি সরানো যায় এমন বিভাজক বা দেওয়াল বা পার্টিশন এর প্রয়োজন।

(২) বড় গর্তের একদিকে যেখানে গভীরতা একটু কম, সেইদিকে দেওয়াল থেকে ৬০-১২০ সেন্টিমিটার (২.৪ ফুট) দূরত্বে বিভাজক প্রাচীরটি বসাতে হবে। এর ফলে যে ছোট গর্তটি তৈরি হবে তার আকার হবে প্রায় (৬০-১২০ সেন্টিমিটার) × (১.৮-২.৪ মিটার) × ৯০-১০০ সেন্টিমিটার [(২-৪ ফুট) × (৬-৮ ফুট) × ৩ ফুট]।

(৩) বিভিন্ন রকম আবর্জনা সংগ্রহ করে তা ভালোভাবে মেশানোর পর মিশ্রণটি প্রথমে এই ছোট গর্তে সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে উপরে অল্প জলের ছিটে দিতে হবে। যে পরিমাণ শুকনো আবর্জনা

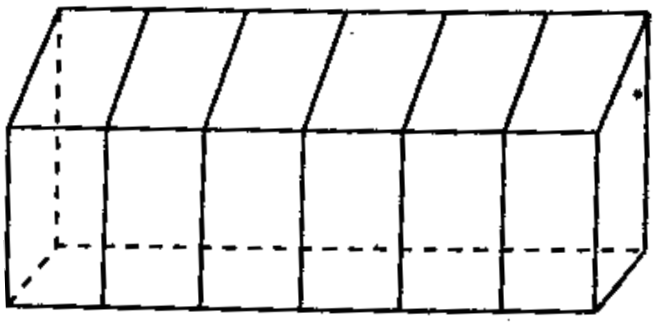

ছয় প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট বড় গর্ত

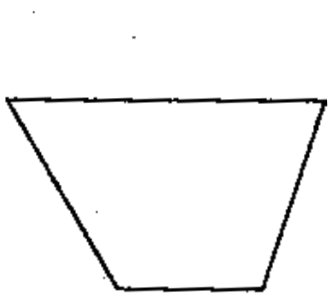

গর্তের ধরন (ঢালু পার্শ্বতল)

ছড়ানো হয় ঠিক সেই সমপরিমাণ বা তার দেড় গুণ জল ছেটাতে বা মেশাতে হবে। এভাবে একটি স্তূপ তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তির ফলে স্তূপের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে মাটি থেকে

৩০-৬০ সেন্টিমিটার (১-২ ফুট) উপর পর্যন্ত পৌঁছলে কাঁচামালের মিশ্রণ দিয়ে গর্ত ভরাট করা বা স্তূপাকার করা, বন্ধ করে দিতে হবে। এই পর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য সাধারণত ৭-৮ দিন সময় লাগে।

(৪) ছোট স্তূপটির উপরকার অংশ বা মাথাকে এবার গম্বুজের মতো গোলাকৃতি তৈরি করতে হবে যাতে জল পড়লে সহজে গড়িয়ে পড়ে। তারপরম মাটি কাদা দিয়ে লেপে দিতে হবে। [প্রায় ২.৫ সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি) পুরু করে মাটি দিয়ে স্তূপের উপরকার অংশ লেপে দিতে হবে]।

(৫) এইভাবে প্রথম গর্তটি ভর্তি হয়ে গেলে একই পদ্ধতিতে পরের গর্তগুলিও ভরাট করতে হবে।

(৬) কাদা দিয়ে লেপে দেওয়ার পর স্তূপটি আর ওল্টানো যাবে না এবং জলের ছিটেও দেওয়া চলবে না।

(৭) প্রায় ১৫০-২৫০ দিনের মধ্যে মিশ্র জৈব সার তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ এরপর তা ব্যবহার করা যাবে।

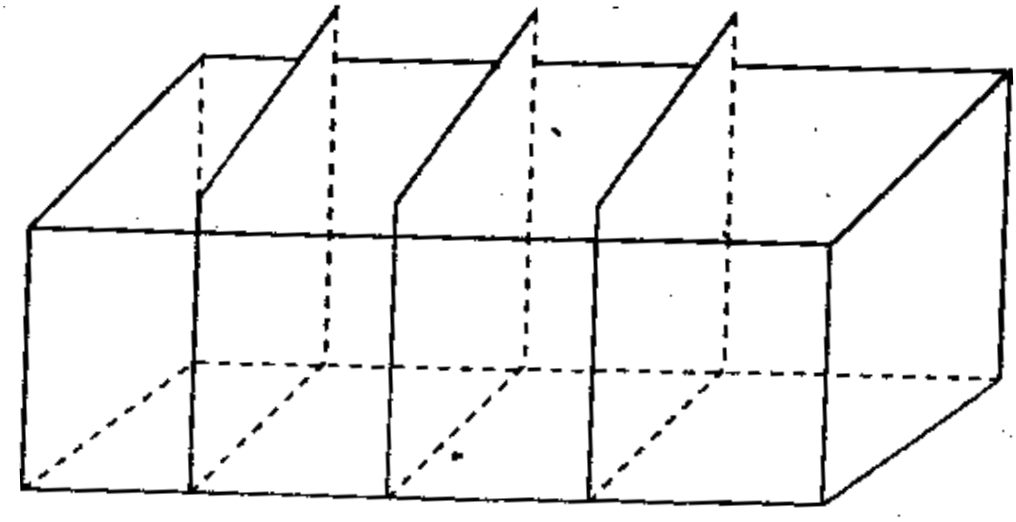

বিভাজক বা পার্টিশন দিয়ে বড় গর্তের বিভক্তকরণ

● বাঙ্গালোর পদ্ধতির সুবিধা

(১) এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত মিশ্র জৈবসারে দুর্গন্ধ থাকে না।

(২) রোগ-জীবাণুগুলিকে সহজেই দমন করা যায়, ফলে এই সার স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত।

(৩) উচ্চ তাপমাত্রায় মাছির শূক বা লার্ভা মরে যাওয়ায় মাছির উপদ্রব কম হয়।

(৪) অনেক আগাছার বীজও উচ্চ উষ্ণতায় বিনষ্ট হয়।

(৫) নাইট্রোজেনের ও জৈব পদার্থের অবলুপ্তি কম হয়। ফলে উৎপন্ন সারের মান ভালো হয় এবং এতে উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানের পরিমাণ বেশি থাকে।

(৬) একবার কাদা দিয়ে লেপে দেওয়ার পরে আর ওল্টাতে বা জলের ছিটা দিতে হয় না বলে পরবর্তীকালে দেখভাল কম করতে হয়। এতে পরোক্ষভাবে মজুরি বাবদ খরচও কম হয়।

● বাঙ্গালোর পদ্ধতির অসুবিধা

(১) এই পদ্ধতিতে কম্পোস্ট বা মিশ্র জৈবসার তৈরি করতে অনেক বেশি সময় লাগে।

(২) স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

(৩) গর্তের উপর ছাউনি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এতে খরচ বাড়ে।

● কোয়েম্বাটুর পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে খামারের বর্জ্য পদার্থ, গোবর জল ও হাড়ের গুঁড়ো পরপর রেখে স্তূপ তৈরি করা হয়। মাটির নীচে চৌবাচ্চা করে স্তূপ করা যায়। মাটির উপরের অংশকে কাদা দিয়ে লেপে দেওয়া হয়।

এই রকম বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মিশ্র জৈবসার তৈরি করা যায়। এছাড়াও চাষিরা কিছু সহজ বা স্থানীয় পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করে থাকেন, যেমন—(১) ড্রাম পদ্ধতি, (২) চৌদ্দ দিনের পদ্ধতি, ইত্যাদি।

● সক্রিয় পদ্ধতি বা অ্যাকটিভেটেড মেথড

ফাউলার ও রেজ এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। তাঁরা গোবর সার, সিউয়েজ অর্থাৎ ড্রেন বা নর্দমার আবর্জনা, স্লাজ বা পাঁক ইত্যাদিকে প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করেন।

● অ্যাডকো পদ্ধতি

অ্যাডকো (Adco) হল ইংল্যান্ডের একটি প্রাইভেট কোম্পানি যার পুরো নাম এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি (Agricultural Development Company)। এরা মিশ্র জৈবসার প্রস্তুতের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাকে অ্যাডকো পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অ্যাডকো পাউডারকে প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে খামারের বিভিন্ন আগাছা ও আবর্জনার স্তূপের উচ্চতা ১.৮ মিটার (৬ ফুট)-এর বেশি রাখা হয় না। প্রতি ৪৫.৪ কেজি (১০০ পাউন্ড) শুষ্ক পদার্থের জন্য অ্যাডকো পাউডার লাগে ৩.২ কেজি (৭ পাউন্ড) [প্রায় ১৪ : ১ অনুপাতে আবর্জনা ও পাউডার ব্যবহার করা হয়।]

● নভকম কম্পোস্ট

নভকম কম্পোস্ট গুণমানে উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক জৈব চাষ পদ্ধতির এক প্রধান উপাদান। এই কম্পোস্ট প্রকৃতিজাত শক্তির আধার। এই জৈব সার মাটি ও উদ্ভিদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

গ্রহণ করে। এই কম্পোস্ট খুব দ্রুত তৈরি হয়, গুণমানের উন্নত এবং মাটির উর্বরতা এবং উৎপাদিকা শক্তি ফিরিয়ে আনার এক আদর্শ জৈব আধার।

একটি আদর্শ বা ভাল কম্পোস্ট সারের যে পাঁচটি গুণ বা ধর্ম থাকা দরকার।

(১) মাটিতে ব্যবহার করার পরে কার্যকর হবে;

(২) সস্তা এবং সহজলভ্য দ্রব্য দিয়ে তৈরি করা যাবে;

(৩) দ্রুত তৈরি করা যাবে;

(৪) পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে নিরাপদ হবে;

(৫) আর্থিকভাবে সাশ্রয়কর বা সস্তা হবে।

এইসব গুণ নভকম কম্পোস্টে আছে। তাই নভকম কম্পোস্ট একটি আদর্শ কম্পোস্ট। এই কম্পোস্ট তৈরি করার জন্য যে কোনও জৈব পদার্থ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই জৈবসারে প্রচুর পরিমাণে উপকারী অণুজীবী উপস্থিত থাকে। এই অণুজীবীরা মাটির সাথে মিশে গিয়ে মাটিতে উপস্থিত উদ্ভিদের খাদ্যউপাদানগুলিকে ফসলের গ্রহণযোগ্য করে তোলে, মাটিকে উর্বর করে তোলে, ফসল উৎপাদনের আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলে। এই কম্পোস্ট তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ লাগে। এই কম্পোস্টে পটাশের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকে। কঠিন পরিবেশে (স্ট্রেস কণ্ডিশন) বা অনুর্বর জমিতে এই জৈবসার ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। **কার্যকারিতা, স্বকীয় গুণ বা উন্নতমান এবং সহজ পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া** নভকম কম্পোস্টের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যা এই জৈবসারকে করে তুলেছে অনন্য। কলকাতার এক গবেষণা সংস্থা 'ইনহানা বায়ো-সায়েন্সেস' এই নভকম কম্পোস্ট প্রথম তৈরি করে, অর্থাৎ এই সংস্থা এর আবিষ্কারক। নভকম কম্পোস্টের সাফল্যের পিছনে বহু বৈজ্ঞানিক কারণ বর্তমান। তাই এই সার ব্যবহার করার ফলে মাটির উপযুক্ত পরিবেশ খুব তাড়াতাড়ি এবং সাফল্যের সাথে ফিরে আসে।

নভকম সারের সাথে কেঁচো সার ও অন্যান্য কম্পোস্ট সারের তুলনামূলক চিত্র নীচে দেওয়া হল।

খাদ্যউপাদান	**নভকম জৈবসার**	**কেঁচো সার**	**সাধারণ কম্পোস্ট সার**
কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত	১৮ : ১	১৭ : ১	১২ : ১
মোট নাইট্রোজেন (%)	১.৭৩	১.৮০	১.৫০
মোট ফসফেট (%)	১.২১	১.৩২	০.৩২

মোট পটাশ (%)	১.৫০	১.৩০	০.৬৮
প্রতি গ্রাম ভেজা সারে অণুজীবীর সংখ্যা	২-১৮ × $১০^{১৭}$	১-৩ × $১০^{৯}$	১-৩ × $১০^{৯}$

● নভকম কম্পোস্ট তৈরি করার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা উপাদান

গোবরও বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ, বিশেষ করে সবুজ গাছপালা এই কম্পোস্ট তৈরির প্রধান উপাদান। শতকরা ৮০ ভাগ জৈব পদার্থের সাথে শতকরা ২০ ভাগ কাঁচা গোবর মিশিয়ে এই জৈবসার তৈরি করা হয়। এক টন নভকম কম্পোস্ট তৈরি করার জন্য প্রায় ১৬০০ কেজি সবুজ জৈব পদার্থ এবং ৪০০ কেজি কাঁচা গোবর লাগে। এই সার তৈরি হওয়ার সময় সৌরশক্তি এর মধ্যে সঞ্চিত হয় এবং এই সৌরশক্তি গাদার ভেতরকার উষ্ণতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া অণুজীবীরাও উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। প্রায় ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় অপকারী জীবাণু, আগাছার বীজ নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে কিছু তাপপ্রিয় উপকারী জীবের/অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা জৈব পদার্থগুলিকে পচিয়ে দ্রুত কম্পোস্ট তৈরি করে।

নভকম কম্পোস্ট তৈরি করার সময় তিনবার নভকম দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়। এই দ্রবণ বিভিন্ন রকম গাছপালা থেকে তৈরি করা হয়। প্রথম দিন প্রয়োজনমতো জৈব পদার্থ, যথা—সবুজ গাছ, আগাছা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা কুচি কুচি করে কেটে একটি পরিষ্কার জায়গায় বিছিয়ে প্রায় ১ ফুট পর্যন্ত উঁচু করতে হবে। এর উপর প্রতি লিটার জলে ৫ মিলি হারে নভকম দ্রবণ ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। এরপর এর উপর ৩-৫ ইঞ্চি কাঁচা গোবর ছড়াতে হবে। পুনরায় ১ ফুট উঁচু করে জৈব পদার্থ বিছিয়ে তার উপর নভকম দ্রবণ স্প্রে করতে হবে। এর উপর আবার ৩-৫ ইঞ্চি পুরু করে গোবর ছড়াতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে জৈব পদার্থ ও কাঁচা গোবর রেখে গাদার উচ্চতা ৬ ফুটের মতো করতে হবে। সবচেয়ে উপরের স্তরে জৈব পদার্থ থাকতে হবে। গাদার উচ্চতা কম হলে নভকম কম্পোস্টের মান খারাপ হবে। গাদার উচ্চতার উপর গাদার অভ্যন্তরের চাপ ও উষ্ণতা নির্ভর করে। উষ্ণতা কম হলে কম্পোস্টের গুণমান খারাপ হলে কম্পোস্ট তৈরি হওয়ার সময় বেড়ে যাবে। ভালোভাবে স্প্রে করতে প্রতি টন জৈব পদার্থের জন্য ৯০ মিলি নভকম দ্রবণ ও ১৮ লিটার জল লাগবে। গোবরের পরিমাণ কিছুটা কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু তা বলে গোবরের পরিমাণ খুব কম বা শূন্য হলে চলবে না। গোবর সৌরশক্তির শোষক ও ধারক হিসেবে কাজ করে এবং অণুজীবীর বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রথমবার গাদা তৈরি করার পর এইভাবে ৭ দিন রেখে দিতে হবে। এই ৭ দিনে গাদার আয়তন এবং উচ্চতা কমে যাবে। অষ্টম দিনে গাদা ভেঙে জৈব পদার্থগুলিকে উল্টে পাল্টে ভালোভাবে মিশিয়ে নীচের অংশ উপরে তুলে, উপরের অংশ নীচে রেখে পুনরায় গাদা তৈরি করতে হবে এবং একই হারে (৫ মিলি/লিটার) নভকম

দ্রবণ স্প্রে করতে হবে। এই সময়ে গাদার আয়তন প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রেও গাদার উচ্চতা কম করে ৫^{১}/২-৬ ফুট রাখতে হবে। পাশাপাশি দুটি গাদাকে মিশিয়ে একটি গাদা তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু গাদার উচ্চতা ৫^{১}/২-৬ ফুট রাখার কথা মাথায় রাখতে হবে।

এই সময় অষ্টম দিনে) প্রতি টন জৈব পদার্থের জন্য ৭৫ মিলি নভকম দ্রবণ এবং ১৫ লিটার জল লাগবে। এইভাবে আবার ৭ দিন রেখে দিতে হবে। পনেরো দিনের মাথায় গাদা ভেঙে পুনরায় অষ্টম দিনের পদ্ধতি অনুসরণ করে গাদা সাজাতে হবে। এক্ষেত্রেও গাদার উচ্চতা ৫^{১}/২-৬ ফুট রাখতে হবে। গাদা তৈরির সময় নভকম দ্রবণ (প্রতি লিটার জলে ৫ মিলি হারে) স্প্রে করতে হবে। এই সময় গাদার আয়তন আরও কমে যাবে, তাই দু'তিনটি গাদা একত্র করে একটি গাদা তৈরি করা যেতে পারে।

একুশ দিনের মাথায় কম্পোস্ট সার তৈরি হয়ে যাবে এবং তা জমিতে প্রয়োগ করা যাবে।

নভকম কম্পোস্টের গুণমান বা তৈরির সময় নির্ভর করে কাঁচামাল বা মূল জৈব পদার্থের উপর। পরিবেশের প্রভাবও থাকে। জৈব পদার্থের গাদায় যাতে খুব রোদ পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রয়োজনে, গাদার উপরিভাগ শুকিয়ে গেলে খুব হালকাভাবে জল দিয়ে গাদা ভিজিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বৃষ্টির জল গাদার পক্ষে খারাপ। বৃষ্টির জল থেকে গাদাকে বাঁচানোর জন্য স্বচ্ছ পলিথিনের চাদর দিয়ে গাদার উপর আচ্ছাদন দিয়ে দেওয়া ভাল।

নভকম কম্পোস্টের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক উপকারী অণুজীবী থাকে। এদের উপস্থিতিতে এই জৈবসারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। **প্রতি কেজি নভকম কম্পোস্ট তৈরি করতে মাত্র ১ টাকা খরচ হয়।** জৈব খামারে এই খরচ আরো কম হয়।

● চৌদ্দ দিনে জৈবসার তৈরির পদ্ধতি

কম্পোস্ট তৈরির এই পদ্ধতিতে বর্জ্য জৈব পদার্থগুলিকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে তার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে এক মিশ্রণ তৈরি করা হয়, যার অনুপাত হয় ১ : ২ থেকে ১ : ৩ (অর্থাৎ এক ভাগ গোবরের সঙ্গে দু'ভাগ জৈব পদার্থ বা তিন ভাগ জৈব পদার্থ)। এরপর এই মিশ্রণ দিয়ে ১২০ সেন্টিমিটার × ১২০ সেন্টিমিটার × ১২০ সেন্টিমিটার (৪ ফুট × ৪ ফুট × ৪ ফুট) আয়তনের একটি স্তূপ সাজনো হয়। স্তূপটির উপরে কলাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দু-একদিন পরে মিশ্রণের ভিতরের অংশ গরম হয়ে উঠলে তাকে খুব ভালোভাবে উল্টেপাল্টে মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে স্তূপের ভেতরের অংশ বাইরে চলে আসে এবং বাইরের অংশ ভিতরে চলে যায়। এরকমভাবে দু'দিন অন্তর অন্তর স্তূপাকার মিশ্রণকে ভালোভাবে উল্টেপাল্টে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে প্রায় ১৪ দিনের মধ্যে কম্পোস্ট সার তৈরি হয়।

এই পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে বেশি গোবর লাগে এবং ঘন ঘন উল্টেপাল্টে দেওয়ার জন্য শ্রমও বেশি হয়। মিশ্রণের ভিতরের অংশ সর্বদা আর্দ্র থাকা দরকার (ভেজা নয়)। এর জন্য মাঝে মাঝে জল ছেটাতে হয়। কোন কারণে যদি মিশ্রণটি ভেজা থাকে, তবে ছাই বা আরও কিছু শুকনো জৈব পদার্থ এর সঙ্গে মেশাতে হবে। মিশ্রণ ভেজা থাকলে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এই দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত দু'দিনের পরিবর্তে প্রতি একদিন অন্তর মিশ্রণটিকে উল্টেপাল্টে দিতে হয়।

● ড্রাম পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

একটি বড় ড্রামের গায়ে ১৫-২০ সেন্টিমিটার অন্তর কিছু ফুটো করা হয় এবং তলার দিকে কিছুটা বড় আকারের ছিদ্র করা হয়। নীচের তলার এই ছিদ্রটিকে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এরপর এই ড্রামের মধ্যে ঘাস, পাতা ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে ভরে দেওয়া হয়। এছাড়াও গোবর, মাটি ও জল দেওয়া হয়। ড্রামটিকে ঘরের উঠোনে অথবা সুবিধামতো কোনও জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে ঘাস, পাতা, গোবর, মাটি এবং জলের অনুপাত থাকে ৩ : ৩ : ২ : ১ : ১। ড্রাম পদ্ধতিতে তাড়াতাড়ি কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। প্রায় ৭০-৮০ দিনের মধ্যে এই কম্পোস্ট সার তৈরি হয়। এছাড়া এই পদ্ধতির সুবিধা হল সার তৈরি হওয়ার পর ড্রামের তলার ছিদ্রের ঢাকনা সরিয়ে রোজই প্রয়োজনমতো কম্পোস্ট সার বেরে করে নেওয়া যায়। আবার উপরের খোলা মুখ দিয়ে নিয়মিত কম্পোস্ট সার তৈরির উপাদান যোগ করা যায়।

ঠিকমতো অক্সিজেন বা বাতাসের চলাচল বজায় রাখার জন্য ড্রামের গায়ে ফুটো করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থগুলি যথাসম্ভব টুকরো টুকরো করে দেওয়া উচিত। মাঝে মধ্যে এগুলি উল্টেপাল্টে দিলে ভালো হয়।

● গোবর ছাড়া কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

কম্পোস্ট তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গোবর পাওয়া না গেলে একটি উঁচু সমতল (জল যাতে না দাঁড়াতে পারে) জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে প্রায় ৪.৫-৬ মি. × ১.৫-১.৮ মি. × ০.৯-১.৮ মি. আয়তন বিশিষ্ট গর্ত খুঁড়তে হবে। বিভিন্ন রকমের আগাছা, গাছের দেহাবশেষ, আখের ছিবড়ে ইত্যাদি ভালো করে মিশিয়ে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার (১ ফুট) উঁচু একটি স্তর তৈরি করতে হবে। এর উপরে গোবর জলের মিশ্রণ অথবা মাটি জলের মিশ্রণ সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর একইরকমভাবে পরপর কয়েকটি স্তর তৈরি করার পর যখন সম্পূর্ণ স্তূপটি ভূমি বা মাটির উপরিভাগ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার (২ ফুট) পর্যন্ত উঁচু হয়ে যাবে, তখন জল ও কাদার পাতলা স্তর দিয়ে স্তূপটির উপরকার অংশ (মাথা) লেপে দিতে হবে। প্রায় ৯০ দিন পরে গর্তের ভিতরের সমস্ত দ্রব্য বের করে মাটির উপরে গম্বুজের মতো স্তূপ করে রাখতে হবে। জল দিয়ে স্তূপটিকে সামান্য ভেজাতে হবে এবং তারপর জলকাদার প্রলেপ দিয়ে ঢাকতে হবে। প্রায় ১-২ মাস (৩০-৬০ দিন)-এর মধ্যে অর্থাৎ মোট

১২০-১৫০ দিন পরে কম্পোস্ট তৈরি হবে। এইভাবে তৈরি মিশ্র জৈব সারে প্রায় ০.৫ : ০.১৫ : ০৫ অনুপাতে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ থাকে।

এই পদ্ধতিতে ওল্টানো পাল্টানোর কোনো ব্যাপার না থাকায় এবং ঘন ঘন জলের ছিটে দেওয়ার প্রয়োজন না থাকায়, পরোক্ষভাবে মজুরি বাবদ খরচ কম হয়। তবে অসুবিধা হল এই পদ্ধতিতে সার তৈরি হতে অনেক বেশি সময় লাগে।

[গর্ত করে কম্পোস্ট সার তৈরির ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হল স্থির বা নির্দিষ্ট জায়গায় সারটি তৈরি হয়। এতে আবর্জনা দিয়ে গর্ত ভর্তি করার সময় এবং পরবর্তীকালে তৈরি সার জমিতে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বহন বাবদও, শ্রমিকের মজুরি বাবদ খরচ বেশি পড়ে।]

● কম্পোস্ট প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের নির্বাচন

সঠিক বা উপযুক্ত জৈব পদার্থ বাছাই করা কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(১) কিছু কিছু জৈব পদার্থ খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়, যেমন সতেজ কচি পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি। তেমনি আবার কিছু কিছু পদার্থ যেমন খড়, শুকনো কাণ্ড, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি পচাতে অনেক বেশি সময় লাগে। মিশ্র জৈবসার তৈরির সময় এই দুই প্রকার পদার্থই ব্যবহার করা ভালো।

(২) একইরকম জৈব পদার্থ থেকে সার তৈরি না করে বিভিন্ন রকম জৈব পদার্থের মিশ্রণ থেকে তৈরি করলে সারের মান ভালো হয়। (যেমন গোবর, গোমূত্র, কচুরিপানা, খড়, গাছের শক্ত ও নরম কান্ড, ছাল বা বাকল, লতাপাতা ইত্যাদি)।

(৩) যেসব জিনিস সহজে পচে না বা একেবারেই পচনযোগ্য নয়, যেমন কাঁচ, পাথর, ইট, পোরসেলিন/ চীনামাটির বাসন (কাপ, প্লেট ইত্যাদি), বোতল, প্লাস্টিকের টুকরো, ছেঁড়া কাপড়, পলিথিনের ব্যাগ প্রভৃতি বাদ দিতে হবে।

(৪) অবাঞ্ছিত উপদ্রব এড়াতে মাছ, মাংস ইত্যাদি জাতীয় জিনিস ব্যবহার না করাই ভালো।

(৫) ভাইরাস ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত গাছের অংশ অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

১১.২ কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাবকের ভূমিকা

কম্পোস্ট বা মিশ্র জৈবসার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে **পরিবেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ**। অর্থাৎ, এই সার তৈরির ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবেশগত নিয়ন্ত্রক রয়েছে। সাধারণত জৈবসার ব্যবহারের ব্যাপারে আমরা যতটা নজর ও গুরুত্ব দিয়ে থাকি, জৈব সার তৈরির প্রতি ততটা গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করি না। কিন্তু মিশ্র জৈবসারের মধ্যে বাঞ্ছিত বা

আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়ার জন্য সার তৈরির সময় সঠিক পদক্ষেপগুলি ঠিক ঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে নেওয়া খুবই জরুরি, এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্য গ্রহণ করা দরকার। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—

(১) **তাপমাত্রা ঃ** মিশ্র জৈবসার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিপাকীয় তাপ নির্গমণ এবং তাপের সংরক্ষণ দুই-ই বৃদ্ধি পায়। জৈব সার তৈরির সময় যে জীবাণুগুলি অংশগ্রহণ করে বা পচানোর কাজ করে, সেগুলি কেবল সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার বিস্তার বা সীমার মধ্যে সক্রিয় বা জীবিত থাকে। তাপমাত্রা এই সীমার বেশি বা কম হলে জীবাণুগুলির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমা বা ব্যাপৃতির (range) বাইরে থাকলে সার তৈরিতে অসুবিধা হয়। নির্দিষ্ট সীমার কম তাপমাত্রা থাকলে জীবাণুগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আবার তাপমাত্রা বেশি হলে জীবাণুগুলি মারা যায়। তবে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলি বিনষ্ট করার জন্য তাপমাত্রাকে ব্যবহার করে জৈব সার প্রস্তুতির স্থান বা গর্তকে শোধন করা যেতে পারে। অবশ্য এ কাজেও তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলে তা ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত পচনের সময় তাপমাত্রা ৫০°-৬০° সেলসিয়াস কখনো বা ৭০° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায়। সার গাদার কেন্দ্রস্থলে ও নীচের দিকেই তাপমাত্রা বেশি থাকে। মাটির উপরে তৈরি স্তূপে বা গাদায় তাপমাত্রার বৃদ্ধি বেশি হয়। গর্তে বা নালীতে তৈরি হলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি কম হয়। তবে, যেটুকু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় সেটা অনেকদিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

(২) **জল ঃ** জল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক / নিয়ন্ত্রক। কিন্তু, এটা জানা সত্ত্বেও অনেক সময় জলের পরিমাণ কম বা বেশি হয়ে থাকে। শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য, ব্যাকটিরিয়ার দল (কলোনি) তৈরির জন্য, মৌল বা লবণের মিশ্রণ প্রস্তুতিতে এবং গ্যাসীয় আদানপ্রদানের জন্য সঠিক পরিমাণে জল থাকা খুবই জরুরি। খুব বেশি বা খুব কম পরিমাণ জলের উপস্থিতি সার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জলের যে সর্বোচ্চ পরিমাণ উপস্থিতি অক্সিজেনের চলাচল ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে না, সেই পরিমাণেই জল থাকার দরকার। এতে সঠিক বিপাকীয় হার বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(৩) **অক্সিজেন ঃ** তাপ উৎপাদন ও বিভিন্ন রকমের তাপ নিয়ন্ত্রক বিক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বিঘ্নিত হয়। দেখা গেছে যে, অক্সিজেন ছাড়া তাপ উৎপাদন প্রায় একশো ভাগ কমে যায়। বায়ু বা অক্সিজেনবিহীন পরিবেশ এমন কতকগুলি অন্তর্বর্তী বিপাকীয় দ্রব্য তৈরি করে যা কম্পোস্ট তৈরির সময় এবং তৈরির পরেও অসুবিধার সৃষ্টি করে। বায়ু ছাড়া বা অক্সিজেন ছাড়া মিশ্র জৈব সার প্রস্তুতির সময় উৎপন্ন জৈব অম্ল, উদ্বায়ী সালফার ও নাইট্রোজেনের যৌগ এবং অন্যান্য বস্তু দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।

(৪) **বৃষ্টিপাত ঃ** যদি কম্পোস্টের স্তূপের ছাদ গোলাকার হয়, তাহলে বৃষ্টিপাতের ফলে বিশেষ কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে যদি অল্প বৃষ্টির ফোঁটা স্তূপের ভিতরে যায়, তাহলে পরবর্তীকালে

ওলোটপালোট করার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষতির প্রভাব কিছুটা কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু বাদলা আবহাওয়া সমস্যার সৃষ্টি করে যখন গর্তে অথবা বিনের মধ্যে কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। গর্তের মাথাও গোলাকৃতি হিসেবে তৈরি করা উচিত যাতে বৃষ্টির জল সহজে গড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে গর্তগুলির সীমানা বা চারধার কংক্রিটের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) **অম্লত্ব-ক্ষারত্ব বা পি. এইচের (pH) মান ঃ** মিশ্র জৈবসার প্রস্তুতির সফলতা বা সারের গুণাগুণ অনেকাংশে নির্ভরশীল এই অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মানের উপর। ব্যাকটিরিয়া এবং অ্যাকটিনোমাইসেটিস সাধারণত ক্ষারীয় মাধ্যম পছন্দ করে (অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মান অর্থাৎ পি. এইচ-এর মান ৭-এর বেশি)। বায়ুবিহীন অবস্থায় বা অক্সিজেনের অভাবে পি.এইচ-এর মান কমে যেতে পারে কারণ, এই ক্ষেত্রে সন্ধানপ্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু উদ্বায়ী জৈব অ্যাসিড তৈরি হয়। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার কারণ, **অনেক সময় এই জৈব অ্যাসিডগুলি ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।** কম্পোস্ট তৈরির সময় আবর্জনাগুলির পচনের হার পি.এইচ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় (যখন পি.এইচ-এর মান প্রাথমিকভাবে ৬-৯ এর মধ্যে থাকে)। সার তৈরির শুরুতে পি.এইচের মান খুব কম থাকলে তা সার তৈরির প্রক্রিয়াতে বিঘ্ন ঘটায়।

মিশ্র জৈব সার বা কম্পোস্ট তৈরির সময় পি.এইচের মানের পরিবর্তন কেমন হবে, তা বাড়বে না কমবে, সেই সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। বেশিরভাগ বর্জ্য পদার্থের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পি.এইচ-এর মান থাকে ৬-এর কাছাকাছি (অর্থাৎ মাধ্যমটি কিছুটা অম্ল থাকে)। যদি অক্সিজেনের পরিমাণ সীমিত থাকে, তাহলে সার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই এই মান কিছুটা কমে যায়। যখন সার তৈরির প্রক্রিয়াটি পূর্ণমাত্রায় চলে, সেই সময় অ্যামোনিয়াকরণের ফলে পি.এইচের মান খুব দ্রুত বেড়ে যায় এবং ৮.৫-এর কাছাকাছি পৌঁছয়। যখন অ্যামোনিয়াকরণ প্রক্রিয়াটি কমতে থাকে, তখন পি.এইচের মান ৭.৫-৮.০-এর মধ্যে এসে স্থিতিশীল হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পি.এইচের এই পরিবর্তন পচনের হারের ক্ষেত্রে নির্দেশক বা ইঙ্গিতদায়ক বা সূচক (indicator) হিসাবে কাজ করে।

(৬) **আবর্জনার সহজলভ্যতা এবং তার ঘনত্ব ঃ** একক আয়তনের মধ্যে কতটা পচন হবে তা নির্ভর করে কী কী আবর্জনা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার পরিমাণ বা ঘনত্বের উপর। এর থেকে আবর্জনা স্তূপের সচ্ছিদ্রতা এবং তার ফলে অক্সিজেনের চলন ও তাপের স্থানান্তর সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। প্রাণীজ বর্জ্য পদার্থ থেকে কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে অনেক সময় আয়তন বাড়ানোর জন্য কাঠের গুঁড়ো, খড়, গাছের ছাল ইত্যাদি বালকিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে স্তূপের সচ্ছিদ্রতা বাড়ে কিন্তু শক্তির ঘনত্ব কমে যায়। স্তূপের উচ্চতা যদি ২ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম হয় না। কম্পোস্ট তৈরির

প্রক্রিয়ায় পরের দিকে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বেশি সহজ হয় কারণ, এই সময়ে সহজপ্রাপ্য বর্জ্য পদার্থগুলি শেষ হয়ে যায়। খড়, পাতা ইত্যাদি থেকে কম্পোস্ট তৈরির সময় আয়তন বা স্তূপ বাড়ানোর জন্য বাইরের পদার্থ যোগ করার দরকার হয় না।

(৭) **আবর্জনার মিশ্রণ ঃ** ঘাসপাতা, রান্নাঘরের পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ, সবজির খোসা, ফলের খোসা, খাবারের উচ্ছিষ্ট, পশুপাখির মল, গোবর, গোমূত্র, কাঠের গুঁড়ো, খোল, প্রাণীর দেহের অংশ, মাটি ইত্যাদি উপযুক্ত পদ্ধতিতে বা মাত্রায় পচিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি হয়। কিন্তু সিন্থেটিক বা কৃত্রিমভাবে তৈরি সামগ্রী যেমন পলিথিনের ব্যাগ, রবার, কাঁচের জিনিসপত্র, কাপড় এসব কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এই দ্রব্যগুলি সাধারণত পচতে অনেক বেশি সময় নেয়, অথবা একেবারেই পচনশীল নয়।

(৮) **স্তূপের উচ্চতা ঃ** কম্পোস্ট সার তৈরির জন্য যে স্তূপ তৈরি করা হয়, তার উচ্চতা যদি খুব কম হয়, তাহলে উৎপন্ন তাপ খুব তাড়াতাড়ি হ্রাস পায়। ফলে আবর্জনা স্তূপের মধ্যে অবস্থিত ক্ষতিকর রোগ-জীবাণুর বিনাশ বা আবর্জনার পচনের জন্য উপকারী জীবাণুগুলির পক্ষে উপযুক্ত তাপমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এছাড়াও জলীয় বাষ্প দ্রুত কমে যাওয়ার ফলে পচনক্রিয়া বিলম্বিত হবে। সাধারণত যে কোনও আবর্জনা স্তূপের সর্বাধিক উচ্চতা ১.৫-১.৮ মিটার এবং মিউনিসিপ্যালিটির টাটকা বর্জ্য বস্তুর সর্বনিম্ন উচ্চতা ১.০-১.২ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। শীতকালে উচ্চতা বাড়ানো যেতে পারে, গরমকালের তুলনায়।

● কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে মাধ্যমের অম্লত্ব-ক্ষারত্বের (পি.এইচ) মানের ভূমিকা

জৈব আবর্জনাগুলির পচনের সময় জীবাণুর দেহ থেকে নানারকম জৈব পদার্থ নিঃসৃত হয়, যা অম্লত্বের সৃষ্টি করে। এই অম্লত্ব পচনকে বিলম্বিত করে, কখনো কখনো পচনক্রিয়া এর ফলে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। পচনের জন্য আদর্শ পি. এইচের মান হল প্রশম থেকে সামান্য ক্ষারীয়। অম্লত্ব কমানোর জন্য অর্থাৎ পি. এইচের মান বাড়ানোর জন্য মাটি বা চুন মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যা পি.এইচের মানকে নিরপেক্ষ মানের (৭.০) কাছাকাছি নিয়ে আসতে সাহায্য করবে বা অম্লত্ব-ক্ষারত্বের পরিবর্তনকে আটকে দিতে পারবে।

● কিছুদিন অন্তর স্তূপ উল্টেপাল্টে দেওয়ার কারণ

কম্পোস্ট প্রস্তুতির সময় স্তূপে জীবাণুর সক্রিয়তা কমে গেলে তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে নামতে থাকে। এই সময় স্তূপটি উল্টেপাল্টে দিলে স্তূপের মধ্যে বায়ু চলাচলের উন্নতি ঘটে এবং অক্সিজেনের আদানপ্রদানও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জীবাণুর সক্রিয়তা পুনরায় বেড়ে যায় এবং পচনও চলতে থাকে। স্তূপটি এইরকমভাবে কয়েকবার উল্টেপাল্টে দিলে মিশ্র জৈব সার প্রস্তুতে সময় কম লাগে এবং সারের মানের উন্নতি হয়।

● কম্পোস্ট তৈরির সময় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার কারণ

মিশ্র জৈব সার তৈরির সময় টাটকা, কাঁচা ও অরূপান্তরিত জৈব পদার্থের সঙ্গে কাঁচা গোবড় ও গোমূত্র, জঙ্গলের মাটি, খানিকটা তৈরী কম্পোস্ট, রক ফসফেট, হাড়গুঁড়ো, ছাই প্রভৃতি মেশানো হয়ে থাকে। এই বস্তুগুলি কাঁচা জৈব পদার্থের পচনক্রিয়ার হার দ্রুত করতে সাহায্য করে। ফলে তাড়াতাড়ি সার তৈরি হয়। এই পদার্থগুলি পচনক্রিয়ায় সাহায্যকারী জীবাণুগুলিকে পুষ্টি জোগায়। এতে জীবাণুর পচানোর ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং উন্নতমানের সার পাওয়া যায়।

● কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর জীবাণুর বিনাশ

মানুষের মলমূত্র, নর্দমার বর্জ্য আবর্জনা ইত্যাদি দূষিত পদার্থ থেকে কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর রোগজীবাণুর বিনাশসাধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় ধরে রোগজীবাণু সহ আবর্জনাকে রাখতে পারলে ক্ষতিকর জীবাণুগুলির মৃত্যু ঘটে। নীচে সারণীতে কিছু কিছু জীবাণুর সঙ্কটময় তাপমাত্রার মান এবং সময়কাল নির্দেশ করা হল।

জীবাণু	তাপমাত্রা ও সময়কাল
সালমোনেল্লা টাইফোসা	৪৬° সেলসিয়াসের উপরে কোনও বৃদ্ধি হয় না। আধঘণ্টা ধরে ৫৫-৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং কুড়ি মিনিট ধরে ৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে জীবাণুটির মৃত্যু হয়।
সিগেলা প্রজাতি	এক ঘণ্টা ৫৫° সেলসিয়াস বজায় রাখতে হবে।
এসেরিকিয়া কোলি	বেশিরভাগই ৫৫° সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক ঘণ্টার মধ্যে এবং ৬০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় ১৫-২০° মিনিটের মধ্যে বিনষ্ট হয়।
এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা সিস্ট	৪৫° সেলসিয়াস উষ্ণতায় কয়েক মিনিটের মধ্যে এবং ৫৫° সেলসিয়াস উষ্ণতায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জীবাণুটির মৃত্যু ঘটে।
স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনেস	৫৪° সেলসিয়াস উষ্ণতায় দশ মিনিটের মধ্যেই বিনষ্ট হয়।
করিনিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি	৫৫° সেলসিয়াস উষ্ণতায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে বিনষ্ট হয়।
অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডেস ডিম	৫০° সেলসিয়াস উষ্ণতার উপরে এক ঘণ্টারও কম সময়ে জীবাণুটি বিনষ্ট হয়।

● মাছির নিয়ন্ত্রণ

মাছির নিয়ন্ত্রণ কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতির মধ্যে অনুসৃত বর্জ্য বস্তুগুলির পেষাই করা, ওলোটপালট করা, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে মাছির নিয়ন্ত্রণও অনেকাংশই করা সম্ভব। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে বর্জ্য বস্তুগুলিকে ওলোটপালট না করেও মাছি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মিউনিসিপ্যালিটির বর্জ্য বস্তু এবং মানুষের মলমূত্রের মিশ্রণ থেকে কম্পোস্ট তৈরির সময় ২৫ সেমি উচ্চতার একটি আবর্জনা স্তর গর্তের স্তূপের উপর তৈরি করতে হবে এবং তার উপরে ৫ সেমি উচ্চতার ধুলোবালির আর একটি স্তর থাকলে তা ঐ স্তূপের তাপমাত্রা বাড়াতে এবং একইসঙ্গে ক্ষতিকর জীবাণুর বিনাশে সাহায্য করে।

মাছি নিয়ন্ত্রণের আর একটি পদ্ধতি হল, কম্পোস্ট তৈরির পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে বর্জ্য বস্তুগুলির উপরে প্রথমে একটি ৫ সেমি উচ্চতার মাটির স্তর এবং তার উপরে ১৫ সেমি উচ্চতার শুকনো বর্জ্য পদার্থের আর একটি স্তর তৈরি করে তাতে আগুন দিয়ে দেওয়া।

● কম্পোস্ট তৈরির সময় বিভিন্ন পুষ্টি মৌলের হ্রাসের কারণ ও তার প্রতিকার

বিভিন্ন উপায়ে ও বহু কারণে উদ্ভিদের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় পুষ্টি মৌলগুলি মিশ্র জৈবসার তৈরি বা প্রক্রিয়া চলাকালীন বিলুপ্ত হয়ে যায় বা পরিমাণে হ্রাস পায়। যেমন—

(১) গোয়াল ঘরের মেঝে কাঁচা থাকলে গোমূত্র ওই মেঝেতে শোষিত হয়। গোমূত্রে প্রচুর ইউরিয়া থাকে যা মেঝেতে শোষিত হওয়ার ফলে সারের মাধ্যমে উদ্ভিদের কাছে আর পৌঁছয় না। ফলে ইউরিয়া মধ্যস্থ নাইট্রোজেনেরও অপচয় হয়।

প্রতিকারের উপায় ঃ

(ক) মাঝে মাঝে কোদাল দিয়ে গোয়াল ঘরের মেঝে খুঁড়ে মেঝের মাটি জৈব সার প্রস্তুতির স্তূপে স্থানান্তরিত করতে হবে।

(খ) কাঁচা মেঝের মধ্যে কিছু আলগা বা বালি মাটি ছড়িয়ে দিলে ওই মাটি গোমূত্র শোষণ করতে পারবে, যা পরে চেঁছে নিয়ে মিশ্র জৈব সার প্রস্তুতির স্তূপে ব্যবহার করা যাবে।

(২) গোয়াল ঘরের মেঝে পাকা হলে গোমূত্র নিকাশি নালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, ফলে গোমূত্রের ইউরিয়ার অপচয় হবে।

প্রতিকারের উপায় ঃ

(ক) নিকাশি নালীর শেষ প্রান্তে গোমূত্র সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেমন চৌবাচ্চা তৈরি

করে অথবা কোনও পাত্রের মধ্যে ওই ইউরিয়া ঘটিত গোমূত্র সংগ্রহ করে তা জৈবসার প্রস্তুতির স্তূপে ব্যবহার করতে হবে।

(খ) গোয়াল ঘরের মেঝেতে খড় বিছিয়ে রাখলে তা গোমূত্র শোষণ করে নেবে, পরে যা জৈবসার প্রস্তুতের জন্য আবর্জনা স্তূপে ব্যবহার করা যাবে। বিশেষ করে রাত্রিবেলা গোয়াল ঘরের মেঝেতে খড় বিছিয়ে রাখলে এবং পরে সেই খড় কম্পোস্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

(৩) গোমূত্রে যে ইউরিয়া থাকে তা আর্দ্র বিশ্লেষিত (জলের দ্বারা) হয়ে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া একটি গ্যাসীয় পদার্থ এবং সহজে বাতাসে উবে যায়। এতে অ্যামোনিয়ার মধ্যে যে নাইট্রোজেন থাকে তাও নষ্ট হয়।

প্রতিকারের উপায় ঃ

(ক) গোয়াল ঘরের মেঝে ও নিকাশি নালাতে প্রতিদিন সিঙ্গল সুপার ফসফেট বা জিপসাম ছড়িয়ে দিতে হবে। সাধারণত প্রতিটি গরুর জন্য ৫০০-১০০০ গ্রাম হারে এই সার ছড়াতে হবে। এতে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য ও কঠিন অ্যামোনিয়াম সালফেট গঠন করে। ফলে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেন হারিয়ে যেতে পারে না।

(৪) পচন প্রক্রিয়া চলাকালীন বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে বা কমে গেলে অ্যামোনিয়া দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে হারিয়ে যায়। কারণ, এই সময়ে অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে রূপান্তরিত হতে পারে না, ফলে নাইট্রোজেনকে ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

প্রতিকারের উপায় ঃ

(ক) পচনক্রিয়া চলাকালীন অক্সিজেনের প্রয়োজন, তাই স্তূপে বায়ু চলাচলের দরকার হয়। এর জন্য স্তূপটি একটু আলগাভাবে সাজানো উচিত এবং অতিরিক্ত জল ছিটানো বন্ধ করা উচিত। অ্যামোনিয়া একবার নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়ে গেলে আর বাতাসে উবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে নাইট্রোজেনেরও ক্ষয়/অপচয় হয় না।

(৩) স্তূপে জলের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে তরল চুঁইয়ে গাদা থেকে বেরিয়ে আসে, ফলে পুষ্টি মৌলগুলির অপচয় হয়। স্তূপ ওল্টানোর সময় জলের ছিটা দেওয়া হয়। অনেক সময় এই জলের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। আবার বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমেও অনেক সময় স্তূপে জলের মাত্রা বেশি হয়ে যায়।

প্রতিকারের উপায় ঃ

(ক) চুঁইয়ে আসা তরল সংগ্রহ করে পুনরায় স্তূপে প্রয়োগ করা যায় অথবা জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা করে নিয়ে চাষের জমিতে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়।

(খ) গোয়াল ঘরের খড়ের বিছানা, লতাপাতা বা উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আরও বেশি করে মেশাতে হবে, যাতে ওই পদার্থগুলি অতিরিক্ত জল শোষণ করে নেয়।

(গ) বৃষ্টির জলের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হল স্তূপের মাথায় ছাউনি দেওয়া, অথবা পলিথিনের চাদর, প্যাকেট বা শীট দিয়ে স্তূপটি ঢেকে রাখা।

(৬) জমিতে মিশ্র জৈবসার প্রয়োগ করার পর বেশ কিছুদিন ওইভাবে ফেলে রাখলে জৈবসার থেকে নাইট্রোজেনসহ অন্যান্য পুষ্টি মৌলের হ্লাস বা অবলুপ্তি ঘটে।

প্রতিকারের উপায় ঃ

(ক) মাটিতে কম্পোস্ট স্তূপ করে ফেলে রাখা চলবে না। প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে জমির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থগুলির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তাদের প্রাথমিক আয়তনের চেয়ে ২০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত আয়তন হ্রাস করা যায়। সাধারণত তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কম্পোস্টের যে ওজন হয়, তা তার প্রাথমিক জ্ঞানের ৫০-৮০ শতাংশ। যদি গৃহীত আবর্জনা বা বস্তুর মধ্যে খনিজ পদার্থ বা ছাইয়ের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে কম্পোস্টে পরিণত হওয়ার ফলে তার ওজনের হ্রাস কম হয়। কিন্তু জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকলে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তার ওজন হ্রাসের পরিমাণও বেশি হয়।

● কম্পোস্ট তৈরিতে অংশগ্রহণকারী জীবাণু

সবাত কম্পোস্টিং প্রক্রিয়ায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ব্যাকটেরিয়া, অ্যাকটিনোমাইসেটিস এবং ছত্রাক। মাঝারি তাপমাত্রা সহনশীল ব্যাকটেরিয়া কম্পোস্ট প্রস্তুতির প্রারম্ভিক সময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রায় ৫-১০ দিন পরে বেশি তাপমাত্রা সহনশীল ব্যাকটেরিয়াগুলি সচল হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সচল হয় অ্যাকটিনোমাইসেটিস। অ্যাকটিনোমাইসেটিস এবং ছত্রাকগুলি ৪৫-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাতেও সজীব থাকে।

● ফসফো-কম্পোস্ট

অম্ল বা অম্লধর্মী মাটিতে ব্যবহারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য জৈবসার হল ফসফো-কম্পোস্ট। বিভিন্ন ধরনের ফসলের অবশিষ্টাংশ গোয়াল ঘরের আবর্জনা, রান্নাঘরের বর্জ্য পদার্থ, ঝরা পাতা, নর্দমা ও শহরের

রাস্তার ময়লা, কাঁচা গোবর, গোবর সার, জমির মাটি, রক ফসফেট ও পাইরাইট (ধাতব সালফাইড) ইত্যাদি উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট বা বিশেষ অনুপাতে নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে স্তূপ তৈরি করতে হবে। এর জন্য ৪ মিটার × ৩ মিটার ক্ষেত্রফলের একটি উঁচু জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে দিনের বেশিরভাগ সময় রোদ আসে। প্রায় ১৫ কেজি জৈব আবর্জনা প্রথম স্তর হিসাবে তৈরি করে এর উপরে পর পর ইউরিয়া গোলা জল (আধ লিটার জলে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া), ১০ কেজি কাঁচা গোবর এবং ১০ লিটার জলের মিশ্রণ ও ৩ কেজি রক ফসফেট, ১ কেজি পাইরাইট, ১ কেজি জমির মাটি ও ২ কেজি গোবর সার ছড়িয়ে দিতে হবে। একের পর এক স্তর সাজাতে সাজাতে যখন জৈব আবর্জনা প্রায় ৫০০ কেজি হবে, তখন স্তূপটির চারপাশ ও উপরের অংশ মাটি ও গোবর গোলা জলের প্রলেপ দিয়ে একটি পলিথিনের চাদরে মুড়ে ভারি কাঠ, পাথর বা ইট দিয়ে চাপা দিতে হবে। প্রায় ২১-২৮ দিনের পর পলিথিনের চাদর সরিয়ে আবর্জনার স্তূপটি উল্টে-পাল্টে দিয়ে এবং তারপর অল্প জলের ছিটে দিয়ে আবার পলিথিনের চাদর দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। এইভাবে ৬০-৯০ দিনের মধ্যে প্রায় ২৫০ কেজি উন্নত মানের ফসফো-কম্পোস্ট পাওয়া যাবে।

● ফসফো কম্পোস্ট কী?

জীবাণু দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত আবর্জনা যখন জমিতে প্রয়োগের উপযোগী সারে রূপান্তরিত হয়, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাকে বলা হয় কম্পোস্ট সার। এই সার যখন ফসফরাস সমৃদ্ধ জৈববস্তু (খনিজ রক ফসফেট ও পাইরাইটের) সহযোগে তৈরি হয়, তখন তাকে বলে ফসফো কম্পোস্ট। অর্থাৎ, ফসফেট সমৃদ্ধ কম্পোস্ট সারকে ফসফো কম্পোস্ট বলে।

● ফসফো কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

সারাদিন রোদ পায় এমন একটি জায়গা পছন্দ করতে হবে। বিভিন্ন জৈববস্তুগুলি সমপরিমাণে ভালোভাবে মিশিয়ে ৫ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া স্থানে আবর্জনার প্রথম স্তরে ১৫ কেজি জৈবপদার্থ রাখতে হবে। এরপর ছড়াতে হবে অন্যান্য জৈব ও অজৈব বস্তু। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় পরপর ঐ স্তূপের উপর ছড়াতে হবে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ১/২ লিটার জলে গুলে এবং ১০ কেজি কাঁচা গোবর ও ৫০ গ্রাম জীবাণু এক বালতি জলে গুলে।

আবার ৩ কেজি রক ফসফেট, ২ কেজি গোবর সার, ১ কেজি পাইরাইট, ১ কেজি জমির মাটির উপর ১৫ কেজি মূল জৈববস্তুর আর একটি স্তর দিতে হবে এবং অন্যান্য উপকরণগুলি আগের মতো ছড়াতে হবে। এইভাবে পর পর স্তরে সমস্ত মূল জৈববস্তু ও অন্যান্য উপকরণ (মোট ৫০০ কেজি) স্তূপাকারে সাজানোর পরে স্তূপের উপরিভাগ ও চারদিকে দেওয়ালের গায়ে গোবর গোলা জলের প্রলেপ দিতে হবে। পরে পলিথিন শীট দিয়ে কয়েকটি ইটের সাহায্যে সমস্ত স্তূপটি ঢেকে দেওয়া দরকার, যাতে রোদে শুকিয়ে না যায় বা বৃষ্টির জল ঢুকতে না পারে।

৩-৪ সপ্তাহ পর স্তূপটি উল্টেপাল্টে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শুকিয়ে গেলে অল্প ছড়িয়ে আবার ঢেকে দিতে হবে। ২-৩ মাসের মধ্যে প্রায় ২৫০ কেজি (জমিতে প্রয়োগ করার উপযোগী) সার পাওয়া যাবে।

পত্র ঃ ১ | একক ঃ ১২ ❑ কেঁচো সার বা ভার্মিকম্পোস্ট

গঠন

১২.১ কেঁচোর জাত, বাসস্থান ও পরিবেশ

১২.২ কোঁচো সার তৈরির পদ্ধতি

১২.৩ ভার্মিওয়াশ

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন মাটিতে কেঁচোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুধাবন করেছিলেন। **কেঁচো হল কৃষি এবং কৃষকের পরম বন্ধু।** আধুনিক চাষবাসে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে আমরা বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার এবং কৃষিবিষ ব্যবহারে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এই চিরকালের পরমবন্ধু কেঁচোর বৃহৎ অবদানের কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। কেঁচো সার বা 'ভার্মিকম্পোস্ট' ব্যবহার সম্প্রতি সারা বিশ্বে আবার গুরুত্ব পাচ্ছে।

১২.১ কেঁচোর জাত, বাসস্থান ও পরিবেশ

জাত

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০০০-এর বেশি জাতের কেঁচো পাওয়া যায়। এর মধ্যে ভারতে পাওয়া যায় প্রায় ৫০৯টি জাতের কেঁচো। কেঁচো মাটিতে বসবাসকারী অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের শরীরে বিশেষ কোনো প্রত্যঙ্গ না থাকলেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হুক জাতীয় অবয়ব 'সিটি' (Setae) আছে। এগুলির সাহায্যে এরা মাটি আঁকড়ে থাকে এবং মাটির মধ্যে চলাচল করে।

সমস্ত জাতের কেঁচোকে ১০টি গোত্রে ৬৭টি গণের মধ্যে বিভক্ত করা যায়। এদের বেশির ভাগই অবশ্য স্থানীয়, যা ৪৭টি গণের অন্তর্ভুক্ত। সব জাতের কেঁচোই 'ভার্মিকম্পোস্ট' বা কেঁচো সার তৈরিতে সাহায্য করে। কিছু কেঁচো মাটির গভীরে বাস করে এবং মাটির সঙ্গে মিশ্রিত জৈব পদার্থ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আবার কিছু প্রজাতির কেঁচো মাটির ঠিক নীচের স্তরে বসবাস করে। এ ছাড়া যেসব কেঁচো মাটির ওপরে থাকে, তারা সেখানকার বিভিন্ন জৈব পদার্থকে নিজেদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এদের **এপিজেয়িক** (Epigeic) শ্রেণীর কেঁচো বলে। **ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য এই শ্রেণীর কেঁচোগুলিই বেশি ব্যবহার করা হয়।**

যেসব কেঁচো মাটির ওপর দিকে অবস্থান করে, তারা এই রাজ্যের জল-হাওয়ার বিশেষ উপযুক্ত। এরা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরিতে বেশ দক্ষ। এইসব **কেঁচো** প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এই বিশাল পরিমাণের জৈব পদার্থের মাত্র ৫-১০ শতাংশ কেঁচো তাদের শরীর গঠনের জন্য

ব্যবহার করে। বাকি ৯০-৯৫ শতাংশ বর্জ্য পদার্থ হিসাবে শরীর থেকে বের করে দেয়। এই খাদ্যগ্রহণ ও বর্জনের মাঝখানে কয়েকটি স্তর থেকে যায়, যা এই বর্জিত জৈব পদার্থের দ্রুত পচনে সাহায্য করে। কেঁচোর খাদ্যনালীতে প্রচুর পরিমাণে নানান ধরনের জীবাণু ও উৎসেচক থাকে। পচন প্রক্রিয়ার সময় তারা খাদ্যকণাগুলির সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। ফলে এইসব জৈব পদার্থ যখন কেঁচোর শরীর থেকে বর্জিত হয়, তখন এই জীবাণু ও উৎসেচকগুলি জৈব পদার্থের পচনক্রিয়াকে দ্রুতহারে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এইসব বর্জিত জৈব পদার্থ মোটামুটি এক মাসের মধ্যেই কেঁচো সারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সাধারণ জৈবসারের থেকে এই কেঁচোসারে খাদ্যউপাদানের পরিমাণও বেশি থাকে (সারণী-১)

সারণী-১ ঃ সহজলভ্য খাদ্যোপাদানের পরিমাণ ঃ দু'ধরনের কম্পোস্ট

জৈব আবর্জনা	কম্পোস্টে সহজলভ্য খাদ্যোপাদানের পরিমাণ (পিপিএম)					
	নাইট্রোজেন		ফসফরাস		পটাশিয়াম	
	১	২	১	২	১	২
রান্নাঘরের আবর্জনা	৪০৬০.০	৩৪৩০.০	৯০৮.৩	৪৮৪.৫	৬৩৫০.৫	৫১০০.০
গোবর	৩৭৮০.০	১৬৮০.০	১১৮৬.৫	৬২৬.৯	৭০৮০.০	৫৪০০.০০
পোল্ট্রির আবর্জনা	৩৪৩০.০	২৫২০.০	১২৪৮.৬	১১৩১.১	৪১৫০.০	৩৭০০.০০
পৌর আবর্জনা	৩০১০.০	২১৩৫.০	১০০৫.০	৪১৩.৪	২৯৫০.০	২৮০০.০
বিভিন্ন গাছের পাতা	৪২০০.০	৩২৯০.০	৫০১.০	১৫১.৯	২১৫০.০	১২০০.০০

১ = কেঁচোর সাহায্যে তৈরি, ২ = কেঁচো ছাড়া তৈরি।

বাসস্থান

সব ধরনের মাটিতেই কেঁচো থাকে, যদি সেই মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ ও জল থাকে। জলঙ্গ, ঘাসজমি, শস্যখেত, চাষোপযোগী জমি, বাগান, বীজতলা তৈরির জমি এবং এমনকী গ্রীনহাউসেও কেঁচো দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বাগিচা ফসলের জমিতে, বাঁশঝাড়ে, কলা বাগানে পাম গাছের গোড়ায়, খড়ের গাদার নীচের মাটিতে, এমনকী পাতার গোড়াতেও কেঁচো দেখা যায়। তবে **বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ জমি হল কেঁচোর আদর্শ বাসস্থান।**

ভার্মিকম্পোস্টিং-এ ব্যবহৃত কিছু কেঁচোর তালিকা

(১) ল্যাম্পিটো মরিটি

(২) এক্টাকিটোনা সিরেটা

(৩) পেরিওনিক্স এক্সক্যাভাটাস

(৪) আইসেনিয়া ফেটিডা

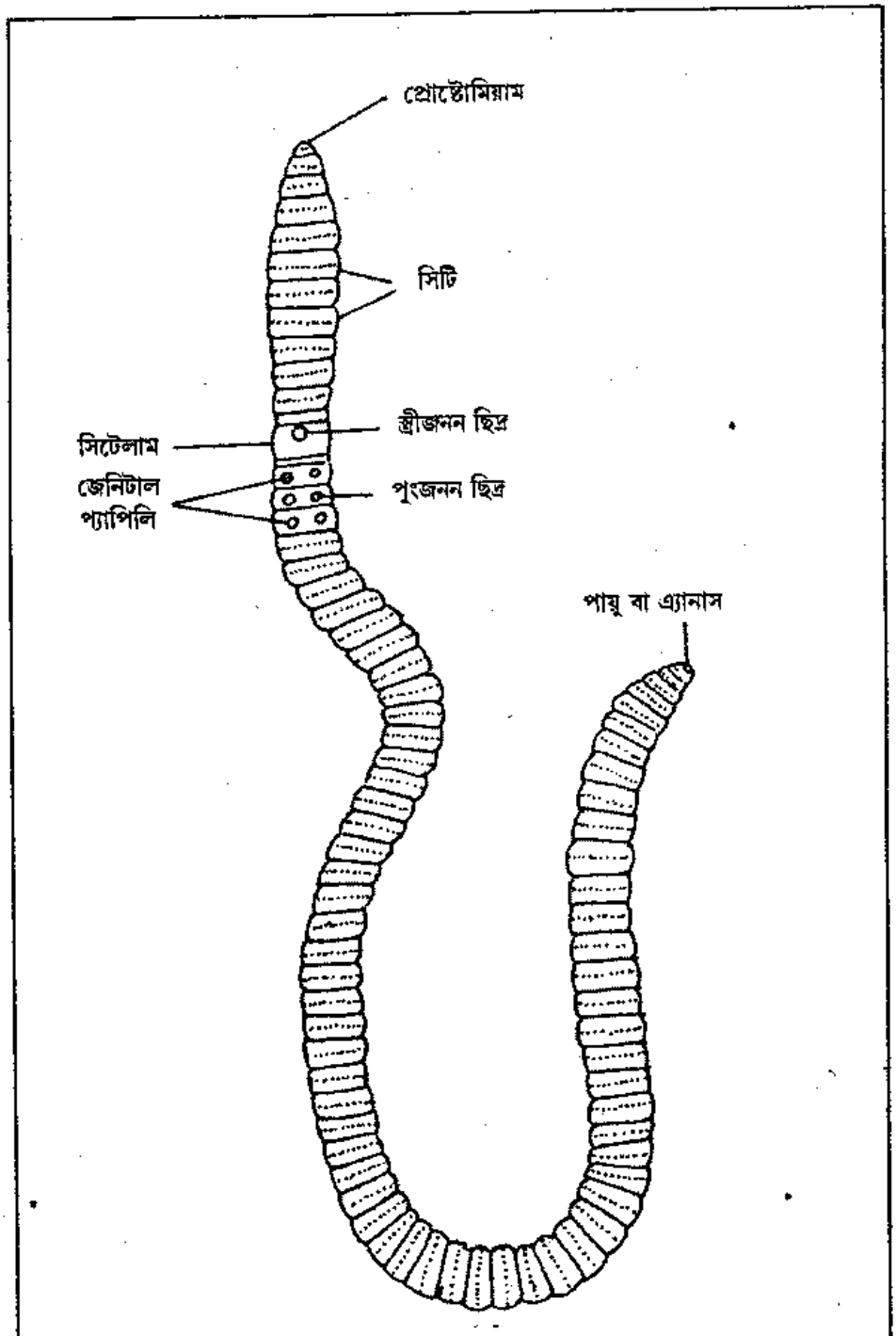

কেঁচোর বিভিন্ন অংশ

(৫) ইউড্রিলাস ইউজিনি

এই কেঁচোগুলি সাধারণভাবে তাদের দেহের ওজনের ২-৫ গুণ খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করতে পারে। এই খাদ্যের মাত্র ৫-১০ শতাংশ তাদের দেহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং বাকিটা তারা মল আকারে বর্জন করে দেয়। কেঁচোর অন্ত্রনালীতে অনুকূল পরিবেশের কারণে নানান ধরনের জীবাণু উৎসেচক ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে। এগুলি গৃহীত খাদ্যের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর কেঁচো যখন মলত্যাগ করে, তখন এই সব জীবাণু কেঁচোর মলের সঙ্গে তাদের দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সবাত পচনক্রিয়ার মাধ্যমে এই অর্ধপাচ্য জৈব পদার্থকে উচ্চমানের ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সারে পরিণত করে।

ওপরে উল্লিখিত কেঁচোগুলি অথবা আরো কিছু ধরনের কেঁচো এককভাবে বা মিলিতভাবে ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। **কোন ধরনের কেঁচো ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য ব্যবহার করা হবে তাক নীচে দেওয়া কয়েকটি ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে ঃ**

(ক) অধিকমাত্রায় খাদ্যগ্রহণ ক্ষমতা;

(খ) পরিবেশের তারতম্যের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা;

(গ) দ্রুত বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা;

(ঘ) তাড়াতাড়ি বড় হওয়া, এবং

(ঙ) চেম্বারে কেঁচো ছাড়ার পরে দ্রুত স্বাভাবিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা।

বিভিন্ন প্রজাতির কেঁচো নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে আইসেনিয়া ফেটিডা জাতীয় কেঁচোর কার্যক্ষমতা সব চাইতে বেশি। এছাড়া ইউড্রিলাস ইউজিনি, পেরিওনিক্স এক্সক্যাভেটাস ও ল্যাম্পিটো মরিটিও যথেষ্ট কার্যক্ষম। তবে ভার্মিকম্পোস্টিং যেখানে করা হবে সেই অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে এইসব কেঁচোদের কার্যক্ষমতার কিছু হেরফের হতে পারে।

মাটির ওপরে কেঁচো সার তৈরি করতে হলে জল জমবে না এমন একটু উঁচু জায়গা নির্বাচন করা দরকার। স্থান নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যেখানে প্রয়োজনমতো জৈব আবর্জনা সহজেই পাওয়া যায়। নির্বাচিত জায়গাটিতে যে কোনও রকমের একটি ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বৃষ্টির জল বা রোদে কম্পোস্ট তৈরিতে অসুবিধা হতে পারে। কেঁচো অন্ধকার পছন্দ করে। তাই ছাউনি দেওয়া জায়গাটি যথাসম্ভব ছায়াচ্ছন্ন অবস্থায় রাখতে পারলে ভাল হয়।

মোটামুটিভাবে এক কুইন্ট্যাল ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে প্রায় ১৫-১৬ কিউবিক ফুট জায়গার প্রয়োজন। অবশ্য আবর্জনার চরিত্র ভেদে এই আয়তনের কিছু হেরফের হতে পারে। ভার্মিকম্পোস্টিং করার জন্য সাধারণভাবে ৩ ফুট চওড়া, ২.৫ ফুট উঁচু ও অন্ততপক্ষে ১০ ফুট লম্বা একটি ঘেরা জায়গা মাটির ওপর বানিয়ে

নিতে হবে। এই চেম্বারের প্রস্থ ৩ ফুটের বেশি হলে অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যার অসুবিধা হবে। আবার উচ্চতা খুব বেশি হয়ে গেলে পচনক্রিয়া ভাল হবে না। অবশ্য চেম্বারের দৈর্ঘ্য ১০ ফুটের বেশি হলে কোনও অসুবিধা নেই। চেম্বার বানাতে অসুবিধা হলে মাটির ওপর পলিথিনের চাদর পেতে তার ওপর আবর্জনা স্তূপ করে রাখলেও চলবে। আবর্জনার সঙ্গে শতকরা অন্তত ২০-২৫ ভাগ গোবর মিশিয়ে ১০-১২ দিন একটু ভিজে অবস্থায় রাখতে হবে। এই সময় প্রাথমিক পচনের কারণে এই মিশ্রণের তাপমাত্রা অনেকখানি বেড়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে কমে যায়। তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এলে প্রতি কুইন্টাল মিশ্রণে ১৫০০-২০০০ কেঁচো ছাড়তে হবে এবং মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে মিশ্রণে ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতা রাখতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে, মিশ্রণে জলের ভাগ যেন খুব বেশি হয়ে না যায়। হলে, সেখানে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে ও কম্পোস্টিং ব্যাহত হতে পারে। আট দশ দিন অন্তর সমগ্র মিশ্রণটি উল্টেপাল্টে দিলে কম্পোস্টিং দ্রুততর হবে। সাধারণত ২৫-৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভার্মিকম্পোস্টিং সব চাইতে ভাল হয়। মিশ্রণের তাপমান এর চাইতে খুব বেশি বা কম হলে পচনক্রিয়ার গতি ব্যাহত হতে পারে। এজন্য শীতকালে ভার্মিকম্পোস্টিং হতে কিছুটা বেশি সময় লাগে। এছাড়া ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য ব্যবহৃত আবর্জনা মিশ্রণের পিএইচ মান মোটামুটি নিরপেক্ষ থাকা উচিত। না হলে কেঁচো এবং পচনক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জীবাণুদের অসুবিধা হতে পারে। তবে ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য সাধারণত যে সমস্ত আবর্জনা ব্যবহার করা হয় তাতে পিএইচ আল্লিক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কেঁচোর সংখ্যা, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং সর্বোপরি আবর্জনার গুণমান ঠিক থাকলে মোটামুটি ৩০-৪০ দিনের মধ্যেই ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত। এই সময় জৈব আবর্জনাগুলিকে সার থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। মিশ্রণের রঙ কালচে থেকে বাদামীর মধ্যে থাকে। এদের মধ্যে কোনও আঠালো ভাব থাকে না বা এদের থেকে কোনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় জল দেওয়া কিছুদিন বন্ধ রাখলেই সমগ্র মিশ্রণটি প্রায় ঝুরঝুরে হয়ে যাবে। এবারে এই মিশ্রণটিকে চালুনির সাহায্যে ছেঁকে নিলে ভার্মিকম্পোস্ট চালুনি গলে নীচে চলে যাবে এবং কেঁচোগুলি কিছু অর্ধপচিত আবর্জনার সঙ্গে ওপরে থেকে যাবে। এই একমাসের ব্যবধানে কেঁচোর সংখ্যাও অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। এইসব কেঁচোগুলিকে আবার নতুন আবর্জনার মিশ্রণে ছেড়ে দিয়ে আরও বড় আকারে ভার্মিকম্পোস্টিং করা যেতে পারে। যেখানে বৃহৎ আকারে ভার্মিকম্পোস্টিং করা হয় সেখানে অনেক সময় কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গেলে ওপর থেকে তীব্র আলো ফেলা হয়। যেহেতু কেঁচোর বেশি আলোতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেজন্য এইরকমভাবে আলো পড়লে কেঁচোগুলি চেম্বারের ভেতরে ঢুকে যায় এবং তখন ওপর থেকে ভার্মিকম্পোস্ট সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। তবে এই সব ক্ষেত্রে ভার্মিকম্পোস্টের সঙ্গে কম্পোস্ট না হওয়া কিছু জৈব পদার্থও চলে আসতে পারে, যার ফলে কম্পোস্টের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ভার্মিকম্পোস্টের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের মাত্রা সাধারণ কম্পোস্টের চাইতে বেশি থাকায় সাধারণ জৈব

সারের চাইতে একই পরিমাণ ভার্মিকম্পোস্ট থেকে অধিকতর পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভার্মিকম্পোস্টে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টিবায়োটিক, হর্মোন, উপকারী জীবাণু ইত্যাদির পরিমাণও বেশি থাকে। এর ফলে ফসলের স্বাস্থ্য, গুণমান ও ফলন বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকারের ফার্টিলাইজার কন্ট্রোল অর্ডার অনুসরে ভার্মিকম্পোস্টের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার তা সারণি-২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-২ ঃ ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য নির্ধারিত গুণমান

১।	আর্দ্রতা	ঃ ১৫-২৫%
২।	রঙ	ঃ ঘন বাদামী থেকে কালো
৩।	গন্ধ	ঃ দুর্গন্ধহীন
৪।	আকার	ঃ শতকরা ৯০ ভাগ ৪ মিমি.
৫।	বাল্ক্ ডেনসিটি	ঃ ০.৭-০৯. গ্রাম/সিসি
৬।	মোট জৈব অঙ্গার	ঃ ১৮.০% (কমপক্ষে)
৭।	মোট নাইট্রোজেন (N)	ঃ ১.০% (কমপক্ষে)
৮।	মোট ফসফরাস (P_2O_5)	ঃ ০.৮% (কমপক্ষে)
৯।	মোট পটাশিয়াম (K_2O)	ঃ ০.৮% (কমপক্ষে)
১০।	ভারী ধাতুর পরিমাণ	ঃ (সর্বাধিক, মিগ্রা/কেজি)
	ক্যাডমিয়াম (Cd)	ঃ ৫.০
	ক্রোমিয়াম (C_2)	ঃ ৫০.০
	নিকেল (Ni)	ঃ ৫০.০
	সীসা (Pb)	ঃ ১০০.০০

ভার্মিকম্পোস্ট-এর আর্থিক খতিয়ান

ভার্মিকম্পোস্ট খুব ছোট আকারে নিজের জমির চাষের প্রয়োজনে অথবা মাঝারি থেকে নাতিবৃহৎ ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে **বছরে ১০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভার্মিকম্পোস্টিং উৎপাদন কেন্দ্রের গড় আর্থিক খতিয়ান দেখানো হয়েছে**। স্থান বিশেষে এবং কেন্দ্রের দক্ষতার তারতম্যের জন্য এই হিসাবের কিছু হেরফের হতে পারে। কিন্তু এই খতিয়ান থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনের আর্থিক দিকটি কিছুটা বোঝা যাবে। বছরে ১০০ মেট্রিক টন ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে ২.৫´ উচ্চতা, ৩´ প্রস্থ এবং ১০´ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১৪টি চেম্বারের প্রয়োজন হবে। এইরকম প্রতিটি চেম্বার থেকে প্রতিবার প্রায় ১ টন মতো ভার্মিকম্পোস্ট অর্থাৎ, ১৪টি চেম্বার থেকে প্রতিবারে ১৪ মেট্রিক টন মতো ভার্মিকম্পোস্ট পাওয়া যাবে। বছরে প্রতিটি চেম্বারে ৭ থেকে ৮ বার ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি হওয়া উচিত। এর

ফলে সামগ্রিকভাবে এই চেম্বারগুলি থেকে প্রতি বছর ১০০ টন মতো ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন হবে। এই ভার্মিকম্পোস্ট টন প্রতি কমপক্ষে ৩৫০০ টাকায় বিক্রি হলে, এই ব্যবসায় আয় ব্যয়ের খতিয়ানটি মোটামুটি এইরকম দাঁড়াবে ঃ

উৎপাদন ক্ষমতা-১০০ মেট্রিক টন হিসাবে প্রতি বছরে উৎপাদনের খরচ

ক. স্থায়ী খরচ	
কম্পোস্টিং চেম্বার (১৪টি) ছাউনি সমেত	১,০০,০০০ টাকা
৪০,০০০ কেঁচোর মূল্য	২০,০০০ টাকা
আনুষঙ্গিক খরচ	৫,০০০ টাকা
মোট	১,২৫,০০০ টাকা
খ. প্রতি বছরের খরচ	
আবর্জনা (২০০ টন)	৫০,০০০ টাকা
বস্তাবন্দী করা ও অন্যান্য	২০,০০০ টাকা
স্থায়ী শ্রমিক (৩ জন) মাসে ৩০০০ টাকা হিসাবে	১,০৮,০০০ টাকা
মোট	১,৭৮,০০০ টাকা
গ. প্রথম বছরের খরচ	৩,০৩,০০০ টাকা
প্রথম বছরের বিক্রি	৩,৫০,০০০ টাকা
প্রথম বছরে লাভ	৪৭,০০০ টাকা
ঘ. দ্বিতীয় বছরের খরচ	১,৭৮,০০০ টাকা
দ্বিতীয় বছরে বিক্রি	৩,৫০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় বছর থেকে লাভ	১,৭২,০০০ টাকা

কোঁচো সার তৈরির পদ্ধতি

কেঁচোসার বা 'ভার্মিকম্পোস্ট' খুব সহজেই তৈরি করা যায়। নানা ধরনের জৈব পদার্থ, বর্জ্য পদার্থ—যা

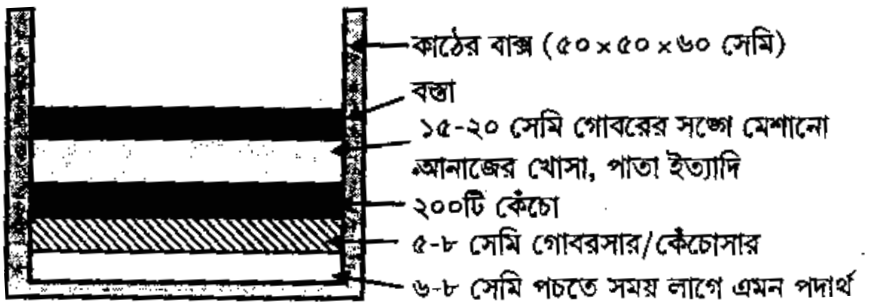

এতদিন ফেলে দেওয়া হত বা যা পচে গেলে পরিবেশ দূষণ করে, এখন অনায়াসে তাকে উন্নতমানের কেঁচো সারে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে। একটি গৃহস্থের ঘরে দৈনিক সমস্ত আবর্জনা একত্র করে এই সার তৈরি করা যাবে।

একটি বড় মাপের প্লাস্টিকের বালতি, ৫০ × ৫০ × ৬০ সেমি আকারের কাঠের প্যাকিং বাক্সও ব্যবহার করা যেতে পারে (চিত্র দ্রষ্টব্য)

(উৎস ঃ 'জ্ঞান প্রবোধিনী', পুণা)

আবার বাগানে বা ফসলের জমিতে করতে হলে সুবিধামতো মাপের, যেমন ২ × ১ × ১ মিটার গর্ত খুঁড়ে বা ঐ মাপের চৌবাচ্চা তৈরি করে তার ভিতরে কেঁচোসার তৈরি করা সম্ভব। এরকম একটি গর্তে বা চৌবাচ্চায় ১০-৪০ হাজার কেঁচো থাকতে পারে। এর থেকে মাসে ১ টন করে কেঁচো সার তৈরি হবে। চৌবাচ্চার তলদেশে ভাঙা ইটের টুকরো/বালি বিছিয়ে তার ওপর ১৫-২০ সেমি গভীর ভালো দোআঁশ মাটির স্তর দিতে হবে। এর ওপরে এবার শ'খানেক কেঁচো ছেড়ে দিন। অথবা কেঁচোর ডিমসহ ভার্মিকম্পোস্ট (কেঁচোর বর্জ্য পদার্থ) দেওয়া যেতে পারে। এবার এর ওপরে গোবর ও তারপর শুকনো পাতা/খড়ের স্তর বিছিয়ে দিন। মাঝে মাঝে জল ছিটোতে হবে, যাতে সমানভাবে ভেজা থাকে। **জল বেশি দেওয়া কখনো চলবে না।** ৪ সপ্তাহ পর গাছের সবুজ পাতা, সদ্যকাটা নরম ডালপালা, আনাজের খোসা প্রভৃতি ৫ সেমি পুরু করে ওপর থেকে বিছিয়ে দিন গর্ত না ভরা পর্যন্ত। ৩-৪ দিন অন্তর এবার একইভাবে খোসা, পাতা প্রভৃতি দিয়ে মাঝে মাঝে হালকা করে ওলট-পালট করে দিন। কেঁচোর ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতে পারবেন ভার্মিকম্পোস্ট ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে কী না। চৌবাচ্চার ওপর একটা চালা তৈরি করুন, যাতে কড়া রোদের তাপ বা বৃষ্টিতে ক্ষতি না হয়। জৈব পদার্থের রং যখন কালচে হয়ে আসবে, তখন জল দেওয়া বন্ধ করুন। সার তৈরি হয়ে গেলে কেঁচোরা গর্তের নীচে চলে যাবে। তখন ঝুরঝুরে দানার জৈব সার বার করে নিয়ে শুকিয়ে চেলে বস্তায় বা প্যাকেটে ভরুন। সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

ফসলের জমিতে সরাসরি কেঁচোসার তৈরি করতে হলে হেক্টর প্রতি ৫ টন মাপে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোর ডিমসহ ঐ সার প্রয়োগ করুন। তার ওপর ২.৫ সেমি গোবর বা প্রেসমাডের আস্তরণ (চিনি তৈরির আগে আখের রসের বর্জ্য পদার্থ) দিন। এর ওপরে থাকবে ১০ সেমি পুরু আখের ছিবড়ে, শস্যের খোসা বা অবশিষ্টাংশ বা শহরতলির আবর্জনা। একমাসের মধ্যে ডিম ফুটে কেঁচোরা বেরিয়ে জৈব পদার্থকে সারে পরিণত করতে শুরু করবে। **এভাবে ১০০০ টন ভেজা জৈব পদার্থকে ৩০০ টন সারে পরিণত করবে এই কেঁচোর দল। এজন্য ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে।**

এইভাবে পোল্ট্রির লিটার, পোল্ট্রির বর্জ্য পদার্থ, কৃষিজ বা কৃষি শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি কেঁচোর

সাহায্যে পুষ্টিকর উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত হবে। **প্রতি টন কেঁচোসারের বাজার মূল্য ২১০০ টাকা** (ট্যান্ডন, ১৯৯৫)। গোবর সার এবং ভার্মিকম্পোস্টের তুলনা করলে দেখা যাবে কার্বন ও ফসফরাস কেঁচোসারে বেশি থাকবে এবং নাইট্রোজেন প্রায় সমান সমান থাকবে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও প্রয়োজনীয় অণুখাদ্য স্বল্প মাত্রায় যোগ করে দিলে ফসলের উপকার হয়।

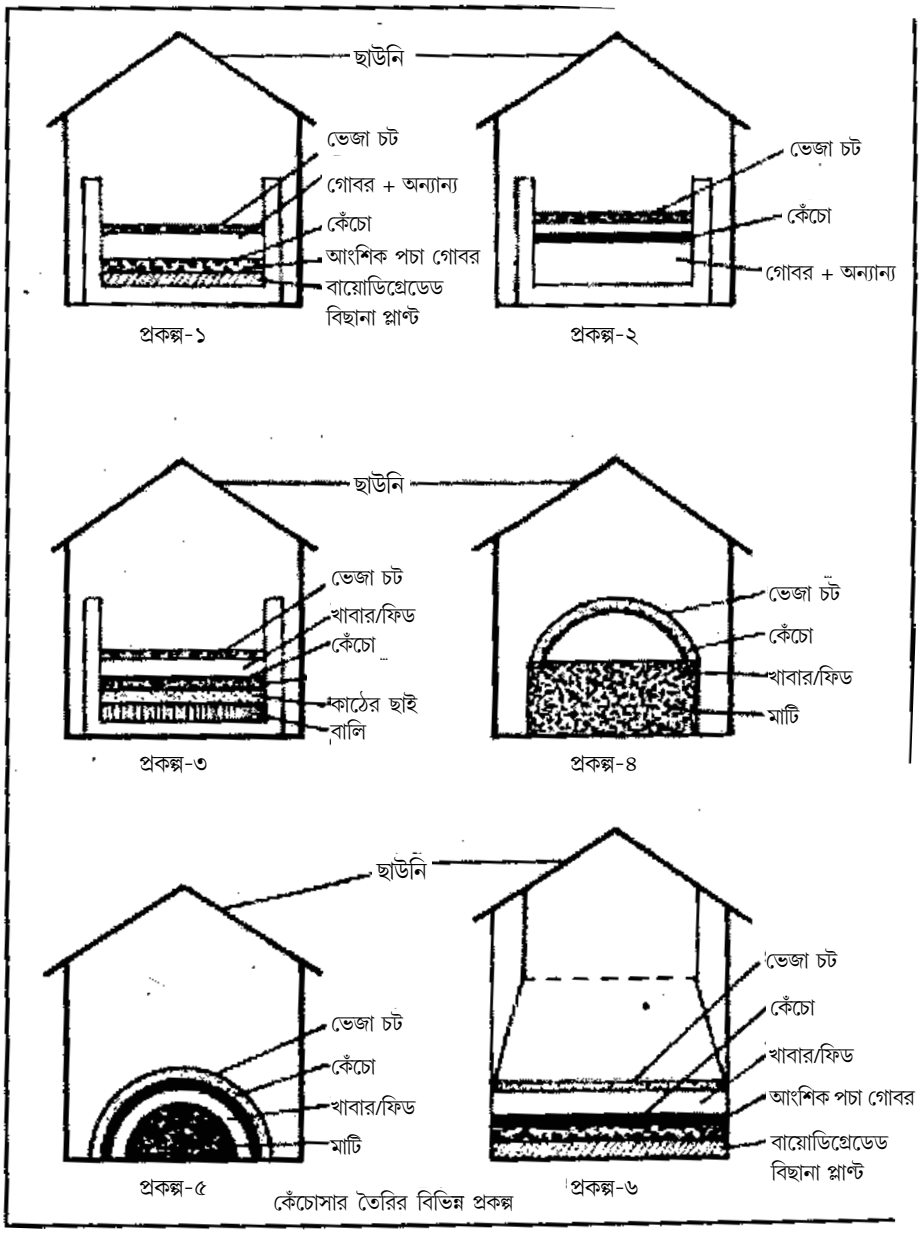

কেঁচোসার তৈরির বিভিন্ন প্রকল্প

● ভার্মিওয়াশ

ভার্মিওয়াশ ঃ সরল ভাষায় ভার্মিওয়াশ হল কেঁচো ধোয়া জল, যার মধ্যে কেঁচোর দেহ থেকে বের হওয়া রস বা নির্যাস মিশে থাকে। এর মধ্যে কেঁচোর দেহ বর্জিত পদার্থও থাকে। একটি টিউব বো চোঙের মধ্যে কেঁচো ভরে তার উপর থেকে জল ঢেলে নিচে এই ভার্মি ওয়াশ সংগ্রহ করা হয়।

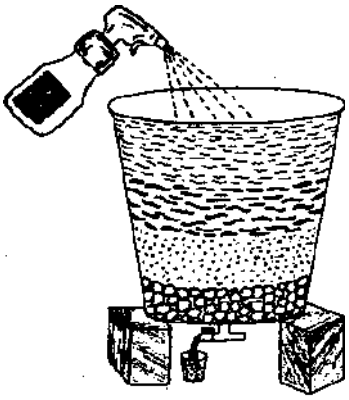

ভার্মিওয়াশ তৈরির এক সহজ পদ্ধতি

ভার্মি ওয়াশ হালকা হলুদ রঙের স্বচ্ছ তরল পদার্থ।

ভার্মিওয়াশের ব্যবহার

(১) তরল জৈবসার হিসেবে ভার্মিওয়াশ ব্যবহার করা হয়।

(২) এই তরল জৈবসার প্রধানত গাছের পাতায় স্প্রে করা হয়।

(৩) চারাবাড়ির চারা গাছ, লনের ঘাস এবং অর্কিড-এর এটি একটি উৎকৃষ্ট ভালো খাবার।

(৪) ফুলদানির জলে এই তরল দেওয়া হয় এবং এর ফলে ফুলদানির ফুল বহুদিন তাজা থাকে।

(৫) জীবাণুনাশক, ছত্রাকনাশক হিসেবে একটি ভালো কাজ করে।

গাছের শিকড়ের কাছে বা গোড়ার কাছে এই ভার্মিওয়াশ প্রয়োগ করা হয়। গাছ প্রতি প্রায় ১০০ মিলিলিটার এই তরল পদার্থ দেওয়া হয়। গাছের পাতায় স্প্রে করা হলে এই ১০০ মিলিলিটার ভার্মিওয়াশের সাথে জল মিশিয়ে লঘু করা হয় (প্রায় ৩০০ মিলিলিটার জল মিশিয়ে তরলের পরিমাণ ৪০০ মিলি করা হয়।)

ভার্মিওয়াশে মূল উদ্ভিদ খাদ্যউপাদান অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ ছাড়াও সালফার (গন্ধক), সোডিয়াম থাকে। এছাড়া এতে কিছু জীবাণুনাশক পদার্থ ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ মিশে থাকে।

একটি পাত্রে রাখা হালকা গরম জলে (৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার মতো) কেঁচো ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ৩-৪ মিনিট পর কেঁচোগুলি তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক উষ্ণতায় (২৫°-২৭° সেঃ) রাখা জল ভরা পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর দুটি পাত্রের জল একত্রে মিশিয়ে ভার্মি ওয়াশ প্রস্তুত করা হয়।

বেশি পরিমাণে ভার্মিওয়াশ প্রস্তুত করার পদ্ধতি

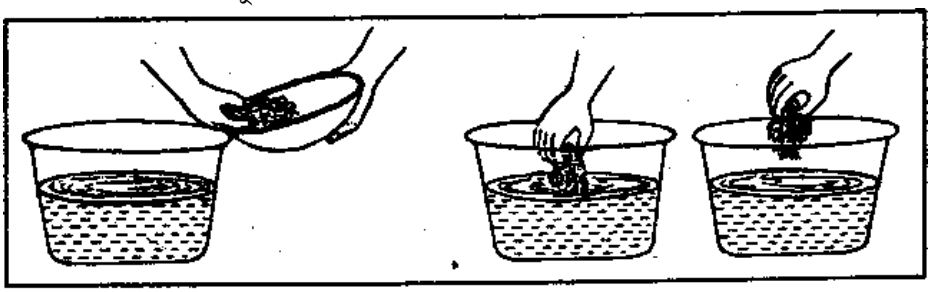

ভার্মিওয়াশ তৈরির পদ্ধতি

প্রায় ৫০-৬০ লিটারের প্লাস্টিক বা কাঁচের পাত্রে ওপর থেকে ধীরে ধীরে জল ঢালা হয় এবং নীচে কল খুলে ভার্মিওয়াশ সংগ্রহ করা হয়। বালির স্তর এবং পাথর বা ইটের টুকরোর মধ্যে মসলিন বা পাতলা পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে নিলে ভালো হয়।

ভার্মিওয়াশ বা কেঁচোর শরীর ধোওয়া জল

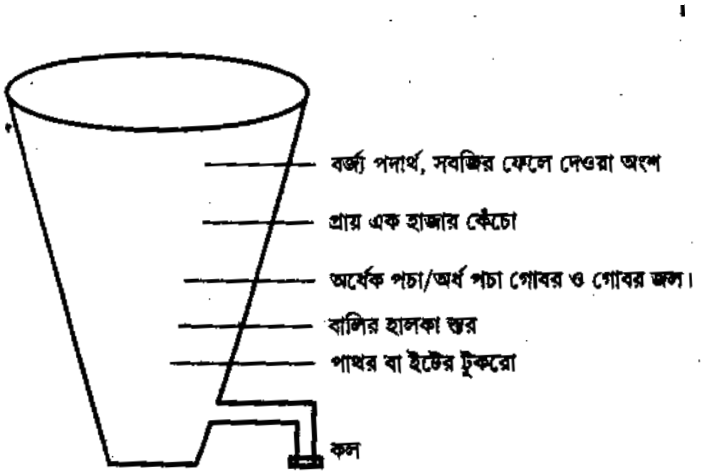

ভার্মিওয়াশ প্রস্তুত করার প্লাস্টিকের পাত্র

প্রায় এক কেজি পরিমাণ কেঁচো এক লিটার জলে ৩-৫ মিনিট ধরে ছেড়ে রাখলে নড়াচড়ার ফলে কেঁচোর শরীর থেকে এক রকমের রস বের হয় যা জলের সঙ্গে মিশে সিরাপের মত হালকা হলুদ বর্ণের তরল তৈরি করে। একে ভার্মিওয়াশ বলে। এই ভার্মিওয়াশের মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফেট, সালফেট ও ক্লোরাইড লবণ, সালফার, আয়রন ও সামান্য পরিমাণে অ্যামোনিয়া জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই ভার্মিওয়াশের সঙ্গে সম পরিমাণে জল মিশিয়ে বিভিন্ন রকম উচ্চমূল্যের রপ্তানিযোগ্য ফুল যেমন অ্যান্থরিয়াম, অর্কিড ইত্যাদিতে ছিটিয়ে বা স্প্রে করে দিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফুলের গুণমান ভালো হয়।

পত্র-২

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ১ ❐ কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক পেষ্টিসাইডের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফল

গঠন

১.১ কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক পেস্টিসাইডের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফল
১.২ সেচের জলের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার
১.৩ ফসলের কম উৎপাদন
১.৪ রাসায়নিক কীটনাশক, রাসায়নিক সার প্রভৃতির কুফল
১.৫ ফসলের কীটপোকার প্রাকৃতিক শত্রু হ্রাস
১.৬ পরিবেশ দূষণ-বাতাস, জল এবং মাটি দূষণ
১.৭ কৃষিতে বিভিন্ন রাসায়নিক এবং পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা
১.৮ জৈব বৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা
১.৯ কৃষিকাজে কৃষি রসায়নের ব্যবহার-কিছু কুফল

১.১ কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক পেষ্টিসাইডের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফল

কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক পেষ্টিসাইডের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফল

(a) বিগত পঞ্চাশ বছরে কৃষিক্ষেত্রে যে হারে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে তার চেয়ে অধিক হারে কমেছে জৈব সারের ব্যবহার। শস্য নিবিড়তা বাড়ায় কমেছে গোচারণ ক্ষেত্র, যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ায় কমেছে গবাদি পশুর সংখ্যা, শস্যাবশেষ এবং গোবর ও গোমূত্রের ব্যবহারও কৃষকগণ ভুলে গেছেন। ফলে দিনে দিনে মাটিতে জৈব পদার্থের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জমি হারাচ্ছে তার উর্বরাশক্তি, মাটি হারাচ্ছে তার স্বাস্থ্য। ফলে, কৃষক আজ যথেষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফলন পাচ্ছে না।

দিনের পর দিন অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি রাসায়নিক প্রয়োগের ফলে মাটি হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক গঠন, গ্রথন, জলধারণ ক্ষমতা, মাটি হারাচ্ছে তার প্রাণ--হিউমাস এবং উপকারী জীবাণু ভাণ্ডার। এভাবে চলতে থাকলে মাটি হয়ে যাবে অনুর্বর, বন্ধ্যা। উৎপন্ন ফসল হবে রাসায়নিক অবশেষযুক্ত, বিষাক্ত এবং পরিবেশ হবে কলুষিত। রাসায়নিক কৃষি বিষের ক্ষতিকারক দিকগুলি আরও বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) **মাটির স্বাস্থ্য ঃ** চাষবাসে জমির মাটিই হল প্রধান উপকরণ, যার সুস্বাস্থ্য রক্ষা জরুরী। মাটির প্রধান উপাদান হল বালি, পলি, কাদা, জৈব পদার্থ, হিউমাস, উদ্ভিদখাদ্য, জল, বাতাস, বিভিন্ন জীবাণু ইত্যাদি। এইগুলি সঠিক মাত্রায় সঠিক অবস্থায় থেকে উর্বরতার মান ঠিক রেখে জমির ফসল উৎপাদিকা শক্তি সর্বাধিক বজায় থাকলে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষিত বলে ধরা যায়। স্বাস্থ্যকর মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব পদার্থ, এর থেকে প্রস্তুত হিউমাস, জৈব পদার্থের সাথে থাকে অসংখ্য জীবাণু ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শেওলা, প্রোটোজোয়া কেঁচো। ইহারা নানাভাবে

জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এবং উদ্ভিদ খাদ্য যোগানে সাহায্য করে। কিন্তু মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি হলে উপকারী জীবাণুর পরিমাণও হ্রাস পায় এবং পরিনামে উর্বরতার হ্রাস ঘটে।

কি ভাবে মাটির স্বাস্থ্যহানি ঘটে :

- মাটিতে পরিমাণমত জৈব পদার্থের যোগানে ঘাটতি হলে।
- রাসায়নিক কীটনাশকের বিষক্রিয়ায়, জৈবপদার্থের অভাবে, মাটির অম্লত্বের হ্রাস বৃদ্ধিতে এবং উপকারী জীবাণু প্রভৃতি ধ্বংস হলে।
- ভূমিক্ষয়, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা প্রভৃতির ফলেও জমির স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

১.২ সেচের জলের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার

উদ্ভিদ জীবনে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও জীবনচক্রে জলের বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন ঃ

- সবুজ উদ্ভিদের দেহের শতকরা ৯০ ভাগ জল।
- বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন জলের সরবরাহ প্রয়োজন।
- মাটির মধ্যে খাদ্যোপাদান জলে দ্রবীভূত হলে গাছ তা মূলরোমের সাহায্যে শোষণ করে এবং জলের মাধ্যমে পাতায় পাঠায়।
- বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছের খাদ্যসহ জল পাতায় পৌছায় এবং জলের মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

সুতরাং ফসল চাষের জন্য পরিমাণমত জল একান্ত দরকার। বিভিন্ন ফসলের জলের প্রয়োজন বিভিন্ন পরিমাণ। কিন্তু জলসেচ ছাড়া শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে সারা বছর ফসলের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন উৎস থেকে সেচের জল পাওয়া যায় যেমন--

জলসেচের মাধ্যম	**মোট সেচ শেবিত এলাকা**
(১) কূপ	৩৮%
(২) গভীর ও অগভীর নলকূপ	৩৮%
(৩) জলাশয়	১৮%
(৪) সেচখাল	৪০%
(৫) অন্যান্য	৪%

জলসেচ পদ্ধতি : (১) মাটির উপর জলসেচ (Surface irrigation), (২) মাটির নীচে জলসেচ (Sub irrigation), (৩) বৃষ্টিধারার মত (sprinkler irrigation)।

সাধারণ ফসল চাষে এবং সেচ খাল থকে সেচে surface irrigation পদ্ধতিরই বেশী চলন কারণ এই পদ্ধতিতে বাড়তি খরচ নেই।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে সাধারণত প্লাবিত করে জলসেচ দেওয়া হয় (Flood irrigation) সেচখাল থেকে যে সেচ দেওয়া হয় সেটাও Flood irrigation পদ্ধতিতে করা হয়। এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ জল গাছের কাজে লাগে। বাকিটা গড়িয়ে (run off), চুইয়ে (bleaching) ও বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায়

অপচয় হয় এবং এই সাথে মাটিতে অবস্থিত উদ্ভিদ খাদ্যেরও অপচয় হয়। গভীর নলকূপ থেকে সেচের বেলায় অধিক জল উত্তোলনের ফলে Arsenic জাতীয় বিষ ভূত্বকের উপরে এসে দূষণের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে জমি অসমতল হলে নীচু জায়গা প্লাবিত হয়ে সেখানকার ফসলের ক্ষতি করে কারণ প্লাবিত জমির মাটিতে অক্সিজেনের অভাব হওয়ায় ফসলের শিকড় নষ্ট হয়। জমিতে অবস্থিত উপকারী জীবাণুও ধ্বংস হয়।

১.৩ ফসলের কম উৎপাদন

মাটির প্রাণ হল মাটিতে অবস্থিত জৈব পদার্থ। যথেষ্ট জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটে, মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদনগুলি উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকে, মাটিতে অবস্থিত অনুজীবিদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মাটির উর্বরতা এবং উৎপাদিকা শক্তি বজায় থাকে।

কিন্তু রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু হলে দেখা যায় যে এই সার ব্যবহারে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। সবুজ বিপ্লবের হাতিয়ার করা হয়েছিল—উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, সেচের জল ও কৃষি যন্ত্রায়ণ। জৈব সারের উপর কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নাই। ফলে ক্রমশঃ মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি বাড়তে থাকে এবং মাটি তার স্বাভাবিক উর্বরতা হারাতে থাকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে থাকে। নিম্নের সারণি থেকে ইহা বোঝা যায় ঃ

পশ্চিমবঙ্গের কয়েক বছরের মুখ্য ফসলের উৎপাদন ও সার ব্যবহারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল—

আর্থিক বসছর	২০০০-২০০১	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	০৫-০৬	০৬-০৭
মুখ্য ফসলগুলির মোট উৎপাদন (হাজার টন)	১৩৫৯৬	১৫৩৫৩	১৫৭৯৮	১৫৯৪০	১৫৫১৫	১৫৮২১
মোট N:P:K ব্যবহার (হাজার টন)	১০৬৫	১১৭৬.৬	১১১৬.২	১২৬১.৪	১২০৯৭	১৩৬৫.১
প্রতিকেজি N:P:K ব্যবহারে মোট উৎপাদন (কেজি)	১২.৭৬	১৩.৫	১৪.১৫	১২.৬৪	১২০৮২	১১.৫৯

উপরোক্ত সারনি থেকে প্রতিয়মান হয় যে ২০০৩-০৪ পর্যন্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করেও উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে নাই। অর্থাৎ প্রতিকেজি সার প্রয়োগে উৎপাদনের হার কম হয়েছে। এর মূল কারণ জমিতে জৈব সারের ঘাটতি হলে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

১.৪ রাসায়নিক কীটনাশক, রাসায়নিক সার প্রভৃতির কুফল

বর্তমানে কীট-পতঙ্গ, রোগজীবাণু, অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী এবং আগাছার কবল থেকে ফসল রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু কীটনাশক (Pesticides) হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহাদের প্রয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলেও অন্ততঃ ফসল রক্ষার কাজে সাহায্য করিতেছে।

কীটদমনের কাজে ব্যবহৃত অনেক রাসায়নিক বস্তু অতিশয় বিষাক্ত এবং যথাযথ সাবধনতার সহিত ব্যবহার না করলে মানুষ ও পশু-পক্ষীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষ বর্তমানে কীটনাশকগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারজনিত কুফল সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন। শ্রীমতী রাচেল কারসন (Rachael Carson) নামে জনৈকা আমেরিকার মহিলার 1962 খ্রীষ্টাব্দে লিখিত পুস্তক 'নীরব বসন্ত' বা **Silent spring** এই গণচেতনা আনিতে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং প্রামাণিক তথ্য উদ্ধৃত করিয়া একথাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে য়ে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহারের ফলে মানুষের নানা অকল্যাণ হইতেছে। যেমন মানুষ ও নানা জীবজন্তুর শরীরের চর্বিতে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন (Chlorinated hydrocarbon) শ্রেণীর দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে এবং দুধে, মাখনে ও পনীরে ঐ শ্রেণীর কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যাইতেছে. অপরিমিত মাত্রায় শরীরের ভিতর অনুপ্রবেশ করিলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর, মস্তিষ্কের উপর এবং পেশির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতে পারে। ইহা ছাড়া মানুষের পরোক্ষ অন্যান্য ক্ষতি হইতেছে। যেমন মাছ, মৌমাছি এবং পরজীবী ও পরভূক কীট ও অন্যান্য প্রাণীকুলের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে;ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ ও রোগ জীবাণুর প্রতিরোধের ক্ষমতা (Resistance) বৃদ্ধি পাইতেছে যাহার ফলে নির্দিষ্ট মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করিয়া কীটদমন হয় না; কীটনাশক প্রয়োগ করার পরে কীট পতঙ্গের দ্রুত পুনরুদয় হইতেছে (Resurgence) এবং অপরাপর গৌণ বা অপ্রধান কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদ রোগসমূহের অধিকতর ক্ষতিকর আকারে আবির্ভাব ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষণাগারে খাদ্যশস্য, শাক-সবজি, ফলমূল, উদ্ভিজ্জ তৈল, মাখন, ঘি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়াছে--অনেক ক্ষেত্রে এই অবষ্টিাংশের পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (world Health Organisation) কর্তৃক নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য দৈনন্দিন অন্তঃপ্রবেশ (Acceptable Daily Intake)-এর সীমার ঊর্ধ্বে। অনেক কীটনাশক যেমন ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, কার্বারিল, ফোরেট মাটিতে বসবাসকারী কোঁচোর সংখ্যা গুরুতররূপে হ্রাস করিতে পারে। ইহাছাড়া এই কীটনাশকগুলি গাছের বৃদ্ধির চরম পর্যায়ে বিশোষিত হইতে পারে।

পারদ ও তামার মত ভারী ধাতু দিয়া গঠিত ছত্রাকনাশকগুলি মাটিতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই ভারী ধাতুগুলি সুস্থিত এবং সহজে বিয়োজিত বা নিবদ্ধ হয় না। কীটনাশক প্রয়োগ করা গাছ বা গাছের অংশ মানুষ বা প্রাণী ভক্ষণ করিলে শেষ পর্যন্ত বিষক্রিয়াজনিত বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন হইতে সর্বাধিক বিপদের সম্ভাবনা আসিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হয় কারণ ইহা শরীরের ভিতর সঞ্চিত হয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয়। জৈব পারদ ঘটিত ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা খড় খাওয়ার ফলে গরুর দুধে পারদের সঞ্চয় লক্ষ্য করা গিয়াছে; পরিবেশের জৈবিক সংগঠনে দীর্ঘস্থায়িত্বের কীটনাশকগুলি যে শৃঙ্খলায়িত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে ইহা তাহারই একটি উদাহরণ।

ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর প্রায় অভঙ্গুর রাসায়নিক যৌগগুলি প্রয়োগ করার পরে ইকোসিস্টেমের

বিভিন্ন বায়োটিক ও এবায়োটিক (Biotic and abiotic) স্তর দিয়ে স্থানান্তরিত হবার সময় ক্রমশঃ জীব-বিবর্ধিত (Biomagnification) হইয়া মানুষ ও পশুপক্ষীর ক্ষতি করিতে পারে।

জৈব ছত্রাক ও জীবাণুনাশকগুলির মধ্যে পারদঘটিত যৌগগুলি মানুষ ও জীবজন্তুর মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে কারণ ইহারা খাদ্য-শৃঙ্খলের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন যৌগ মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে এবং মানুষের বৃক্কে সঞ্চিত হতে থাকে।

অধিকাংশ ক্লোরিনযুক্ত কীটনাশক জৈব পরিবেশের আপাত ক্ষতিকারক না হলেও ওদের অবশিষ্টাংশ যা পড়ে থাকে তা মানুষ সহ পশু ও পরিবেশের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। তাই উন্নত দেশগুলিতে এমন অনেক ক্ষতিকারক কীটনাশকের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিছুটা ব্যবহারের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। এ দেশেও ক্ষতিকারক অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। এবং তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, খাদ্যে বিষক্রিয়া ও পরিবেশ দূষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

কীটনাশকের ক্ষতিকারক অবশিষ্টাংশ খাদ্যে বিষক্রিয়া ও পরিবেশ দূষণের মাত্রা এতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে যে তা আর উপেক্ষা করার মতো নয়। অর্থাৎ এখনই সতর্কতা অবলম্বন না করলে অচিরে ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

জৈব ক্লোরিন ঘটিত কীটনাশক যেমন ক্লোরডেন, ডাইএলড্রিন, ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর প্রভৃতি কীটঘ্ন ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে ওগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের অবশিষ্টাংশ এখনও খাদ্য ও গোখাদ্যের বিষক্রিয়ার কারণ হয়ে আছে।

ভারতে গমে কীটনাশক দ্বারা দূষণের খবর পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে **ডিডিটি ও হেপ্টাক্লোর-এর দূষণ বেশি।** মহীশূর ও লুধিয়ানার কয়েকটি নমুনায় ম্যালাথিয়ান দূষণ লক্ষ করা গেছে। গুদামে কীটের হাত থেকে গমকে রক্ষা করার জন্য দানা ও চটের বস্তায় ম্যালাথিয়ন ছিটানোর দরুন এই দূষণ ঘটেছে।

সবজির নমুনা পরীক্ষারও এই দূষণ ধরা পড়েছে। যেমন টম্যাটো, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ঢ্যাঁড়শের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। অধিকাংশ নমুনায় ডিডিটি ও হেপ্টাক্লোর-এর অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকটিতে পাওয়া গিয়েছে অলড্রিন, ডাইঅলড্রিন, এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর ও এন্ডোসালফান-এর অবশিষ্টাংশ।

গোরু মোষের দুধেও কীটনাশকের দূষণ ঘটেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও পাঞ্জাবে গবাদি পশুর দুধের নমুনায় যে পরিমাণ হেপ্টাক্লোর-এর অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত দুটি গ্রামের দুধের নমুনায় উচ্চমাত্রায় ডিডিটি ও হেপ্টাক্লোর-এর অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া ঘি, মাখন ও মধুতেও কীটনাশক জনিত দূষণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সারণী-১ মানবদেহে কৃষি বিষের সহনযোগ্য মাত্রা
(প্রতি কেজি দেহের ওজনে মাইক্রোগাম হিসাবে)

বয়স	শরীরের ওজন	ডিডিটি	ডাইএলড্রিন	....	ম্যালাথিয়ন
প্রাপ্তবয়স্ক	৭০.০ কেজি	৩৫০	৭.০	৭০০	১৪০০
দু'বছর	১৩.৭ কেজি	৬৮	১.৪	১৩৭	২৭৪
ছ-মাস	৮.২ কেজি	৪১	...	...	১৬৪

এক মাইক্রোগ্রাম এক গ্রামের দশ লক্ষ তম ভাগ

সারণী-২ কৃষিদ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রীতে ..

ফসলের নাম	নমুনার সংখ্যা	২০০১ সাল বিষের দূষণ	নমুনার সংখ্যা	২০০২ সাল বিষের দূষণ
সবজি (১৭টি)	৭১২	৬১ (১২% সীমার উপরে)		৬৩.৫
ফল** (১২টি)	৩৭৮	৫৩ (সীমার নীচে)		

* হরিয়ানার হিসাবে সবই দূষিত ৪৬% সর্বোচ্চ সীমার উপরে

** ফরিদাবাদে সবজি ফল ও ফুল সবই দূষিত।

সারণী-৩ পশুখাদ্য, প্রাণীজাত দ্রব্য ও সেচের জলে কৃষিবিষের অবশেষ

ক্রমিক নং	দ্রব্য	নমুনা সংখ্যা	বিষক্রিয়া (α)	প্রধান অবশেষ	পরীক্ষা বর্ষ
১.	পশুখাদ্য	১২৫	৮১.০০	HGH, DDT	২০.১
২.	দুধ	৫৩৭	৬২.০০		২০০১
৩.	মাখন	১৮৪	৬৭.৪০		২০০১
৪.	সেচের জল				
	ক) সাধারণ জল	২৫৮	৬০.০০		২০০১
	খ) উপরিভাগের জল	২৫১	৭৩.০০		২০০১
	গ) ক্যানেলের জল	১০	সবই		
	ঘ) পুকুর	১১	সবই		

১.৫ ফসলের রোগ-পোকার প্রাকৃতিক শত্রু হ্রাস

ফসলখেতে যেমন অনিষ্টকারী পোকা আছে, তেমন তাদের খেয়ে ফেলার জন্য প্রাকৃতিক শত্রু হিসেবে পোকা বর্তমান। অনিষ্টকারী পোকাগুলিকে শত্রুপোকা (Pest) বলা হয় এবং অনিষ্টকারী পোকার প্রাকৃতিক শত্রুকে বন্ধুপোকা (Defender) বলা হয়। কারণ এরা শত্রুপোকাকে খেয়ে ফেলে আমাদের উপকার করছে। আমরা বন্ধুপোকাদের এতদিন চিনতাম না, কেননা, বন্ধুপোকা সাধারণত ফসলের ক্ষতি করে না। বন্ধুপোকা দু-ধরনের হয়। পরভোজী পোকা ও পরজীবী পোকা। একটা পরভোজী পোকা (Predator) সারা জীবদ্দশায় অনেক শত্রুপোকার ডিম, কীড়া ও পূর্ণাঙ্গ দশা খেয়ে ফেলে ধ্বংস করে। মাকড়সা, লম্বা শুঁড় ঘাসফড়িং হল পরভোজী বন্ধুপোকা। আবার **পরজীবী বন্ধুপোকারা** (Parasites) কোনো একটি বিশেষ প্রজাতির শত্রুপোকাকে আক্রমণ করে তার শরীরের ওপর বা ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বার হওয়া কীড়া ঐ আক্রান্ত শত্রুপোকা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। একটি পরজীবী বন্ধুপোকার সারা জীবদ্দশার জন্য সাধারণত একটি শত্রুপোকা লাগে। এ ছাড়া

শত্রুপোকার মধ্যে রোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে মেরে ফেলার জন্য মিটারহিজিয়াম, বিউভেরিয়া প্রভৃতি ছত্রাক, নিউক্লিয়ার পলি হেড্রোসিস, গ্রানুলোসিস প্রভৃতি ভাইরাস ও ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ব্যাকটিরিয়া শত্রুপোকার রোগ ঘটিয়ে মেরে ফেলে। ফসল খেতে শত্রুপোকার চেয়ে বন্ধুপোকার সংখ্যা অনেক বেশি। যেমন ধানখেতে ১০-১২ রকমের শত্রুপোকা আছে কিন্তু বন্ধুপোকা আছে কম করে ২৫ রকমের। বন্ধুপোকারা শত্রুপোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু যখন খেতে শত্রুপোকার সংখ্যা বন্ধুপোকার তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে, তখন ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে অর্থাৎ ফলন কমে যাবে। যে সংখ্যায় শত্রুপোকার উপস্থিতি ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি করে তাকে অর্থনৈতিক ক্ষতিকর সীমা (Economic Injury Level-EIL) বলা হয়। আবার ফসল খেতে যে সর্বাধিক সংখ্যায় শত্রুপোকার উপস্থিতি ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি করবে না অর্থাৎ ফলন কমাবে না, তাকে অর্থনৈতিক চরম সীমা (Economic Threshold Level-ETL) বলা হয়। রাসায়নিক কীটনাশক আবিষ্কারের পূর্বে এইসকল বন্ধু পোকাই অনিষ্টকারী পোকাকে দমন করে অর্থনৈতিক ক্ষতিকর সীমার মধ্যে রাখতে সাহায্য করত।

কিন্তু ফসলে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার শুরু হতে ঐ কীটনাশক শত্রু পোকার সাথে সাথে বন্ধু পোকাদেরও ধ্বংস করে। ফলে ফসলে বন্ধু পোকা না থাকাতে শত্রু পোকার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং ফসলের ক্ষতি করে। অর্থাৎ কীট শত্রুর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটে। এর ফলে কীটনাশক প্রয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি করতে কৃষকগণ বাধ্য হন এবং চাষের খরচ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশ দূষণও বৃদ্ধি পায়।

১.৬ পরিবেশ দূষণ-বাতাস, জল এবং মাটি দূষণ

ষাটের দশকে এদেশে ধান, গম প্রভৃতির উচ্চফলনশীল জাতের প্রচলন এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রচলন হয়। কিন্তু উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি রোগ পোকার দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। সুতরাং এই সকল ফসলের জন্য প্রয়োজন হয় অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং রোগ পোকা নাশক কৃষি বিষ। কীট দমনের জন্য নূতন নূতন কৃষি বিষ আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তার যথেচ্ছ প্রয়োগ হচ্ছে। এগুলি খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটায়। শুধু তাই নয় এদের জন্য জল, বায়ু এবং মাটি দূষিত হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য। কৃষিবিষ যত বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে দূষণ ততই বাড়ছে। যেমন :

ভারতে কীটনাশক ব্যবহার—	১৯৮০ সাল (কেজি)	১৯৮৭ সাল (কেজি)
	২৯২০৮৪	৭১৯৯০৬

১৯৯৬ সালে দেশে ২৫০০ কোটি টাকার রোগ পোকা ও আগাছা নাশক রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়েছে যার মধ্যে ৭৬% কীটনাশক। ১২% ছত্রাক নাশক এবং ১১% আগাছা নাশক। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে এবং বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত যে যথেচ্ছ রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে ফসল বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু এর ফলে নষ্ট হয়েছে মাটির স্বাস্থ্য, দূষিত হয়েছে জলের উৎসগুলি এমনকি ভূগর্ভস্থ জল। খাদ্যের মধ্যেও-খাদ্যশস্য, দুধ সবজি, ফল সবকিছুই আজ তলানি বিষে জর্জরিত।

রাসায়নিক সার ব্যবহারে পরিবেশগত সমস্যাবলী :

রাসায়নিক সারের মধ্যে প্রধান তিনটি হল—নাইট্রোজেন ঘটিত, ফসফেট ঘটিত এবং পটাশ ঘটিত সার।

দেখা গেছে জমিতে প্রযুক্ত নাইট্রোজেন সারের ৩৫-৬০% পর্যন্ত ফসল গ্রহণ করতে পারে। ১০-২০% বায়বীয় নাইট্রোজেন (N_2), নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2) ও NH_3 গ্যাসে পরিনত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। এই সারের অনেকটাই (NO_3) নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হয়। বাকী NO_3 জলের সঙ্গে ভূগর্ভের জলে অথবা অন্য জলাশয়ে গিয়ে জলের দূষণ ঘটায়। খাবারের মাধ্যমে মানুষের শরীরে অ্যামাইন (amine) ও অ্যামাইড (amide) যায়। নাইট্রেট থেকে তৈরী নাইট্রাইটের সঙ্গে ঐ দুটি রাসায়নিক যৌগ মিশলে তৈরী হয়--নাইট্রোস্যামাইন (nitro samine) এবং নাইট্রোস্যামাইড যৌগ। পরীক্ষায় দেখা গেছে এই যৌগগুলি বিভিন্ন প্রানীর দেহে ক্যান্সার রোগ ঘটায়। ফসফেট সারের জন্য ব্যবহৃত হয় সুপারফসফেট, ডি.এ.পি প্রভৃতি। এই সারগুলিতে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সিসা এবং নিকেল প্রভৃতি ভারী ধাতুর উপস্থিতি রয়েছে। পটাশের জন্য ব্যবহৃত হয় মিউরেট অফ পটাশ বা KCl যার একটি উপাদান ক্লোরিন।

সুতরাং রাসায়নিক সার বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক ক্লোরিন প্রভৃতি ফসলের শরীরে যায়। আমরা ঐ ফসল খেলে আমাদের শরীরে আসে এবং বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি করে।

১.৭ কৃষিতে বিভিন্ন রাসায়নিক এবং কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা

আধুনিক কৃষিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ (সার, শস্যরক্ষার বিষাক্ত ঔষধাবলী, আগাছানাশক ইত্যাদি) ব্যবহারে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়ছে। এদের বিষাক্ত অবশিষ্টাংশ (toxic residues) মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র পদ্ধতি (Central nervous system), লিভার (যকৃৎ) এবং শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় দেহযন্ত্র (respiratary organs) ইত্যাদি বিকল হচ্ছে।

বিষাক্ত রোগ-পোকা-আগাছা নাশক ফসলে যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে বাড়ছে অবসাদ বা উদ্যমহীনতা (depression), নিদ্রাহীনতা (insomnia), অন্ধত্ব, মারনরোগ ক্যানসার বা কর্কটরোগ, এবং পাকাশয়ের আন্ত্রিক সমস্যা (gastrointestinal problems)। এইসব রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ মাটিতে মিশে ভূস্তরের জলে সংবাহিত হয়ে পানীয় জল এবং সেচের জল সাংঘাতিকভাবে দূষিত করছে। এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশহানি ঘটছে।

(১) **মস্তিষ্কের ক্ষতি** (Brain damage) : সদ্যজাত শিশুরা অপুষ্টি, রুগ্নতা এবং স্বল্পমেধা সম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করছে। তাদের স্নায়ুতন্ত্র বিকল হচ্ছে।

(২) **জন্ম অপূর্ণতা** (Birth defects) : এসব এলাকার বাচ্চাদের জন্মকালীন নানা অপূর্ণতা দেখা দিচ্ছে, যথা-- শ্বাসকষ্ট, রক্তচলাচল জনিত সমস্যা, বিকলাঙ্গতা প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে।

(৩) **মৃত সন্তান প্রসব** (Fotal death) : গর্ভবতী মহিলাদের ভ্রূণ মৃত্যু বা মৃত সন্তান প্রসব হচ্ছে। অনেক সময় নিশ্চল বাচ্চার (still babies) জন্ম হচ্ছে।

(৪) **গর্ভপাত সমস্যা** (Miscarriage) : গর্ভবতী মায়েদের অকালে গর্ভপাত সমস্যা বাড়ছে। অনেক সময় গর্ভবতী মায়েদের গর্ভধারণ সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

(৫) **ব্রেন টিউমার** (Brain Tumour) : মানুষের মস্তিষ্কে আব (tumor) বা ক্যানসাররোগ ধরা পড়ছে, বিশেষ করে যাঁরা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সরাসরি যুক্ত থাকেন।

(৬) **জন্মগত বিকৃতি** (Birth defects) : রক্ত প্রবাহজনিত অসুখ, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় (hydrocephaly),

শ্বাসকষ্ট, অপুষ্ট হাত-পা, ওজন কম হওয়া ইত্যাদি নানান জন্মগত ত্রুটি দেখা যায়। গর্ভবতী মায়েরা যারা চাষের কাজে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং শস্যরক্ষার কাজে যুক্ত থাকেন, তাদেরই এসব বেশি দেখা যাচ্ছে। তাদের কম ওজনের, লম্বায় খাটো অপুষ্ট বাচ্চা হতে দেখা যায়। মায়েদের বুকের দুধেও এইসব বিষাক্ত রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ দেখা দিচ্ছে, যার ফলে তাদের সদ্যজাত বাচ্চাদের মাতৃদুগ্ধ নিরাপদ নয়।

তাই আধুনিক কৃষিতে রাসায়নিক সার, শস্যরক্ষার বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহার না করে জৈবিক উপায়ে বিভিন্ন শস্যরক্ষার ওষুধ এবং জৈবিক চাষ পদ্ধতি অবলম্বনই একমাত্র উপায়। সমীক্ষায় প্রকাশ, সারা বিশ্বে ৩০০ কোটি লোক এখন কৃষি ফসলে অনুখাদ্যের ঘাটতি সমস্যার ফলে স্বাস্থ্যহানির শিকার হচ্ছে।

১.৮ জৈব বৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

জাতি সংঘ ২০১০ সাল কে আন্তর্জাতিক জৈব বৈচিত্র্য বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে এবং তা পালনের জন্য নানা কর্মসূচী নেয়। জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করা ছাড়া পৃথিবীতে যে মানুষ সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না এবং জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করা যে আমাদের আশু কর্তব্য এ বিষয়ে জন সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই জাতি সংঘের এই উদ্যোগ। এ ছাড়াও প্রতি বছর ২২শে মার্চ দিনটি আন্তর্জাতিক জৈব বৈচিত্র্য দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান দশককে (২০১১-২০২০) ঘোষনা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক জৈব বৈচিত্র্য দশক হিসাবে। এই প্রবন্ধে জৈব বৈচিত্র্য কি এবং কিভাবে এর সংরক্ষণ করা সম্ভব সে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা : কখনও কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেমন বন্যা, খরা বা অগ্নিকান্ড ইত্যাদির পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত জীব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। পৃথিবীতে সমস্ত জীবেরই অন্য কোনো জীব থেকে কম বেশি কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন বেশ কিছু জীব বিনষ্ট হয়ে যায় তখনও কিছু জীব সেই বিপর্যয় মোকাবিলা করে বেঁচে থাকে। এই সকল জীবের বিশেষ কিছু গঠনগত বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই এটা সম্ভব হয়। বিভিন্ন জীবের মধ্যে যে প্রকারণ (variation) রয়েছে তার জন্যই বিশেষ কিছু জীব সেই সমস্ত বিপর্যয় ও সংকট উত্তরণ করে বেঁচে থাকে এবং প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র সচল ও সজীব থাকে।

জৈব বৈচিত্র্য (Bio-diversity) বলতে পৃথিবীর সমস্ত জীবকুলের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও প্রকারণ রয়েছে তার ব্যাপ্তি ও তৎসহ যে পরিবেশে সেই সমস্ত জীবকুল বেঁচে রয়েছে তারও বৈচিত্র্যকে বোঝায়। একটি বিশেষ প্রজাতির বিভিন্ন জীবের মধ্যেকার বৈচিত্র্য, বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যেকার বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তার সমষ্টিই হল **সংশ্লিষ্ট এলাকার সামগ্রিক জৈব বৈচিত্র্য**।

পৃথিবীতে ঠিক কত ধরনের জীব রয়েছে তা নির্ধারণ করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি প্রজাতির জীব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। তার মধ্যে ১৪.৩৫ লক্ষ প্রজাতিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বহু প্রজাতির জীবকে এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যে সমস্ত প্রজাতি এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা সম্ভভ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ৭৫১০০০ প্রজাতির পতঙ্গ, ২৫০০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৬৮০০০ প্রজাতির ছত্রাক, ৩০০০০ প্রজাতির প্রটিস্ট (এক কোশী ও কলোনী তৈরি করে এমন বহু কোশী জীব), ২৬৯০০ শেওলা, ৪৮০০ ব্যাকটেরিয়া এবং ১০০০ রকমের ভাইরাস।

জৈব বৈচিত্র্যের স্তর

পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার মূলে রয়েছে পৃথিবীর এই জৈব বৈচিত্র্য। এই জৈব বৈচিত্র্যের আবার তিনটি স্তর রয়েছে।

(১) জিন গত বৈচিত্র্য : একটি প্রজাতির জীবের মধ্যে যে জিনগত প্রকারণ (genetic variatiion) রয়েছে তাই হল জিনগত বৈচিত্র্য। বিভিন্ন বাসস্থানে একই প্রজাতির বিভিন্ন জনসমষ্টির পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে এই বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়। এই বৈচিত্র্যের আবার তিনটি স্তর রয়েছে। জিনগত বৈচিত্র্যের জন্যই বাস্তুতন্ত্রে ঘটে যাওয়া কোন পরিবর্তনের পর সংশ্লিষ্ট প্রজাতিটি ও বাস্তুতন্ত্র নতুন করে পুনরায় সবল ও সক্ষম হয়ে ওঠে। জিনগত বৈচিত্র্য থেকেই পরবর্তীকালে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

(২) প্রজাতি বৈচিত্র্য : পৃথিবীতে যে বিভিন্ন রকমের কোশ বিহীন ভাইরাস, এক কোশী জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, মইকোপ্লাজমা, এক্টিনোমাইসিটিস ইত্যাদি এবং বহুকোশী জীব যেমন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে সেই বৈচিত্র্যই হল প্রজাতি বৈচিত্র্য। একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রের বা জীবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এই প্রজাতি বৈচিত্র্য খুবই জরুরী। একটি বিশেষ জীব গোষ্ঠীর (community) মধ্যে কোনো বিশেষ প্রজাতির টিকে থাকা নির্ভর করে সেই জীব গোষ্ঠীর মধ্যে অন্য সমস্ত প্রজাতির প্রকৃতিতে টিকে থাকার উপর।

(৩) বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য : বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য বলতে বোঝায় একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য, বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যে বৈচিত্র্য এবং এই স্তরে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী ও বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত পারস্পরিক সম্পর্ক।

জৈব বৈচিত্র্য আমাদের কি উপকার করে :

(১) পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখা।

(২) মানুষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, কাঠের যোগান দেওয়া।

(৩) চিকিৎসার জন্য ওষুধ সরবরাহ করা।

(৪) পৃথিবীতে জল ও বায়ুর বিশুদ্ধকরণ।

(৫) উদ্ভিদের পরাগমিলনে সাহায্য করে।

(৬) ফসলকে রোগ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

(৭) বিনোদন - সৌন্দর্যায়ন।

(৮) আগামি দিনে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মেটানো।

(৯) পরিবেশে বিভিন্ন দূষিত পদার্থের জৈব বিয়োজন ঘটিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করা।

জৈব বৈচিত্রের বিলোপ : পৃথিবীতে প্রায় ৪০০ কোটি বছর পূর্বে জীবনের উদ্ভব হয়। জীবনের উদ্ভবের পর সুদীর্ঘ ৪০০ কোটি বছরের জৈব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে বর্তমান সকল জৈব বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে হারে জৈব বৈচিত্র্য বিনাশ ঘটছে তাতে পৃথিবীতে মানুষ সহ বিভিন্ন জীবের টিকে থাকাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

সাধারণ ভাবে কিছু প্রজাতির বিনাশ ও নতুন প্রজাতির আবির্ভাব বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে সব সময় ঘটে চলে। সাধারণতঃ প্রতি দশকে ১ থেকে ১০টি প্রজাতি বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে প্রতি বছর গড়ে ১০০-১০০০ গুণ বেশি মাত্রায় প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিগত ৫০ কোটি বছরে পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ বার জীবনের মহা বিনাশ ঘটেছে (great extinction)। এই সমস্ত মহা বিনাশ ঘটার সময়ে পৃথিবীর বহু প্রাণী যেমন ডাইনোসর পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রথম চারটি এই মহাবিনাশের কারণ ছিল পৃথিবীর আবহাওয়াগত পরিবর্তন বিশেষ করে তাপমাত্রার হ্রাস এবং পঞ্চম মহাবিনাশের কারণ ছিল পৃথিবীতে একটি বড় উল্কাপাত। কিন্তু বর্তমানে ষষ্ঠ মহা বিনাশ ঘটে চলেছে এবং এর মুখ্য কারণ মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে পৃথিবীর পরিবেশ বিপর্যয়।

বর্তমান জৈব বৈচিত্র্য বিনাশের কারণ :

পৃথিবীতে জৈব বৈচিত্র্য বিনাশের জন্য মুখ্যত ছয়টি কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা-

(১) পৃথিবীর জনসংখ্যা ব্যাপক ভাবে বেড়ে যাওয়া এবং পৃথিবীর স্বাভাবিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার।

(২) কৃষি পণ্য ও বনজ পন্যের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি প্রজাতির ব্যবহার এবং কৃষিক্ষেত্রে, বনায়নে ও মৎসচাষে বহির্দেশীয় প্রজাতির (exotic species) ব্যবহার।

(৩) সমগ্র পৃথিবীতে পরিবেশ ও স্বাভাবিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে মূল্য দেয় না এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতির প্রবর্তন।

(৪) পৃথিবীতে স্বাভাবিক সম্পদের অসম বণ্টন ও অসম ব্যবহার।

(৫) জৈব বৈচিত্র্য ও তার ব্যবহার বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা ও আরদ্ধ জ্ঞানের ঠিকমত ব্যবহার না করা।

(৬) এমন আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যা পৃথিবীতে স্বাভাবিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বাড়ায়।

(৭) কৃষি কাজে বহুল পরিমাণে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য রসায়নের ব্যবহার এবং দৈনন্দিন জীবনে ও শিল্প ক্ষেত্রে আরও বহু ধরনের কৃত্রিম রসায়নের ব্যবহার।

জৈব বৈচিত্র্যের বিস্মৃতি : নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক জৈব বৈচিত্র্য রয়েছে। এই নিরক্ষীয় বনভূমি যদিও পৃথিবীর মাত্র ৭ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সনাক্ত করা হয়েছে এমন প্রজাতি এই এলাকায় বিরাজ করছে। নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলকে পৃথিবীর ফুসফুসও বলা হয়। এই সমস্ত নিরক্ষীয় বনাঞ্চল পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রয়েছে। এই সমস্ত দেশগুলির জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় কৃষি ও বাসস্থানের সংস্থান করতে বনাঞ্চল দ্রুত কেটে ফেলা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি ১০ বছরে নিরক্ষীয় বনভূমি গড়ে ১৬ কোটি হেক্টর (১ হেক্টর = ১০০০০ বর্গ মিটার) হারে কেটে ফেলা হচ্ছে।

এই কুড়িটি জৈব বৈচিত্র হ্রাসের প্রধান ক্ষেত্রের মধ্যে ২ টি ভারতবর্ষ হয়েছে একটি হল পূর্ব হিমালয় ও সন্নিহিত এলাকা ও অন্যটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চল।

এই সমস্ত এলাকা গুলি সংরক্ষনের সুষ্ঠু উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে, অদূর ভবিষ্যতে এর ৯০ শতাংসই নষ্ট হয়ে যাবে। স্বাভাবিক বাসস্থান বিনাশ হওয়ার ফলে এই সমস্ত এলাকার জৈব বৈচিত্র্যও ভীষন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জিন ক্ষয় : পৃথিবী থেকে কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে ঐ প্রজাতির জিনসমুহও লোপ পেয়ে যায়। পৃথিবীর জিন সম্পদের এই হ্রাস হওয়াকে বলা হয় জিন ক্ষয়। বিংশ শতাব্দীতে কৃষিজ ফসলের প্রায় ৭৫ শতাংশ জৈব বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। ধান ও গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা দখল করে রয়েছে।

কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে জিন ক্ষয়ের মূল কারণ হল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় এমন ফসলের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং বিশেষ কোনো ফসলের চাষের ক্ষেত্রে চাষযোগ্য জাতের সংখ্যাও কমে যাওয়া। বিগত দিনে পৃথিবীতে এক সময় অসংখ্য জাতের উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হত। বর্তমানে খাদ্য হিসাবে গৃহীত উদ্ভিদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। পৃথিবীতে প্রায় ৩০০০ রকমের উদ্ভিদ মানুষের খাদ্য হিসবে চিহ্নিত হলেও বর্তমানে কেবল

মাত্র ১৫০টি প্রজাতির শস্যের বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হয়। তার মধ্যে ১২টি প্রজাতির ফসল পৃথিবীর কৃষিক্ষেত্রে মুখ্যত চাষ হয়ে থাকে। আবার, মূলত চারটি ফসল (ধান, গম, ভুট্টা ও আলু) উৎপাদিত পন্যের ৫০ শতাংশ দখল করে রয়েছে।

বর্তমানে কৃষি গবেষণার মুখ্য লক্ষ্যই হচ্ছে কোনো ফসলের একটি জাতের মধ্যেই যতটা সম্ভভ ভাল ভাল জিনের সমাবেশ ঘটিয়ে সেটির বিস্তার ঘটানো। যেই এধরনের একটি জাতের উদ্ভব ঘটানো সম্ভব হয়, তখনই বিস্তৃত এলাকায় সেই জাতটির চাষের প্রসার ঘটানো হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রজাতির ফসলের দেশীয় জাতগুলির চাষ অনেকাংশেই কমে যাচ্ছে এবং ক্রমে সেগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই ধরনের জিন ক্ষয় আগামি দিনে সংশ্লিষ্ট ফসলগুলির নতুন ও উন্নত জাতের উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করছে। উন্নত জাতের ফসল উদ্ভাবনের সময় দেশীয় ও বুনো জাত গুলিই বিভিন্ন ধরনের উপযোগী জিন সরবরাহ করে তাই সমস্ত ফসলেরই জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করা এত গুরুত্বপূর্ণ। এই জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করার মধ্য দিয়ে আগামি দিনে কৃষিজ পন্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন ও ফসলকে রোগ, পোকা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা ও বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা : জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার মূল উপজীব্য হল জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা বিষয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা রূপায়ণ করা। এর মুখ্য দিক হল জৈব সম্পদের সুষ্ঠু ও সুস্থায়ী ব্যবহার, জৈব সম্পদের গুণমান ও বৈচিত্র্য রক্ষা করা।

স্বাভাবিক বাসস্থানের সংরক্ষণ কৌশল : এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় কোন জীব গোষ্ঠীর স্বাভাবিক বাসস্থানেই সেই জীব গোষ্ঠীকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। লক্ষ্য রাখা হয় যাতে সেই বাস্তুতন্ত্রে কোনো প্রজাতি যেন বিলুপ্ত না হয়ে যায়। একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রের প্রায় সমস্ত প্রজাতিই একটি জটিল খাদ্য শৃঙ্খলে জড়িয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রজাতির টিকে থাকা নির্ভর করে বেশ কিছু অন্য প্রজাতির জীবের বেঁচে থাকার উপর। অনেক বাস্তুতন্ত্রেই এই খাদ্যশৃঙ্খল সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় না। তাই সেই বাস্তুতন্ত্রকে সামগ্রিক ভাবে রক্ষার মাধ্যমেই তার অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতিকে রক্ষা করা যায়।

প্রতিটি প্রজাতির জিনোম বা সামগ্রিক জিন সম্পদকে রক্ষা করা দরকার যাতে সেই প্রজাতির বিভিন্ন ব্যক্তির (individual) মধ্যে প্রকারণ (variation) বজায় থাকে। এই জিন গত প্রকারণ বজায় থাকলে সেই জীব পরিবর্তিত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পরিচালন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন জীব গোষ্ঠী, প্রজাতিসমুহ ও তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ককে রক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে জিন সম্পদের ব্যবহার ও সেই জিন সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে যাতে সংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত একটি বিশেষ জীব গোষ্ঠী ও বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীর মধ্যে যাতে জেনেটিক প্রকারণ বজায় থাকে, তার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কোন বিশেষ প্রজাতির বিভিন্ন জীবসমষ্টিকে অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমেই সেই প্রজাতিটির জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব। আবার যে বাস্তুতন্ত্রে বিশেষ কোন একটি প্রজাতির স্বল্প সংখ্যক জিন সমষ্টি রয়েছে সেই বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষার মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক জীব সমষ্টি থাকা সত্ত্বেও সেই প্রজাতিটিকে রক্ষা করা যায়।

স্বাভাবিক বাসস্থানের বাইরে কৃত্রিম ভাবে ও কৃত্রিম পরিবেশে সংরক্ষণ কৌশল

সুদীর্ঘকাল ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ উদ্যান (Botanical garden) ও চিড়িয়া খানায় (Zoos) বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে আসছে। যদিও এই উদ্যানগুলি মূলত সৌন্দর্য

বিধান ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তোলা হয়, এর পাশাপাশি এই উদ্যানগুলি সংগৃহীত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ বিষয়েও একটি কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই উদ্যানগুলি ঐ সমস্ত প্রজাতির বংশবৃদ্ধি ও স্থানীয় পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে থাকে। এই সমস্ত প্রজাতিগুলি পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ভাবে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগতে পারে।

বর্তমানে কৃষি ও প্রাণী বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও সংশ্লিষ্ট প্রজাতিগুলির জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এজন্য ঐ সমস্ত প্রজাতিগুলির জৈব বৈচিত্র্য রক্ষায় উদ্ভিদ ও প্রাণী উদ্যান গুলির ভূমিকা অনেকটা কমে গেছে। তবে স্বাভাবিক পরিবেশে বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়া বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এ সমস্ত উদ্যান ও তৎসহ একোয়ারিয়ামগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ১৫০০টি উদ্ভিদ উদ্যান ও বৃক্ষ সংগ্রহালয় (Arboreta) রয়েছে এবং এগুলি স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে সর্বোচ্চ সংখ্যায় উদ্ভিদ পালন করে থাকে।

প্রাণী জগতের জৈব বৈচিত্র্য রক্ষায় চিড়িয়াখানা ও একোয়ারিয়ামগুলিরও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৮০০টি চিড়িয়াখানায় স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর তিন হাজার প্রজাতির সাত লক্ষ প্রাণী পালিত হচ্ছে। অনেক চিড়িয়াখানায় বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীদের প্রজনন ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-র ন্যাশন্যাল জুলজিক্যাল পার্ক নিয়মিত ভাবে বিপন্ন প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর প্রজনন ঘটিয়ে পুনরায় তাদের স্বাভাবিক বাসস্থানে অন্তর্ভুক্ত করার কর্মসূচী নিয়ে থাকে।

স্বাভাবিক বাসস্থানের বাইরে কৃত্রিম ভাবে সংরক্ষণের নতুন প্রযুক্তি

(১) জিন ব্যাংক : যে সমস্ত বীজ শুকিয়ে কম তাপমাত্রায় দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায় সেই সমস্ত বীজ কৃত্রিমভাবে শীতল সংগ্রহশালায় রাখা হয়।

(২) বীজ ব্যাংক : বিভিন্ন এলাকায় চিরায়ত ভাবে কৃষকগণ কিছু বীজ আগামি দিনে ফসল ফলানোর জন্যে বীজ সংরক্ষণ করে থাকেন ও বীজ বিনিময় করেন। এই ধরনের বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে বীজ ব্যাংক বলা হয়।

(৩) জীবন্ত মেঠো জিন ব্যাংক : যে সমস্ত বীজ শুকিয়ে কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায় না সেগুলি মাঠেই চাষের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে মেঠো জিন ব্যাংক বলা হয়।

(৪) অতি শীতলীকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ (Cryogenic preservation) : উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় ধরণের জীবের সংরক্ষণের জন্য এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনায় তরলিকৃত নাইট্রোজেনে (-১৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস) সংরক্ষণ করা হয়। এই ধরনের সংরক্ষণে সংগ্রহালয়ের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হয় না, কোনো রোগ পোকার আক্রমণেও সংরক্ষতি অংশের ক্ষতি হয় না। তা ছাড়া এই সংরক্ষম ব্যবস্থাপনায় সুদীর্ঘকালের জন্য সংরক্ষণ করা যায় এবং জিনগত পরিবর্তন বা ক্ষতিও হয় না। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বীজ, ভ্রূণ ও কলা এবং প্রাণী সমুহের ভ্রূণ ও শুক্র সংগ্রহ করা হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে সংরক্ষণ করা যায় বলে এই পদ্ধতিতে সামগ্রিক খরচ অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় কম।

(৫) ডিনএ সংরক্ষণ : এই পদ্ধতিতে কোনো জীবের নিষ্কাষিত ডিএনএ সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতির একটি সুবিধা হল এক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণ পদার্থ সংরক্ষণ করতে হয়। এই পদ্ধতিতে বিপন্ন প্রজাতির এমনকি লুপ্ত হয়ে গেছে এমন প্রজাতির ডিএনএ (লোম বা হাড় থেকে সংগৃহীত) ও সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত ডিএনএ একই প্রজাতির বা সম্বন্ধযুক্ত প্রজাতির মধ্যে সংস্থাপন করা সম্ভব। তবে এই পদ্ধতি এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার

পর্যায়েই রয়েছে এর বহুল ব্যবহার এখনও শুরু হয় নি। যদিও অতি অল্প তাপমাত্রায় ডিএনএ সংরক্ষণ বর্তমানে নিয়মিত হয়ে থাকে, কিন্তু সংরক্ষিত ডিএনএ থেকে নতুন জীব তৈরি বা সংরক্ষিত কোনো ডিএনএ-র অন্য কোন সম্বন্ধযুক্ত জীবদেহে বহিঃপ্রকাশ বেশ শক্ত কাজ।

স্থানীয় পরিবেশ ও বিভিন্ন জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ কোনো প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বেই সেই প্রজাতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পৃথিবীর জৈব বৈচিত্র্য ও তার ভূমিকা বিষয়ে জন সচেতনতা গড়ে তোলা খুব জরুরী। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যাতে সুষ্ঠু ভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্যই বর্তমান কালে জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করা দরকার। কেননা সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত জৈব বৈচিত্র্য আমাদের সকলেরই উপকার করে এবং জৈব বৈচিত্র্যের সংকোচন আমাদের সকলের জন্যই সংকট ডেকে আনবে।

১.৯ কৃষিকাজে কৃষি রসায়নের ব্যবহার-কিছু কুফল

ভূমিকা : বিগত শতাব্দীর আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে ভূমি-সম্পদ, জল-সম্পদ এবং অরণ্য সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল, পরিবেশ ছিল নিষ্কলুষ মানুষের চাহিদা ছিল কম সভ্যতা মূলত ছিল কৃষি নির্ভর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর গোটা বিশ্ব জুড়েই ক্রমে ব্যাপক শিল্পায়ন হতে থাকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ফলে পৃথিবীতে ক্রমাগত স্বাভাবিক সম্পদের বিনাশ ঘটতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হতে থাকে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের পাশাপাশি কৃষিকাজেও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাদ্য ও অন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিতে গিয়ে বর্তমানে চাষাবাদ ক্রমশ উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও সেচের জল এবং রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশক পর্যন্ত এগুলির ব্যবহার সীমিত থাকলেও তার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এগুলির ব্যাপক ব্যবহার ও অপব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে সামগ্রিক কৃষিজ পন্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও প্রাচীন টেকসই কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কৃষি ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে। অধিক সংখ্যক জনগণকে খাওয়ানোর জন্য অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে ভুমি জল ও আনুষঙ্গিক পরিবেশের (Agri-Ecosystem) উপর অত্যধিক চাপ পড়েছে ও এদের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হচ্ছে এবং তৎসহ পরিবেশে ভূমি, জল ও বায়ুর দূষণ ঘটাচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক নগরায়নও হতে থাকে। ফলে বিপুল জনগনের বসবাস ও খাদ্য সরবরাহের জন্য পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ ব্যাপক ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে ও হচ্ছে। পৃথিবীর অরন্য সম্পদ ও ভুমি সম্পদ ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে। সুতরাং ভবিষ্যতে অল্প জায়গায় বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু এই রাসায়নিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা করতে গেলে তার সুদূর প্রসারী ফল হবে খুব সঙ্গীন ও আত্মঘাতী। কেবল শিল্পায়নই নয়, চাষাবাদও ব্যাপকভাবে পরিবেশের দূষণ ঘটাচ্ছে। পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ও সেচের জল ব্যবহারেরর ফলে জমি উষর হয়ে গেছে, জলস্তর নেমে গেছে, ভূমি ক্ষয় বাড়ছে, জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যাচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে এবং তৎসহ রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী মানুষ সহ সমস্ত জীবের স্বাস্থ্যের হানি ঘটাচ্ছে। এই বসুন্ধরা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সহ সমস্ত জীবকূলকে খাদ্য ও শক্তির যোগান দিয়ে

এসেছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন একটি সংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে এই পৃথিবী ও তৎসহ সমস্ত জীবকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে।

উচ্চফলনশীল বীজ

কৃষিজ ফসলের প্রাচীন দেশীয় জাত গুলোর পরিবর্তে বর্তমানে উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড বা সংকর জাতই ব্যাপকভাবে চাষাবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জাত গুলি উচ্চ ফলন দেওয়ার জন্য অধিক পরিমাণে পুষ্টি ও জল ব্যবহার করে। ফলে এদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিকের প্রয়োজন হয়। দেশীয় জাত গুলির স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই সুদীর্ঘ কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু উচ্চফলনশীল জাতগুলি মানুষ তার নিজের লাভ ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে উদ্ভাবন করেছে, যে জাত গুলি বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমেই উচ্চফলন দিতে পারে।

বর্তমান কৃষিকাজে ব্যবহৃত রসায়নসমুহ

রাসায়নিক সার :

(১) নাইট্রোজেন ঘটিত (যেমন ইউরিয়া, ডিএপি - ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট, ক্যান ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট)

(২) ফসফেট ঘটিত (এসএসপি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, টিএসপি-ট্রিপল সুপার ফসফেট)

(৩) পটাশ ঘটিত (এমওপি-মিউরিয়েট অব পটাশ, এসওপি-সালফেট অব পটাশ)

(৪) ক্যালসিয়াম, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়াম ও লোহা সরবরাহ করে এমন বিভিন্ন সার (চুন, ডলোমাইট, পাইরাইট, রকফসফেট, বেন্টোনাইট সালফার ইত্যাদি)

(৫) ম্যাঙ্গানিজ, তামা, দস্তা, বোরোন, মলিবেডেনাম, কোবাল্ট, ভ্যানাডিয়াম ও সিলিকন সরবরাহ করে এমন সার (বাজারে কয়েকটি নির্ধারিত মিশ্রণে পাওয়া যায়)

(৬) যৌগিক সার যা একের অধিক খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে (ডিএপি, সুফলা, ১০:২৬:২৬)

(৭) মিশ্রসার যা একের অধিক খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে (এন-পি-কে মিশ্র সার)

রাসায়নিক কীটনাশক

(১) আগাছানাশক (প্রোপানিল, বুটাক্লোর, অ্যানিলোফস, ২-৪-ডি (পেন্ডিমেথিলিন ইত্যাদি)

(২) পোকা-নাশক (কারটাপ, ট্রায়াজোফস, থায়োডোকার্ব, ম্যালাথিয়ন, কুইনালফস, ফেনভ্যালেরেট ইত্যাদি)

(৩) ছত্রাক নাশক (হেক্সাকোনাজল, প্রোপিকোনাজল, ট্রাইসাইক্লাজল, ক্যাপটান ইত্যাদি)

(৪) মাকড়নাশক (ফেনাজাকুইন, ডাইকোফল, অ্যাবামেক্টিন ইত্যাদি)

(৫) ব্যাকটেরিয়া নাশক (টেট্রাসাইক্লিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন ইত্যাদি)

(৬) ইঁদুরনাশক (জিংক ফসফাইড, ব্রোমোডায়ালোন - রোবান, ওয়ারফেরিন-রাটাফিন, ফিউমারিন ইত্যাদি)

(৭) মৃত্তিকা কৃমি নাশক, (কার্বোফুরান - ফিউরাডান)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ - গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে

(১) গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তাকরে এমন রসায়ন (আলফা ন্যাপথালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড-প্লানোফিক্স, এন ট্রাইকন্টানল, লিবিনল, অ্যামিনো অ্যাসিড, হিউমিক অ্যাসিড, বিভিন্ন সামুদ্রিক আগাছার নির্যাস ইত্যাদি)

(২) গাছের বৃদ্ধি রোধ করে এমন রসায়ন (ক্লোরমেকোয়াট, সাইকোসেল)

(৩) শিকড়ের বৃদ্ধি ঘটায় এমন রসায়ন (ইন্ডোল বিউটিরিক অ্যাসিড - সেরাডিক্স, কাটিং এইড)

(৪) পাতা ঝরিয়ে দেয় এমন রসায়ন (অ্যাবসিসিকি অ্যাসিড, থায়ডায়াজুর/ডায়াইউরোন-ড্রপ আল্টরা)

(৫) গাছে ফুল আনয়নে সাহায্য করে এমন রসায়ন (ইথেফন-ইথরেল, জিব্বারেলিক অ্যাসিড-প্রোজিব)

রাসায়নিক সার

১৯৪০ সাল থেকে কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়। তার পর থেকেই বিগত ৮০ বছরে কৃষিকাজে এই উপকরণের ব্যবহার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম দিকে এই রাসায়নিক সারেরর ব্যবহার নিয়ে কৃষক সমাজ দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও রাসায়নিক সার ব্যবহারেরর তাৎক্ষনিক ফল পাওয়ার ফলে এই উপকরণটি কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর একটি সহজ মাধ্যম হিসাবে পরিগনিত হয়। সমগ্র পৃথিবীর সাথে সাথে ভারতবর্ষেও ১৯৭০-১৯৮০র দশকে সারের ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিগত প্রায় ৪০ বছর রাসায়নিক সার ব্যবহারের সামগ্রিক ক্রমপুজিত বেশ কিছু কুফল দেখা দিয়েছে। রাসায়নিক সার হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ঘটিত সার কৃষি জমিতে ব্যবহার করা হয়। তবে কৃষি জমিতে অন্যান্য কিছু প্রধান খাদ্য (যেমন সালফার, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়াম) এবং অনুখাদ্যেরও (যেমন জিঙ্ক, মলিবডেনাম, বোরন ইত্যাদি) ঘাটতি দেখা দেওয়ায়, সেগুলিও রাসায়নিক সারেরর মাধ্যমে প্রয়োগ করা হচ্ছে। নাইট্রোজেন ও ফসফেট ঘটিত রাসায়নিক সার ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহারেরর ফলে পরিবেশে নাইট্রেট ও ফসফেটের দূষণ বাড়ছে।

রাসায়নিক সার মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের বিয়োজক ও অন্যান্য জীবাণুর বিনাশ ঘটাচ্ছে। কৃষি জমির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ফলে উর্বর কৃষি জমি - যা কৃষকের ও দেশের মূল সম্পদ তা বিনষ্ট হতে চলেছে। কৃষি জমির উর্বরাশক্তির এই অবনমনের অর্থ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষকের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠা।

কৃষি জমিতে ব্যবহৃত হওয়া নাইট্রোজেন রাসায়নিক সারের মাটি ও পরিচর্যা ভেদে ৪০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত ফসল নিতে পারে। ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের ৫০-৬০% জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে নালা ও জলাশয়ে জমা হয়। ফলে ঐ সমস্ত জলাশয়ে জলের উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে বিভিন্ন জীবাণু, শ্যাওলা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের খুব দ্রুত বৃদ্ধি হয়। কিছু কিছু শেওলা এমন বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত করতে পারে যা মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রানীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। প্রখর সূর্যালোকে শেওলা জলে অক্সিজেন সরবরাহ করে কিন্তু মেঘলা আবহাওয়ায় তারা অক্সিজেন গ্রহণ করে ফলে জলে দ্রবীভূ অক্সিজেনের মাত্রা এতটা কমে যেতে পারে যে মাছ পর্যন্ত ঐ জলে বেঁচে থাকতে পারে না। এ ছাড়া জলে অক্সিজেনের অভাবে জৈব পদার্থের পচন ঠিকমত না হওয়ায় একটা দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত জলজ উদ্ভিদগুলি মাছ ধরায়, স্নান করায়, মাছ চাষের পরিচর্যায় ও যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। রাসায়নিক সারের বহুল ব্যবহারে মাটি অম্ল হয়ে যাচ্ছে (বিশেষ করে গন্ধক ও ফসফলিক অ্যাসিড রয়েছে এমন সার ব্যবহার করার জন্য)। জমিতে প্রয়োগ করা ফসফেট সারের মাত্র ৩০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট ফসল নিতে পারে। বাকি ফসফেট মাটিতেই আবদ্ধ হয়ে থেকে যায়। জমিতে প্রয়োগ করা পটাশ সারও অনেকটাই আবদ্ধ হয়ে যায়।

মাটিতে এই সমস্ত রাসায়নিক উপকরণ প্রয়োগ করার ফলে মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন অনুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাক্টিনোমাইসিটিস, মৃত্তিকা কৃমি ইত্যাদি)-এর সংখ্যা ব্যাপক ভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে মাটিতে স্বাভাবিক নিয়মে উদ্ভিদের পুষ্টি মৌলের চক্রাকারে আবর্তন হচ্ছে না। মাটিতে নাইট্রিফিকেশন, ডিনাইট্রিফিকেশন, অ্যামোনিফিকেশন ইত্যাদি ঘটতে পারছে না। মাটিতে সার মূলত উপরের ৩০ সেন্টিমিটার অংশে প্রয়োগ করা

হয়। ফলে ঐ অংশে ক্রমাগত সার প্রয়োগের ফলে কিছু কিছু উদ্ভিদ মৌলের (যেমন পটাশিয়াম, ফসফরাস) এবং filler material-এর পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। রাসায়নিক সার ও তৎসহ অত্যধিক সেচের জল ব্যবহারের জন্য বা বৃষ্টির জলের মাধ্যমে ব্যবহৃত সার মাটিতে চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ জলে বা গড়িয়ে গিয়ে স্থানীয় জলাশয়ে বা নদী নালায় গিয়ে মিশছে। মাটিতে কিছু উদ্ভিদ খাদ্যের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেলে তা অন্য কিছু উদ্ভিদ খাদ্যের লভ্যতাকে কমিয়ে দেয় ফলে মাটিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় ও গাছের সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

কৃষি জমিতে ব্যবহৃত নাইট্রেট মাটির নীচে চুঁইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলেও দূষণ ঘটাচ্ছে। এই দূষিত জল পান করলে শিশুর দেহ নীল হয়ে যায়। ডাক্তারি ভাষায় এই রোগকে বলা হয় মেটহিমোগ্লোবিনিয়া বা ব্লু বডি সিন্দ্রাম। এই রোগে জলে দ্রবীভূত নাইট্রেট পেটের মধ্যে নাইট্রাইটে পরিণত হয় এবং এই নাইট্রাইট রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে **মিথেমোগ্লোবিন** তৈরি করে। ঐ হিমোগ্লোবিন আর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। ফলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। বয়স্ক ব্যক্তিরা এই রোগ থেকে ধীরে ধীরে নিরাময় হয়ে গেলেও শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই এর ফলে মৃত্যুবরণ করে। গর্ভবতী মহিলারাও এতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবার এই নাইট্রাইট প্রাণীদের শরীরে পেশিতে অবস্থিত ক্রিয়াটিনিন-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রো-সারকোসিন তৈরি করে যার ক্যান্সার তৈরিরর ক্ষমতা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও নাইট্রেটের বিষক্রিয়ায় চোখ ও নাকে জ্বালা হয়, ফুসফুসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে; গাছের পাতা ও সবুজ কনার বিনাশ হয় এবং গাছের বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পানীয় জলে নাইট্রেটের সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা নির্ধারন করেছে ৫০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার জলে (অর্থাৎ ৫০ পিপিএম)।

অধিকাংশ রাসায়নিক সার তৈরির জন্য বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস বা খনিজ তেল ও কয়লা ব্যবহার করা হয়, যার যোগান কমে আসছে। তাই বর্তমান শতাব্দীতে রাসায়নিক সারেরর ব্যবহার কমিয়ে এর বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদ খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা করা খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষে রাসায়নিক সার ব্যবহারেরর কয়েকটি দিক

রাসায়নিক সার প্রয়োগকে কৃষকগণ ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর সহজ পদ্ধতি হিসাবে নিয়েছেন। সার প্রয়োগের জন্য মাটির কীরূপ ক্ষতিসাধন হচ্ছে তা তারা মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন না।

বেশিরভাগ কৃষকই মনে করেন সার প্রয়োগ করলেই ফসলের সমস্ত চাহিদা মিটে যাবে এবং জমিতে গোবর সার বা অন্য কোন জৈব সার যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। জৈব সার তৈরির ব্যবস্থাও অধিকাংশ কৃষকের নেই।

মাটি পরীক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে করা হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়.

আমাদের দেশে কৃষক সমাজ বেশীরভাগ স্বল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর। কোন ফসলে কোন সার কতটা প্রয়োজন তা না জেনেই ব্যবহার করেন।

কোন ফসলে প্রয়োগ করা সার পরেরর ফসলের জন্য কতটা রয়ে গেল বা কাজে লাগলো তা হিসাব করেন না।

কৃষকোর অনেক ক্ষেত্রেই ধারে সার কেনেন এবং সার বিক্রেতারাই কোন সার কতটা ব্যবহার করতে হবে তা নির্ধারণ করে দেন।

রাসায়নিক কীটনাশক

চাষাবাদে শস্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যেমন কীটনাশক, ছত্রাক নাশক, আগাছানাশক ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণরকারীও অন্যান্য আরও বহু কৃষি রসায়ন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেগুলি মূলতঃ ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

যেমন ঃ (১) পারদ ঘটিত (যেমন মারকিউরিক ক্লোরাইড, মিথোক্সিইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড-সেরেসান, অ্যাগালল, সেরেসান ড্রাই, এমিসান ইত্যাদি)

(২) অরগ্যানো ক্লোরিন (জৈব-ক্লোরিন) জাত (যেমন ডি.ডি.টি., বিএইচসি, ডাইএলড্রিন, অলড্রিন, হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি)

(৩) কার্বোমেট (কার্বোসালফান, কার্বারিল, অ্যাল্ডিকার্ব, মিথোমিল ইত্যাদি)

(৪) অরগ্যানো ফসফেট বা জৈব ফসফেট (অ্যাসিফেট, ক্লোরোপাইরিফস, ডায়াজিনন, ডাইমিথোয়েট, ডাইক্লোরভস, ম্যালাথিয়ন, ফেনিট্রোথিয়ন, ফোরেট ইত্যাদি)

(৫) সিন্থেটিক পাইরিথ্রয়েড (সাইপারমিথ্রিন, ডেল্টামেথ্রিন, ফেনভালেরেট, ইথোফেনপ্রক্স, ল্যামডা-সায়ালোথ্রিন ইত্যাদি)

(৬) নিওনিকোটিনয়েডস (অ্যাসিমাপ্রিড, ইমিডাক্লোপ্রিড, ক্লোথায়ানিডিন, থায়োমেথোক্সাম ইত্যাদি)

মানবদেহে রাসায়নিক কীটনাশক বিষক্রিয়ার কিছু সাধারণ কুফল

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কীটনাশকগুলি ফসলের কীট শত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হলেও বাস্তবে সেগুলি পরিবেশে বিশেষ করে প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ ক্রিয়া করে।

পারদ ঘটিত ওষুধ এত বেশি বিষাক্ত যে তা কেবল মাত্র অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয় এমন ফসলের বীজ শোধনের কাজে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ওষুধ গুলি বমি বমি ভাব, উদরাময়, শরীরের ভিতরে রক্ত ক্ষরণ, বুকে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ সৃষ্টি করে।

জৈব ক্লোরিন জাত কীটনাশক গুলি এবং এই জাতীয় কিছু অগাছানাশক (২-৪-ডি, ২-৪-৫-টি, ইত্যাদি) রসায়নগুলি সহজে বিয়োজিত হয় না বা খুব ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়। এই জন্য এই রসায়নগুলি সাংঘাতিকভাবে পরিবেশকে দূষিত করে এবং খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে এবং উচ্চস্তরের খাদকদের শরীরে এদের বায়োম্যাগনিফিকেশন ঘটে। এই রসায়নগুলি প্রাণীদেহে প্রবেশ করে কিন্তু প্রাণীদেহ থেকে বেরিয়ে যায় না এবং খাদকের শরীরে তার খাদ্যের মাধ্যমে যতটুকু প্রবেশ করে তার সমস্তটায় তার শরীরে জমা থেকে যায়। ফলে কোন একটি শ্রেণির খাদকের শরীরে তার খাদ্যের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় এই রসায়ন গুলি জমা হয়। এই ঘটনাকে বায়োম্যাগনিফিকেশন বলে। সেইজন্য সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর খাদক যেমন মাছ ও মাংসভোজী প্রাণীদেহে এই সমস্ত রসায়নগুলি অত্যধিক মাত্রায় সঞ্চিত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট জীবদেহের স্বাভাবিক জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। অনেক মৎসভোজী প্রাণী বর্তমানে অবলুপ্তপ্রায় প্রাণীর তালিকায় স্থান পেয়েছে কেননা এই রসায়নগুলি তাদের প্রজনন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এই রসায়নগুলি খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করায় সমগ্র বিশ্ব জুড়েই পুরুষ জাতির স্পার্মকাউন্ট কমে যাচ্ছে এবং

সমগ্র পুরুষ জাতি ধীরে ধীরে বন্ধাত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বজুড়েই মানুষের শরীরে প্রতিদিন প্রায় ০.০৪ থেকে ০.৫ মিলিগ্রাম ডিডিটি প্রবেশ করছে। এই রসায়ন গুলি মস্তিষ্ক, যকৃত, ত্বক ও চর্বিযুক্ত পেশিতে সঞ্চিত হয় এবং একজিমা সহ বিভিন্ন চর্মরোগ উৎপন্ন করে, বৃক্ক ও যকৃতকে দুর্বল করে ও ক্যান্সার তৈরিতে সাহায্য করে। মায়ের শরীর থেকে গর্ভস্থ বাচ্চার শরীরে এগুলি প্রবেশ করে, এমনকি মায়ের দুধেও মাধ্যমেও এই রসায়ন গুলি শিশুর শরীরে প্রবেশ করে ও বিষক্রিয়া ঘটায়। বর্তমানে কৃষিকাজে ডিডিটি ও অন্যান্য কিছু ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন জাত কীটনাশক ব্যবহার বাতিল করা হলেও সারা বিশ্ব জুড়ে ঐ ওষুধগুলি যত ব্যবহৃত হয়েছে তার অবশেষ এখনও প্রকৃতিতে রয়ে গেছে এবং উন্নত দেশগুলিও এর কুফল থেকে মুক্ত নয়।

আগাছানাশক ওষুধগুলি পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এগুলি পতঙ্গভুক প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়, মশা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এবং ভূমিক্ষয় বাড়ায়। তাছাড়া এগুলি মানুষ ও অন্যান্য গবাদি পশুর জন্মগত বিকৃতি ঘটায়।

জৈব ফসফরাস (যেমন, মনোক্রটোফস, ডাইক্লোরভস, ফসফামিডন, ফলিডল, ডায়াজিনন, কুইনালফস, ফোরেট ও কার্বামেট (কার্বারিল, কর্বোফুরান) জাতীয় কীটনাশক গুলি সাংঘাতিক রকমের বিষাক্ত এবং খুব অল্পমাত্রায় এগুলি শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়। এই কীটনাশক গুলি বমি ভাব, উদরাময়, ঘাম ও লালা নিঃসরণ ও পেশির কম্পন ইত্যাদি সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রিয় ও পার্শ্বীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমন করে।

নিওনিকোটিনয়েডস জাতীয় কীটনাশকগুলি অতি অল্প মাত্রায় কাজ করে ও কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রতি এদের বিষক্রিয়া কম। কিন্তু উদ্ভিদের পরাগ সংযোগকারী মৌমাছির প্রতি এদের বিষক্রিয়া খুব বেশী হওয়ায় পরিবেশে এদের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। পরিবেশে মৌমাছির সংখ্যা কমে গেলে অধিকাংশ ফসলে পরাগ মিলন ঠিকমত হবে না ও ফসলের সামগ্রিক উৎপাদন হ্রাস পায়।

কোন কোন কীটনাশকে কিছু ভারী মৌল পদার্থ (যেমন সীসা, পারদ, তামা, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, জিঙ্ক ইত্যাদি) থাকে যেগুলির বিষক্রিয়া পরিবেশে ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে। এই মৌল পদার্থগুলি শরীরে কোষের অভ্যন্তরে বিপাক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় এবং স্নায়বিক ও মানসিক রোগ সৃষ্টি করে। এগুলি ক্যান্সার, হাঁপানি, লিউকোমিয়া, শ্বেতী ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন করতে পারে, মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড, বৃক্ক, যকৃত ও ফুসফুসকে দুর্বল করে। ফলে পৃথিবীতে মানসিক ও শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা বাড়ছে।

মানুষের দেহে কীটনাশক বায়ু বাহিত হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে, দুষিত খাদ্য খাওয়া ও দূষিত জল পানের মাধ্যমে ও কীটনাশকের সরাসরি সংস্পর্শে আসলে চামড়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। মানবদেহে কোন কীটনাশক কতটা বিষক্রিয়া করবে তা নির্ভর করে দেহের মধ্যে কতটা কীটনাশক প্রবেশ করেছে তার উপর ও সংশ্লিষ্ট কীটনাশকটি কতটা বিষাক্ত। জমিতে যারা কৃষিকাজ করেন ও তাদের পরিবারবর্গ সরাসরি কীটনাশকের সংস্পর্শে আসেন এবং কীটনাশকের প্রতি উন্মুক্ত হয়ে পড়েন। তবে পৃথিবীর সমস্ত জনগনের দেহের চর্বিতে কিছু পরিমাণে কীটনাশক রয়েছে। শিশুরা বিশেষ করে কীটনাশকের প্রতি বেশি সংবেদনশীল, কেননা সক্রিয় ভাবে তাদের দেহের বৃদ্ধি ঘটে ও তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। ছয় মাসের কম শিশুরা মায়ের দুধের মাধ্যমে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। কিছু কিছু কীটনাশক দীর্ঘদিন ধরে মানবদেহে জমতে থাকে। উত্তর আমেরিকায় বর্তমানে শিশুদের লিউকেমিয়া ও অন্যান্য ক্যান্সার বেড়ে গেছে। এর কারণ হিসাবে খাদ্য দ্রব্যে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক যা দেহকোশের জিনের মিউটেশন ও বিষক্রিয়া ঘটায় তাদের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান কমিশন পানীয় জলে কীটনাশকের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রতি লিটার জল ০.১ মাইকোগ্রাম অর্থাৎ এক হাজার কোটি ভাগে এক ভাগ (অর্থাৎ প্রায় নেই বললেই হয়। আমাদের দেশে সরকারীভাবে এখনও এরূপ কোন মাত্রা নির্ধারণ হয় নি বা খাদ্যে কীটনাশকের উপস্থিতি নির্ধারণ ও নিয়মিত নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আদেশনামা বা কার্যকরী প্রতিষ্ঠান নেই। আমাদের দেশে কৃষকরা শস্যে কীটনাশক প্রয়োগ করার পর নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার অনেক আগেই এমন কি কীটনাশক ব্যবহারেরর অব্যবহিত পরেই ফসল (বিশেষ করে শাক সব্জি সমুহ) তুলে বাজারে বিক্রি করছেন কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সব্জি তোলার পর তার সংরক্ষণের স্থায়ীত্ব বাড়ানোর জন্য ও চকচকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য কীটনাশক বা অন্য কোন ক্ষতিকারক রাসায়নিকে চুবিয়ে শোধন করে বাজারে পাঠাচ্ছেন। এমনকি অনেক মৎসচাষী মাছ ধরার পূর্বে পুকুরে কীটনাশক প্রয়োগ করে মাছ ধরছেন ও সেই মাছ বাজারে আনছেন।

ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশকের পরিনতি

সাধারণত কীটনাশক জলে গুলে পাতায় স্প্রে করা হয়, বা গুঁড়ো কীটনাশক পাতায় ছড়ানো হয় বা দানাদার কীটনাশক মাটিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয় বা কিছু কীটনাশক গোলায় ধুমায়ির করণের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। পাতায় স্প্রে করা ও পাতায় ছড়িয়ে দেওয়া কীটনাশকের অনেকটাই গড়িয়ে বা উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে। **দানাদার কীটনাশক সরাসরি মাটিতে প্রয়োগ করা হয়**-যার একটি অল্প অংশই **ক্ষতিকারক কীট** সহ **উপকারী পোকাকেও মেরে ফেলে** এবং বেশির ভাগটাই মাটিতে জলীয় অংশে মিশে যায়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশকের মাত্র ০.১ শতাংশ যে পোকা মারার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়েছে তার কাছে পৌঁছেছে এবং বাকী প্রায় সমস্তটাই কৃষি জমিতে বায়ু, জল ও মাটিতে মিশে গেছে, উপকারী পোকার এবং মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবাণুর দেহে প্রবেশ করে তাদের জৈবনিক ক্রিয়ার অংশ নিচ্ছে ও প্রকৃতিতে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে।

কৃষি জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশকের পরিনতি ঃ

(১) কিছু অংশ মাটিতে জলে মিশে ও মৃত্তিকা কণায় আবদ্ধ হয়ে রয়ে যায়,

(২) কিছুটা চুঁইয়ে মাটির তলায় ভূগর্ভস্থ জলে গিয়ে মিশে যায়।

(৩) কিছুট জলের সঙ্গে গড়িয়ে স্থানীয় জলাশয়ে বা নদীনালায় গিয়ে পড়ে।

(৪) কিছু অংশ শিকড়ের মাধ্যমে গাছের দেহে প্রবেশ করে।

(৫) কিছু অংশ রাসায়নিক ভাবে বা কোন জীবাণুর মধ্যস্থতায় ভেঁঙে যায়।

(৬) কিছু অংশ উড়ে গিয়ে বাতাসে মিশে যায়

মাটির উপর কৃষি রসায়নের প্রভাব : বেশ কিছু কীটনাশক মাটিতে বা পরিবেশে দীর্ঘ দিন রয়ে যায় এবং কৃষি পরিবেশের উপর ও তার উৎপাদিকা শক্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কীটনাশকগুলি মূলত মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন অনুজীব ও সাধারণভাবে স্থানীয় প্রাণীকুলের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। মাটিতে কীটনাশকের ব্যবহার না করে এবং জৈব পদার্থ বেশি ব্যবহার করে মাটির উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বাড়ানো যায় এবং ফসলের উৎপাদনও এর ফলে কৃষি রসায়ন ব্যবহার করে সাধারণ চাষের তুলনায় প্রায় এক চতুর্থাংশ বাড়ানো সম্ভব। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে দেখা গেছে প্রয়োগ করা কীটনাশক তাড়াতাড়ি বিয়োদিত হয়ে যায়।

বায়ু দূষণে কৃষি রসায়নের প্রভাব : জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশক বাতাসে কণা আকারে ভেসে থেকে বা বাতাসে ভাসমান ধুলিকণায় আটকে থেকে তা পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার সমস্ত ধরনের প্রাণীদের দেহে বিষক্রিয়া ঘটায়। কীটনাশক প্রয়োগের সময় বাতাসের গতিবেগ, তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর কীটনাশকের এই ছড়িয়ে পড়া নির্ভর করে। বাতাসের গতিবেগ বেশি হলে, আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে ও পরিবেশে তাপমাত্রা বেশি হলে কীটনাশক বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। স্প্রে করা কীটনাশক বা ধূমায়িত করনের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক থেকে কিছু উদ্বায়ী জৈব যৌগ বাতাসে মিশে যায় ও বাতাসে উপস্থিত অন্য কিছু রসায়নের সঙ্গে মিশে বায়ু দূষণকারী পদার্থ ট্রপোস্ফোরিক ওজোন-এর সৃষ্টি করে।

জল সম্পদের উপর কৃষি রসায়নের প্রভাব : বর্তমানে প্রায় সমস্ত জলাশয় ও নদী নালার জলই কৃষি জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশকের দ্বারা দুষিত হয়ে গেছে। কীটনাশক তৈরির কারখানায় কিছু বর্জ্য পদার্থ স্থানীয় জলাশয় ও নদী নালার জলে মিশে তা দূষিত করে। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক বাতাসে ভেসে গিয়ে, জলের সঙ্গে গড়িয়ে বা মাটির মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে স্থানীয় জলাশয়ে মিশে যায় ও জলের দূষণ ঘটায়। কীটনাশক প্রয়োগ করা কৃষি জমি থেকে জলাশয় কত দূরে, জলে কীটনাশকের দ্রাব্যতা, আবহাওয়া, মাটির প্রকৃতি এবং কীটনাশক প্রয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কীটনাশকের এই জলদূষণ কতটা ঘটবে। তবে দেখা যাচ্ছে কেবল মাত্র যে জমিতে রাসায়নিক উপকরণ গুলি প্রয়োগ করা হয় কেবল মাত্র সেখানে বা তার আশেপাশেই তা ছড়িয়ে পড়ে না। সেখান থেকে অনেক দুরে স্থানান্তরিত হয়ে. গিয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটাচ্ছে। কৃষি জমিতে সাধারণত প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মাত্রায় জল (বৃষ্টির জলের মাধ্যমে বা সেচের মাধ্যমে) প্রয়োগ করা হয় এবং কিছু জল প্রয়োগ করা কৃষি রসায়ন সহ কৃষি জমি থেকে গড়িয়ে নিচু স্থানে নিকাশী নালায় গিয়ে পড়ে ও দূর দূরান্তে নদী নালায় ও এমনকি শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে জমা হয়। এই সমস্ত কৃষি রসায়ন গুলি জলাশয়ের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলী পাল্টে দিচ্ছে এবং সেই জলাশয়ের নতুন ধরনের উদ্ভিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে ও স্থানীয় স্বাভাবিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে য়াচ্ছে।

কৃষি জমিতে রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহারের ফলে বিষক্রিয়ায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে ব্যাঙ, সাপ, কেঁচো, বিভিন্ন পতঙ্গভুক পাখী, পেঁচা, বাদুড়, চামচিকে ও অন্যান্য বহু উপকারী পোকা মাকড় স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে। ফলে ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের তুলনামূলক সংখ্যা আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রতি তারা প্রতিরোধক্ষম হয়ে উঠেছে। ফলে কৃষকরা অজ্ঞানতাবশত আরও বেশি বিষাক্ত কীটনাশক আরও বেশি মাত্রায় ব্যবহার করছেন। পরিনামে পরিবেশে আরও ব্যাপক কীটনাশক দূষণ ঘটছে এবং উৎপন্ন ফসল সামগ্রী আরও ব্যাপকভাবে মানুষ সহ সমস্ত জীবের শরীরে বিষক্রিয়া ও স্বাস্থ্য হানি ঘটাচ্ছে। পৃথিবীতে প্রতিবছও প্রায় দশ লক্ষ লোক কৃষি রসায়নের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং ২০০০ লোক মারা যাচ্ছে। জমিতে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাটিতে বসবাসকারী ও জৈব পদার্থ বিয়োজনকারী বিভিন্ন জীবও জীবাণু সমুহ বিষক্রিয়ায় মারা যাচ্ছে-ফলে পরিবেশে বিভিন্ন মৌল পদার্থের চক্রাকারে আবর্তন (নিউট্রিয়েন্ট রিসাইক্লিং) ব্যাহত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ফসলের কীটশত্রুগুলি এক সঙ্গে অনেকগুলি কীটনাশকের এমন কি যে সমস্ত কীটনাশক এখনও প্রয়োগ করা হয় নি, সেগুলির বিরুদ্ধেও প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলেছে (ক্রস রেসিস্ট্যান্স)। ফলে কীটনাশক গুলি রোগ পোকা দমন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কোন কোন স্থানে কীটনাশক প্রয়োগের পূর্বে

যে সমস্ত কীট শত্রুগুলি গৌণকীট ছিল, সেগুলি বর্তমানে মুখ্যকীটে পরিনত হয়েছে ও দ্রুতসংখ্যা বৃদ্ধি করে ফসলের হানি ঘটাচ্ছে। অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগের ফলে কীটশত্রুর স্বাভাবিক শত্রুদের বিনাশই এর মুখ্য কারণ।

প্রাণী স্বাস্থ্যের উপর কৃষি রসায়নের প্রভাব : কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক স্থানীয় প্রাণীজগতের উপর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব ফেলে। কোন জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করার জন্য গৃহপালিত বা বন্য প্রাণী ঐ ক্ষেতে ঢুকে কিছু ফসল খেয়ে ফেললে সেই প্রাণীটি সরাসরি কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করলে কিছু কিছু প্রাণীর খাদ্য পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় ও সেই প্রাণীটি অন্য কোথাও চলে যায়, বা তার খাদ্যাভ্যাস পাল্টে ফেলে বা না খেতে পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। যেমন কোন পাখী কীটনাশক খেয়ে মরে গেছে এমন পোকা খেয়ে ফেললে তার দেহেও কীটনাশকের বিষক্রিয়া ঘটে। মাটিতে কীটনাশকের অবশেষ কেঁচোর বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৭.২ কোটি পাখি প্রতি বছর কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় মারা যায়। ইউরোপে ১১৬ প্রজাতির পাখী কীটনাশকের দূষণের ফলে বিলুপ্ত হতে বসেছে। জমিতে প্রয়োগ করা ছত্রাকনাশক গুলি প্রাণীদেহে কম বিষক্রিয়া ঘটালেও তা মাটিতে কেঁচোর সংখ্যা কমিয়ে দেয়। দানাদার কীটনাশককে কোন কোন পাখী দানাশস্য মনে করে খেয়ে ফেলে এবং ঐ সমস্ত কীটনাশকের কয়েকটি দানাই একটি ছোট পাখীকে মেরে ফেলে। আগাছানাশক রসায়ন গুলি সরাসরি পাখি না মারলেও এই কীটনাশক গুলি স্থানীয় পাখীর বাসস্থান ও বেঁচে থাকার পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

কীটনাশকের দূষণে কোন জলাশয়ের জল দূষিত হয়ে গেলে সেই জলাশয়ে মাছও মারা যায়। কোন জলাশয়ে আগাছানাশক প্রয়োগের ফলে মৃত গাছগুলি পচে গেলে সেই পচনশীল জৈব পদার্থগুলি সেই জলাশয়ের জলের সমস্ত অক্সিজেন নিঃশেষ করে দেয় ফলে সেই জলাশয়ে আর কোন মাছ আর বেঁচে থাকতে পারে না। কোন জলাশয়ে অল্প মাত্রায় জলে কীটনাশকের দূষণ ঘটলে মাছ সরাসরি মরে যায় না কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে বা বারবার এই ভাবে স্বল্প মাত্রার কীটনাশক দূষণে মাছের শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে ও তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে (রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়) এবং শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে গিয়ে তারা অন্য কোন শিকারী প্রাণীর খপ্পরে পড়ে যায়। বিভিন্ন কীটনাশক ও আগাছা নাশক জলে প্রাণীকণা (zooplancton) ও উদ্ভিদকণা (phytoplancton)-র সংখ্যা কমিয়ে দেয় ফলে সেই জলাশয়ে মাছের খাদ্যের অভাব ঘটে। সাধারণতঃ পোকানাশক রসায়নগুলি আগাছানাশক ও ছত্রাকনাশক রসায়ন গুলির তুলনায় জলে বসবাসকারী প্রাণীদের পক্ষে বেশি ক্ষতিকারক। যে সমস্ত কৃষি রসায়নগুলি পরিবেশে তাড়াতাড়ি বিয়োজিত হয়ে যায় সেগুলি এই সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে কম ক্ষতিকারক।

গোটা বিশ্বজুড়েই প্রকৃতিতে ব্যাঙের সংখ্যা কমে গেছে। কৃষি জমিতে বিভিন্ন কৃষিরসায়নের ব্যবহার এর একটি মুখ্য কারণ। জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের কৃষি রসায়নের সমাবেশ ব্যাঙাচির পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং তাদের শিকার ধরায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দেখা গেছে অ্যাট্রাজিন অগাছা নাশক পুরুষ ব্যাঙ কে উভলিঙ্গ ব্যাঙে পরিনত করে ও ব্যাঙের প্রজনন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুর উপর কৃষি রসায়নের প্রভাব : সাধারণ ভাবে মাটিতে কীটনাশকের উপস্থিতি মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুর সংখ্যা কমিয়ে দেয় ও এর ফলে মাটিতে

নাইট্রোজেন সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে ও ফসলের উৎপাদনও কমে যায়। ডিডিটি, মিথাইল প্যারাথিয়ন, পেন্টাক্লোরো-ফেনল শুঁটি জাতীয় ফসল ও এই সমস্ত ফসলের শিকড়ে বসবাসকারী রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে রাসায়নিক সংকেত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে এই জাতীয় ফসলে আর নাইট্রোজেন আবদ্ধ হতে পারে না।

পরিবেশে কীটনাশক প্রতিরোধক্ষম কীটের উদ্ভব ও নতুন ধরনের কীটের প্রাদুর্ভাব : কোন কৃষি ক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে সমস্ত পোকা মারা যায় না। প্রাথমিকভাবে অনেক পোকাই মারা গেলেও ক্রমে সেই কীটনাশকের প্রতি নতুন প্রজন্মের পোকাগুলি প্রতিরোধক্ষম (pest resistance) হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে কোন ক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রজাতির পোকার বিভিন্ন পোকার মধ্যে সামান্য জিনগত পার্থক্য থাকে। কীটনাশক প্রয়োগের ফলে সেই কীটনাশককে প্রতিরোধ করতে পারে এমন জেনেটিক গঠনযুক্ত পোকা গুলি বেঁচে যায় ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তারা বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে।

কৃষিজমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করলে ক্ষতিকারক পোকা ছাড়াও অনেক প্রজাতির বন্ধুপোকা (যেমন পরভোজী, পরজীবী ও পোকার রোগ সৃষ্টি করে এমন জীবাণু) মারা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন বিশেষ শ্রেণীর কীটনাশক প্রয়োগ করার পর প্রাথমিকভাবে পোকা নিয়ন্ত্রণ সম্ভবহলেও কয়েক প্রজন্ম পরে সেই পোকাটি আরও ব্যাপক ভাবে ফসলকে আক্রমণ করছে (pest resurgence)। এর কারণ হল প্রকৃতিতে সেই পোকাটিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত তার স্বাভাবিক শত্রুর সংখ্যা কমে যাওয়া। পরিবেশে ক্ষতিকারক পোকার স্বাভাবিক শত্রুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু গৌণপোকা যা আগে সেরকম ক্ষতিকারক মাত্রায় উপস্থিত ছিল না তারাও নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে মুখ্য ক্ষতিকারক পোকায় পরিনত হচ্ছে। সাধারণত দেখা গেছে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে বন্ধু পোকার সংখ্যা ব্যাপক ভাবে কমে যায় এবং পরবর্তী কালে ফসলে ক্ষতিকারক পোকার সংখ্যা সেই ফসলে ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

বিকল্প কৃষি ব্যবস্থা-জৈব কৃষি ও ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ : অবশ্য এখন যদি চাষবাদে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে প্রাথমিকভাবে কৃষি উৎপাদন কিছুটা কমে যেতে পারে। তাই এগুলির সুষ্ঠু প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবহারের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। কয়েক দশক পিছিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাব , তখন কোন রকম রাসায়নিক উপকরণ ছাড়াই শস্য উৎপাদিত হত-কেবলমাত্র জৈবসার (যেমন গোবর সার, কম্পোস্ট, খইল, হাড়গুঁড়ো ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতে গোবর সারের মাধ্যমে দুই তৃতীয়াংশ সারের জোগান দেওয়া সম্ভব। গোবর সার মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু চাষাবাদে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হওয়ায় কৃষকের ঘরে গরুর সংখ্যা কমে গেছে এবং জৈব সার সরবরাহের এই বড় উৎসটি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। গোবর সার আবার জ্বালানীর কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। জৈব সার সরবরাহের জন্য উপায়গুলি (যেমন ধইঞ্চা চাষ বা অন্যান্য সবুজ সারের চাষ, ডাল শস্য চাষ, ঘাস চাষ ও সবুজ পাতা সারের ব্যবহার ইত্যাদি) কৃষকদের মধ্যে সেরকম জনপ্রিয় না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

চাষাবাদে শস্য উৎপাদনে স্থিতিশীলতা আনতে ও ক্রমবর্ধমান জনগণের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চাষাবাদে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে সুসংহত নিবিড় খামার পদ্ধতির (intensive integrated farming system)-

এর মৌল গবেষণা ও এর রূপায়ণ প্রয়োজন যাতে কৃষকরা সারা বছর ধরে নিজের প্রয়োজনে ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন কৃষিজপন্য উৎপাদন করতে ও সারা বছর ধরে কর্মরত থাকতে পারেন। চাষাবাদের সঙ্গে আনুষঙ্গিক প্রকল্প হিসাবে হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, মৌমাছি পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

আশার কথা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্ব জুড়েই টেকসই সংরক্ষণশীল চাষাবাদ ও জৈবকৃষি নিয়ে সবিস্তর আলোচনা হচ্ছে। এর মূল কথা হল চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত কোন উপকরণই বিনষ্ট হবে না, পরিবেশ দূষিত হবে না ও পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে না ও কৃষি জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস ঘটবে না। এর জন্য দরকার (১) চাষাবাদে জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করা, (২) সুসংহত উপায়ে ফসলের পুষ্টি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, (৩) সুসংহত উপায়ে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা এবং (৪) ভূমি ও জলের সুষ্ঠু পরিবেশানুগ ব্যবহার। এছাড়াও দরকার আঞ্চলিক জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত শস্যক্রম বাছাই করা, অরণ্য সম্পদ বাড়ানো, ভূমিক্ষয় রোধ করা, সংকর প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তির সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ এবং সঠিক খামার পরিকল্পনা। এ ছাড়া অনুর্বর পতিত জমির উন্নয়ন ঘটানোও দরকার। বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনা জলবিভাজিকাকে ভিত্তি করে করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে সর্বোচ্চ ফলন নয়, সর্বাপেক্ষা অনুকূল ফলন যাতে এই কৃষি পরিবেশ সুদূর ভবিষ্যতেও উৎপাদিকা শক্তি বজায় রাখতে পারে। বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ভূমি, জল, জৈব বৈচিত্র্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবেশানুগ ব্যবহারই আমাদের সত্যিকারের সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ আনতে পারে।

পত্র ঃ ২ | একক ২ ❐ অম্ল, ক্ষার ও লবণাক্ত মাটি সংশোধন

গঠন

২.১ মাটির বিক্রিয়া
২.২ ক্যাটায়ন বিনিময়
২.৩ অম্ল মাটি

২.১ মাটির বিক্রিয়া

মাটিকে একটি জৈব রসায়নাগার বলা চলে। মাটির মধ্যে নানা প্রকারের জৈব ও রাসায়নিক জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলছে। নিরন্তর ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে মাটির দ্রবণে যে রাসায়নিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাকেই **মাটির বিক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া** বলে এবং এটি পি. এইচ (pH) দ্বারা মাপা হয়। কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে মাটির প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করে ফসল চাষের উপযোগী করে তোলা যায়। একে **মাটি সংশোধন** বলে। আরও বিশদভাবে বলা যায়, যে পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়াজনিত অবাঞ্ছিত পি. এইচ (আম্লিক/ক্ষারীয়) বা অতিরিক্ত লবণত্ব দূর করে মাটির দ্রবণে ফসলের সুষম ও স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তথা প্রতিক্রিয়া আনা হয়, তাকেই মাটি সংশোধন বলে। মাটির রাসায়নিক পরিবেশের ওপর মাটির জীবাণু ও মাটির ওপরে গাছপালার উপস্থিতি ও বৃদ্ধি নির্ভর করে। জৈব পদার্থ, অজৈব পদার্থ, জল ও বায়ু এই চারটি উপাদান নিয়ে মাটি গঠিত। মাটির রন্ধ্র পরিসরে জল থাকে ও এই জলে নানা প্রকারের লবণ, অম্ল ও ক্ষারীয় পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মাটির এই সব লবণ, অম্ল ও ক্ষারীয় পদার্থ মাটির বিক্রিয়াশীল কণাগুলোর সংস্পর্শে এসে নানাপ্রকার বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অবশ্য মাটির সকল জৈব ও অজৈব কণাই বিক্রিয়াশীল নয়। জৈব পদার্থের অতি সূক্ষ হিউমাস কণা (অর্থাৎ হিউমাস কলয়েড) এবং অজৈব পদার্থের অতি সূক্ষ ক্লে-কণা (অর্থাৎ ক্লে-কলয়েড) মাটির বিভিন্ন বিক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। মাটিতে অজৈব পদার্থই বেশি থাকে। তাই মাটিতে অধিকাংশ বিক্রিয়া ক্লে-কলয়েডের সঙ্গে সংঘটিত হয়। মাটিতে সাধারণত তিন প্রকারের বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। যথা :

(১) আম্লিক (Acidity),

(২) ক্ষারীয় (Alkalinity),

(৩) নিরপেক্ষ (Neutrality)।

বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষার জাতীয় পদার্থ অপসারিত হয় ও মাটির দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে মাটি অম্ল হয়। অম্ল মাটিতে গাছপালার বৃদ্ধি নানাভাবে ব্যাহত হয়।

অপরদিকে, শুকনো ও আধা শুকনো অঞ্চলের মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ঘটিত লবণের আধিক্য দেখা যায় এবং এদের জন্য মাটির দ্রবণে হাইড্রোজেন (H^+) আয়নের চেয়ে হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নের

পরিমাণ বেশি হয়। তার ফলে মাটি ক্ষারীয় মাটিতে পরিণত হয়। মাটির দ্রবণে ক্ষারীয় লবণ ও মৃদু অম্ল (যেমন ঃ সোডিয়াম কার্বোনেট) যুক্ত হলে ও ধারাবাহিকভাবে আর্দ্র বিশ্লেষিত হলে ক্ষারত্ব সৃষ্টি হয়।

যে সব অঞ্চলের মাটিতে হাইড্রোজেন (H^+) ও হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নের পরিমাণ মোটামুটি সমান থাকে, সে সব অঞ্চলের মাটি নিরপেক্ষ হয়।

২.২ ক্যাটায়নের বিনিময়

কঠিন কঠিন পদার্থের অথবা কঠিন তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে ক্যাটায়ন বিনিময় চলতে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আদর্শ তাপমাত্রায় ও উপযুক্ত ভিজে থাকা অবস্থায় ভিজে অঞ্চলের খনিজ মাটি ক্যালসিয়াম শোষণ করে রাখে। মাটিতে জৈবপদার্থের পচনের ফলে কার্বনিক অম্ল উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন হাইড্রোজেন আয়ন মাটির কলয়েডের ধনাত্মক আয়ন ক্যালসিয়ামকে (Ca^{++}) অপসারিত করে। এটি কেবলমাত্র দলবদ্ধ ক্রিয়ার জন্যই হয় না। হাইড্রোজেন আয়ন ক্যালসিয়াম আয়ন অপেক্ষা বেশি পরিমাণে শোষিত হওয়ার জন্যই এটি সংঘটিত হয়।

এই বিক্রিয়া মোটামুটি তাড়াতাড়ি চলতে থাকে এবং ক্যালসিয়াম ও হাইড্রোজেনের বিনিময়ে রাসায়নিক ভাবে সমতা থাকে। মাটিতে চুন প্রয়োগ করার ফলে যদি মাটিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ে অথবা কোনও কারণে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ কমে যায়, তাহলে দলবদ্ধ ক্রিয়ার ফলেই বিক্রিয়ার নিষ্পত্তি ঘটে। অপরপক্ষে নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম আয়ন বিনষ্ট হলে অথবা হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বাড়লে বিক্রিয়াটির নিষ্পত্তি ঠিকমত হয়। মাটি এতই পরিবর্তনশীল যে, এর স্থিতাবস্থা সবসময়ই পরিবর্তন হচ্ছে এবং অবস্থাভেদে পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ক. ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা

100 গ্রাম শুকনো মাটি যত মিলিগ্রাম হাইড্রোজেন বা সম ক্ষমতা সম্পন্ন অন্য ধাতু বা ক্যাটায়ন আকর্ষণ করতে পারে, তাকেই সেই মাটির ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা বলা হয়।

ক্যাটায়ন বিনিময় সাধারণত নীচের অবস্থাগুলোর মধ্যে সংঘটিত হয়। যথা :

(১) মাটির দ্রবণের ক্যাটায়ন এবং ক্লে-কণা ও হিউমাস কণার ক্যাটায়ন;

(২) উদ্ভিদমূল কর্তৃক মুক্ত ক্যাটায়ন এবং ক্লে-কণা ও হিউমাস কণার ক্যাটায়ন;

(৩) দুটো ক্লে-কণা, দুটো হিউমাস কণা অথবা ক্লে-কণা ও হিউমাস কণা।

ক্যালসিয়াম সংপৃক্ত কলয়েডকে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা বিক্রিয়া ঘটানো যায়, তাহলে ক্যালসিয়াম অপসারিত হবে। এর ফলে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মাধ্যম থেকে বিতাড়িত হয় না। অন্যদিকে সমতা না আসা পর্যন্ত বিনিময় মাধ্যম থেকে সোডিয়ামকে অপসারিত করতে থাকে, যেখানে ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম দ্বারা কলয়েড বিদ্যুৎযুক্ত থাকে। বিনিময়যোগ্য পদার্থ থেকে যদি সমস্ত ক্যালসিয়ামকে অপসারিত করতে হয়, তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে মাটির বিক্রিয়া ঘটাতে হবে। এতে ক্যালসিয়াম বিতাড়িত হবে এবং সোডিয়ামকে অপসারিত করার জন্য ক্লে-কলয়েডের মধ্যে কোনও বিক্রিয়া ঘটার সুযোগ থাকবে না।

কৃষিতে সালোক সংশ্লেষ-এর পরেই ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতার গুরুত্ব। ক্যাটায়ন বিনিময়ের ফলে নীচের সুফলগুলো পাওয়া যায়।

(১) **উদ্ভিদখাদ্য ধারণ** : মাটিতে দ্রবণীয় উদ্ভিদখাদ্য প্রয়োগ করলে ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যোপাদান ক্লে-কলয়েডে শোষিত হয়ে মাটিতে থেকে যায়। এর ফলে নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদখাদ্যের অপচয় রোধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাটিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে অ্যামোনিয়াম আয়ন অন্যান্য ক্যাটায়ন, বিশেষ করে ক্যালসিয়ামকে, সরিয়ে দিয়ে তার স্থান অধিকার করে ক্লে-কলয়েডে শোষিত অবস্থায় থাকে। এভাবে খাদ্যোপদানটি উদ্ভিদের ব্যবহারের জন্য মাটির কণায় আবদ্ধ হয়ে থেকে যায়। অপরদিকে নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন অপচয় হয়ে যেতে পারত। একই ভাবে অন্যান্য খাদ্যোপাদান (যেমন : ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি) মাটিতে প্রয়োগ করলে ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার দ্বারা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

(২) **উদ্ভিদ দ্বারা খাদ্যউপাদান শোষণ** : উদ্ভিদখাদ্য দ্রবণীয় ও বিনিময় অবস্থায় থাকলে উদ্ভিদ তা সহজে গ্রহণ করতে পারে। উদ্ভিদ উভয় অবস্থা থেকেই ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য শোষণ করে। উদ্ভিদমূলে যে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে, তা ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপসারিত হয় এবং এর ফলে মাটি দ্রবণের খাদ্যউপাদান উদ্ভিদমূল শোষণ করতে পারে।

(৩) **অম্ল ও ক্ষারমাটি সংশোধন** : ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার জন্য অম্ল ও ক্ষার মাটি সংশোধন করা সম্ভবপর। অম্ল মাটিতে চুনের আকারে যে ক্যালসিয়াম আয়ন প্রয়োগ করা হয়, তা ক্লে-কলয়েডে শোষিত হাইড্রোজেন আয়নকে অপসারিত করে দেয়। তার ফলে ক্লে-কলয়েড ক্যালসিয়াম আয়ন দ্বারা সম্পৃক্ত হয় ও মাটির পি.এইচ-এর মান বাড়ায়। একইভাবে ক্ষার মাটিতে জিপসাম প্রয়োগ করা হলে, জিপসামের ক্যালসিয়াম আয়ন ক্লে-কলয়েডের সোডিয়াম আয়নকে ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপসারিত করে দেয়। তার ফলে ক্ষার মাটি সংশোধন হয়।

মাটির পি-এইচ : পি.এইচ-এর অর্থ 'হাইড্রোজেন' ক্যাটায়নের ওজন। যে স্কেল বা মাপের দ্বারা কোনও দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়, তাকে পি. এইচ বলে।

মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাণ পি.এইচ মানের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পি.এইচ স্কেলটিকে ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত, ১৪টি সমান পি.এইচ এককে ভাগ করা হয়েছে। মাটির পি.এইচ মান ৭ হলে তাকে নিরপেক্ষ বা প্রশম মাটি (Neutral soil) বলে। পি.এইচ মান ৭-এর কম হলে সেই মাটিকে অম্ল ও পি.এইচ মান ৭-এর বেশি হলে সেই মাটিকে ক্ষার মাটি বলা হয়। কোনও দ্রবণের পি.এইচ মান ৭-এর অর্থ এক লিটার জলে ০.০০০০০০১ গ্রাম হাইড্রোজেন ও সমপরিমাণ হাইড্রোক্সিল আয়ন আছে। মনে রাখতে হবে পি.এইচ মান ৫ পি.এইচ মান ৬ অপেক্ষা ১০ গুণ বেশি অম্ল। মাটির পি.এইচ খুব কম হলে (অর্থাৎ মাটি খুব বেশি অম্ল হলে) অনেক উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানের সহজলভ্যতা কমে যায়। ফলে ফসলের উৎপাদন কমে। মাটির পি.এইচ ৬-৬.৫ এর কম হলে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও মলিবডিনামের সহজলভ্যতা অস্বাভাবিক রকম কমে যায় এবং তার ফল স্বরূপ গাছের সম্যক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

অবশ্য পি.এইচ মান ৫ থেকে ৬.৫ পর্যন্ত হলে অম্লমাটিতে লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন, তামা, দস্তা প্রভৃতি অতি সহজেই গাছের গ্রহণযোগ্য হয়।

২.৩ অম্ল মাটি

মাটির দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ হাইড্রোক্সিল আয়ন অপেক্ষা বেশি হলে মাটি অম্ল হয়। মাটির মধ্যে কলয়েড নামক অংশের অম্ল বিক্রিয়ার ফলে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়। কলয়েডের চারপাশের ধনাত্মক ক্ষার

জাতীয় পদার্থ সহজেই হাইড্রোজেন আয়ন দ্বারা অপসারিত হয়। তার ফলে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এটি হাইড্রোক্সিল আয়ন অপেক্ষা বেশি হলে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়। নীচে কিভাবে প্রশম মাটি অম্ল মাটিতে রূপান্তরিত হয়, তা দেখানো হল।

মাটির অম্লতা দু'প্রকারের হয়। যথা :

(১) **সক্রিয় অম্লতা** : মাটির দ্রবণে মুক্ত হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ হাইড্রোক্সিল আয়ন অপেক্ষা বেশি থাকার জন্য যে অম্লতার সৃষ্টি হয়, তাকে সক্রিয় অম্লত্ব বলে। মাটির পি.এইচ নির্ণয়ের সময় এই হাইড্রোজেন আয়নগুলোকেই মাপা হয়।

(২) **নিষ্ক্রিয় বা সঞ্চিত বা গুপ্ত অম্লতা** : মাটির দ্রবণে মুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন ছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং মাটির কাদা কণা ও জৈব পদার্থের গায়ে আবদ্ধ হাইড্রোজেন থাকায় এই ধরনের অম্লতার সৃষ্টি হয়। এর পরিমাণ সক্রিয় অম্লতার চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

সারণী : ২.৮. **মাটির সক্রিয় অম্লত্ব ও সঞ্চিত অম্লত্বের পার্থক্য**

সক্রিয় অম্লত্ব	সঞ্চিত অম্লত্ব
(১) মাটির দ্রবণে মুক্ত হাইড্রোজেনের পরিমাণ হাইড্রোক্সিল আয়ন অপেক্ষা বেশি থাকার জন্যে যে অম্লতার সৃষ্টি হয়, তাকে সক্রিয় অম্লত্ব বলে।	(১) মাটির দ্রবণে মুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন ছাড়াও ক্লে-কলয়েডে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন আয়ন আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এর ফলে মাটিতে যে অম্লত্ব সৃষ্টি হয়, তাকে সঞ্চিত অম্লত্ব বলে।
(২) মাটিতে অজৈব অম্লের (যেমন : সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও ফসফরিক অ্যাসিড) বৃদ্ধিতে সক্রিয় অম্লত্বের পরিমাণ বাড়ে।	(২) মাটিতে জৈব অম্লের (যেমন : কার্বনিক অ্যাসিড) বৃদ্ধিতে সঞ্চিত অম্লের পরিমাণ বাড়ে।
(৩) মাটি পরীক্ষায় পি. এইচ. নির্ণয় করে সক্রিয় অম্লত্ব পরিমাপ করা যায়।	(৩) মাটির পি. এইচ নির্ণয় করে সঞ্চিত অম্লত্বের পরিমাপ করা যায় না।
(৪) পরিমিত পরিমাণে চুন প্রয়োগ করে সক্রিয় অম্লত্ব সংশোধন করা যায়।	(৪) চুন প্রয়োগ করে মাটি থেকে সক্রিয় অম্লত্ব দূরীভূত করার পর সঞ্চিত অম্লত্ব মুক্ত হয়ে পুনরায় মাটিকে অম্ল করে দেয়। সেজন্যে কিছুদিনের ব্যবধানে কয়েক দফায় চুন প্রয়োগে মাটির সঞ্চিত অম্লত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
(৫) মাটির সক্রিয় অম্লত্ব বৃদ্ধিতে মাটিতে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, তামা প্রভৃতি ক্রমশ দ্রবীভূত অবস্থায় আসে। মাটির পি এইচ ৬.৫-এ সব শস্যই এই অনুখাদ্যগুলো গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পি এইচ ৫.০-এর নীচে হলে এই সব উপাদানগুলোর অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এগুলো শস্যের উপর বিষক্রিয়া করে।	(৫) মাটির অনুখাদ্যগুলো ধীরে ধীরে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।

(৬) মাটিতে সক্রিয় অম্লত্ব 'ফসফেট বন্ধন' দ্বারা ফসফরাসের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। (৭) অম্লঘটিত অসুবিধাগুলো সক্রিয় অম্লত্বের জন্যে হয়।	(৬) মাটিতে 'ফসফেট বন্ধনে' সঞ্চিত অম্লত্বের কোন ভূমিকা নেই। (৭) সঞ্চিত অম্লত্ব এই রকম কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না।

(ক) অম্লমাটির সৃষ্টি

কতিপয় কারণে অম্ল মাটির সৃষ্টি হয়। যথা :

(১) **অম্লশিলা** : গ্রানাইট প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট মাটি স্বভাবতই অম্ল হয়। কারণ, এই শিলার মধ্যে সিলিকার ভাগ বেশি থাকে এবং এটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নানাপ্রকারের সিলিসিক অ্যাসিডের সৃষ্টি করে। এর ফলে অম্ল শিলা থেকে যে মাটির সৃষ্টি হয়, সেই মাটি স্বভাবতই অম্ল হয়।

(২) শিলার মধ্যে নানা প্রকারের ক্ষারীয় পদার্থ থাকে। শিলার রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের সময় ক্ষারীয় পদার্থের কিছু অংশ নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় জলের দ্বারা অপসারিত হয়। কিন্তু শিলার মধ্যের লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি ধাতু সিলিসিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অক্সাইড, সিলিকেট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অম্ল লবণ উৎপন্ন করে। এই সকল অম্ল লবণ মাটিতে থেকে মাটির অম্লত্বের সৃষ্টি করে।

(৩) বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে মাটির ক্ষার জাতীয় পদার্থ (যেমন : ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি) নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়। এইভাবে মাটিতে ক্ষার জাতীয় পদার্থ ক্রমাগত কমে যাওয়ার ফলে মাটির অম্লত্বের পরিমাণ বাড়ে ও তার ফলে অম্ল মাটির সৃষ্টি হয়।

(৪) জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়া চলার সময় কতিপয় জৈব অম্ল (যেমন : অ্যাসিটিক, অক্সালিক ও সাইটিক অ্যাসিড) উৎপন্ন হয় ও এদের প্রভাবে মাটির অম্লত্ব সৃষ্টি হয়। এছাড়া জৈব পদার্থের পচন এবং মাটির জীবাণু ও উদ্ভিদ মূলের শ্বাসকার্যের ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই অক্সাইড ও মাটির জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে **কার্বনিক অম্ল** সৃষ্টি হয়। এর ফলে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) মাটির মধ্যে কতিপয় অজৈব অম্ল থাকায় অনেক সময় মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) অম্ল সৃষ্টিকারী রাসায়নিক সার (যেমন : অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া প্রভৃতি) বারবার প্রয়োগ করলে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, নাইট্রিকরণের ফলে অ্যামোনিয়াম আয়ন নাইট্রেট তৈরি করে এবং এটি পরে নাইট্রিক অম্ল তৈরি করে এবং সালফেট আয়ন সালফিউরিক অম্ল উৎপন্ন করে। সুতরাং মাটির অম্লতা সৃষ্টির এটি একটি অতিরিক্ত কারণ।

অল্পমাত্রাতে হলেও আরও দু'ভাবে অ্যামোনিয়াম আয়ন মাটিতে অম্ল সৃষ্টি করে থাকে। যথা :

(ক) মাটিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার প্রয়োগ করলে এর অ্যামোনিয়াম আয়ন কলয়েড কাদা কণার ঋণাত্মক চার্জ দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে কলয়েড কাদা কণার গায়ে আবদ্ধ ক্ষারীয় ধনাত্মক আয়নগুলো প্রতিস্থাপিত হয়ে মাটির জলীয় দ্রবণে চলে আসে। জলনিকাশের সময় এইসব ধনাত্মক ধাতব আয়নগুলো মাটির নীচে চুইয়ে বের হয়ে যায় ও ফলে মাটি অম্লধর্মী হয়ে পড়ে।

(খ) কলয়েড কাদাকণার গায়ে আবদ্ধ হাইড্রোজেন আয়ন অ্যামোনিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে জলীয় দ্রবণে চলে আসে ও মাটির জলীয় দ্রবণে সালফিউরিক অম্ল উৎপন্ন হয় এবং পরোক্ষভাবে মাটিকে অম্ল করে তোলে। এছাড়া কিছু কিছু উদ্ভিদ ও জীবাণু অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক রাসায়নিক সারের অ্যামোনিয়াম আয়নকে

সালফেট আয়নের তুলনায় বেশি পরিমাণে গ্রহন করে। এর ফলে মাটির সালফেট আয়ন মাটির জলীয় দ্রবণে থেকে যায় এবং এটি হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অম্ল উৎপন্ন করে ও মাটিকে অম্ল করে তোলে।

অ্যামোনিয়াম যৌগ ছাড়া যে সব রাসায়নিক সার যেমন, ইউরিয়া এবং কিছু কিছু জৈব পদার্থ আর্দ্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেসব অ্যামোনিয়াম আয়ন উৎপন্ন করে, তারা মাটিতে অম্লত্ব সৃষ্টির জন্যে কিছু পরিমাণে দায়ী। উদ্ভিদখাদ্য হিসাবে মাটির জলীয় দ্রবণ থেকে লবণের ধনাত্মক আয়ন গ্রহণ করে এবং এর পরিবর্তে শিকড়ের মাধ্যমে হাইড্রোজেন আয়ন বের হয়ে আসে। ফলে মাটি অম্ল হয়ে পড়ে।

অম্লমাটিতে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, মলিবডিনাম ও বোরনের ঘাটতি এবং লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের আধিক্য দেখা যায়।

পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মাটিতেই দ্রবণীয় লবণ স্বাভাবিক। তবে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে (দঃ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার দক্ষিণ ভাগে) কিছু বেশি। সারা রাজ্যে ৪.৫-৬.০ পি. এইচ মাত্রার মধ্যে মোট অম্ল জমির পরিমান ২০০৯ মিলিয়ন হেক্টর।

কয়েকটি ফসলের উপযোগী 'পি.এইচ'-এর সীমা

ফসল	'পি.এইচ'-এর সীমা
ধান	৫.০-৬.৭
গম, যব, যই	৫.৫-৭.৫
ভুট্টা	৫.৫-৭.৫
ছোলা, মটর, কলাই (ডালজাতীয় শস্য)	৬.০-৭.৫
সরষে (তৈলবীজ)	৬.০-৭.৫
আলু	৫.০-৬.৫
শাকসবজি	৫.৫-৭.৫
আখ	৬.০-৮.০
পেঁয়াজ	৬.০-৮.০
পাট	৬.০-৭.৫

বিভিন্ন জেলায় অম্লজমির অম্লত্বের কারণ এবং উদ্ভিদ খাদ্যের অবস্থা

অম্ল মাটিতে অম্লত্ব বাড়ার সাথে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা ইত্যাদি উদ্ভিদখাদ্যের প্রাপ্তি বেশি হয় ও গাছের পক্ষে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় ও গাছ এদের প্রয়োজনীয় জোগানের অভাবে ভোগে। ফসফরাসের প্রাপ্তিও কম হয়। পি.এইচ কমলে অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রণ ফসফেটের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে ফসফেট মাটিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সারের মাধ্যমে দেওয়া ফসফেটেরও ঘাটতি দেখা যায়। ল্যাটারাইট শ্রেণীর মাটিতে এই প্রক্রিয়া বেশি হয়। অম্ল মাটিতে মলিবডিনামের প্রাপ্তি কমে, কিন্তু লোহা, বোরণ, দস্তা ও ম্যাঙ্গানিজের প্রাপ্তি বাড়ে। এই অবাঞ্ছিত ফলাফলের জন্য ফসলের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাই অম্ল মাটি শোধন করে নেওয়াই নিরাপদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চুন ব্যবহারের সুপারিশ দেওয়া হল :

বিভিন্ন প্রকার মাটিতে চুন জাতীয় পদার্থ প্রয়োগের মাত্রা (হেক্টর পিছু টনে)

চুনজাতীয় পদার্থ	মাটির শ্রেণী		
	হাল্কা (বেলে বা বেলে দোআঁশ)	মাঝারি (দোআঁশ বা পলি দোআঁশ)	ভারী (এঁটেল বা এঁটেল দোআঁশ)
১) চূর্ণ ঘুটিং বা চূণা পাথর	২.৫০০	৫.০০০	৭.৫০০
২) বেসিক স্ল্যাগ	১.২৫০	২.৫০০	৩.৭৫০
৩) চক স্ল্যাজ	১.২৫৭	২.৫০০	৩.৭৫০
৪) গুঁড়া চুণ	১.২৫০	২.৫০০	৩.৭৫০
৫) কাঠের বা তুষের টাটকা ছাই	১.২৫০	২.৫০০	৩.৭৫০

বীজ বোনা বা চারা রোয়ার অন্তত একমাস আগে চুণ বা চুণজাতীয় পদার্থ জমি তৈরির সময় সমানভাবে মাঠে ছড়িয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

'পি.এইচ' অনুযায়ী অম্লত্ব সংশোধন

মাটির পি.এইচ বাড়িয়ে ৬.৫ করার জন্য চুনাপাথর প্রয়োগের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)

পি.এইচ	বেলে দোআঁশ	দোআঁশ	এঁটেল দোআঁশ
৫.০	১,২০০	১,৮৮৯.৪	২,৯৪০
৫.২	১,০৯২	১,৬৩৭.৪	২,৫৪৮
৫.৪	৯২৪	১,৩৮৫.৪	২,১৫৬
৫.৬	৭৫৬	১,১৩৩.৪	১,৭৬৪
৫.৮	৫৮৮	৮৮১.৪	১,৩৭২
৬.০	৪২০	৬২৯.৪	৯৮০
৬.২	২৫২	৩৭৭.৪	৫৮৮

বিভিন্ন জেলায় অম্লজমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টরে)

জেলা	এলাকা (মিলিয়ন হেক্টর)	মাটির চরিত্র
বাঁকুড়া	০.১৩৪	ল্যাটেরাইট
বীরভূম	০.০৮৬	ঐ
বর্ধমান	০.৬২০	ল্যাটেরাইট ও অ্যালুভিয়াম
কোচবিহার	০.১১৫	তরাই ও তরাই অ্যালুভিয়াম
দার্জিলিং	০.২৩৫	বাদামি বনের মাটি ও তরাই
জলপাইগুড়ি	০.৩৬৯	তরাই ও বনাঞ্চলের মাটি

মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম)	০.৩০৬	ল্যাটেরাইট/লাল কাঁকুরে
পুরুলিয়া	০.২০০	পাথরনুড়ি মাটি
পশ্চিম দিনাজপুর	০.০২৬	বিন্ধ্য-অ্যালুভিয়াম
মোট	২.০৯১	

[সূত্র : FAI (EF) : Symposium on Increasing Productivity of Acid Soils in the Eastern Region, 1979]

নোনা মাটির পরিচর্যা : ভারতে প্রায় ৭০ লক্ষ হেক্টর জমির মাটি নোনা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৮.৫ লক্ষ হেক্টর এ ধরনের জমি আছে। সাধারণত সমুদ্রের উপকূলেই এ ধরনের মাটি রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং সমস্ত সুন্দরবন জুড়ে নোনা মাটি রয়েছে বিস্তর। সুন্দরবনে মোট ৭৯১ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে। এর মাত্র ২৫৬ হাজার হেক্টরে চাষ হয়। নোনা মাটির সুবিন্যস্ত কোনও স্তর থাকে না বললেই হয়। ফলে নুন চুঁইয়ে নীচে নামতে পারে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলের স্তর খুব কাছে থাকায় নুন চুঁইয়ে নীচে নামতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলের সঙ্গে যে নুন মাটিতে মেশে, তা মাটিতে থেকেই যায়। ফলে মাটিতে লবণের অংশ কমে না, বরং বাড়ে। এই সব মাটিতে সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট জাতীয় নুনের ভাগই বেশি থাকে। তাছাড়া ক্যালসিয়ামও থাকে প্রচুর।

সমুদ্র বা নদীর নোনা জল ঢুকে নোনার অংশ বাড়ানো ছাড়াও জল চুঁইয়ে যাওয়ায় নোনার ভাগ বেশি হয়। এইসব এলাকায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। প্রায় ১৭০০ মিলিমিটারের মত।

সমস্যা ঃ

(১) খরিফ মরশুমে মাটির উপর গভীর জল জমে যাওয়া এবং তার ফলে প্রধান ফসল ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

(২) অন্যদিকে শীত ও গ্রীষ্মকালে মাটির নীচে জলের স্তরে যে নুন থাকে তা বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মাটির উপর উঠে আসে।

(৩) জল নিকাশের ব্যবস্থার অভাব।

(৪) ভাল মানের জলের অভাব, যা শীত বা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করা যাবে।

পরিচর্যা :

(ক) **জল নিকাশ :** নোনা মাটিতে নদী, খাল ও খানাখন্দ বেশি থাকায় জলনিকাশের ব্যবস্থা করা কঠিন। পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, খোলা নালার ব্যবস্থা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ৪০ মিটার পরপর এই ধরনের নালা তৈরি করা কার্যকরী। নালার গভীরতা হবে এক থেকে দেড় মিটার। দেখতে হবে জ্যামিতির ট্রাপেজয়েডের মত। যার পার্শ্ব ঢাল হবে ১ঃ১ এবং ভূমি ঢাল হবে ০.১ শতক।

(খ) **বাড়তি জলের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার ঃ** নোনা ডাঙায় সাধারণত অফুরন্ত বৃষ্টি হলেও শীত বা গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি খুব কম হয়। বর্ষার নদী ও সাগরের নোনা জল যাতে জমিতে ঢুকতে না পারে, তার জন্য বাঁধ দিয়ে গর্তে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। রবি মরশুমে সংরক্ষিত জল থেকে তুলা, যব, কুসুম, গম, লঙ্কা ইত্যাদি ফসলের চাষ করা চলে।

(গ) **জমির নীচের জল পরীক্ষা ও তার ব্যবহার ঃ** এসব এলাকার নলকূপের জলের নমুনা পরীক্ষা করে চাষে প্রয়োগ করার পক্ষে উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে। মোট ৪৫টি মৌজার ১০৭টি জায়গা থেকে জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা গেছে, অধিকাংশ নলকূপের

জলই চাষের পক্ষে বিপদমুক্ত। এ ধরনের পরীক্ষার সুযোগ আরও বাড়াতে হবে। তাহলেই জলের সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে।

মাটির উপরের আবরণ : বাষ্পীভবনের ফলে মাটির নীচের নুন জলের সাথে উপরে উঠে আসে। কেন্দ্রীয় নোনা মাটি গবেষণা সংস্থার ক্যানিং কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খরিফ মরশুমে ফসল কাটার পর যদি মাটির সঙ্গে তুষ মিশিয়ে মাটিতে ঢেকে দেওয়া হয়, তবে পরের শীতে বা গ্রীষ্মকালে নোনার আধিক্য অনেকটা কমে যায়। ফলে পরের বছর ধানের ফলনও বাড়ে।

শস্য পরিচর্যা :

(ক) **শস্যের সঠিক জাত নির্বাচন :** নোনা সহনশীল সঠিক জাত সম্বন্ধে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে যবের জাত ডি. এল-১১৫, বি. এইচ-১২; ধানের জাত—আই. আর ৩৬, আই. আর ৪-১১, আর ১০৫-২, এস. আর ২৬বি, মাতলা, হ্যামিলটন এবং দামোদর; সূর্যমুখীর জাত-ই. সি ৬৮৪৩, ই. সি. ৬৮১৫; তিসির জাত এল. এস-২ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) **নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার :** ৩৬%-৭৫% বিয়ান ছাড়ার সময় এবং বাকিটা ফুল আসার সময় নোনা এলাকার ধান চাষে চাপান সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(গ) **ফসল লাগানোর সময় :** ফসলের বৃদ্ধির বেশির ভাগ সময়ে যেন ভাল জল পায়। সেইভাবে পরিকল্পনা করে ফসল লাগাতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি ধান লাগানোর পক্ষে ভাল সময়।

ক্ষার জমির পরিচর্যা : এইসব জমিতে প্রচুর পরিমাণ বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম ধাতু থাকে, যা অধিকাংশ শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং দ্রবণীয় লবণ প্রায় থাকে না বললে চলে।

এছাড়া, যে সব জমিতে প্রচুর পরিমাণ বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম ধাতু ও দ্রবণীয় লবণ দুই থাকে এবং অধিকাংশ ফসলের পক্ষেই তা প্রতিকুল, তাকে লবণাক্ত ক্ষার জমি বলে।

ক্ষার জমিতে সারের ব্যবহার : মাটির অনেক গভীরতা পর্যন্ত এইসব জমিতে বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম ধাতু থাকে বলে মাটির রং কালো হয় এবং জমির আকৃতি ও গঠন খুব শক্ত হয়। ফসলের শিকড় তাই সহজে খাদ্যগ্রহন করতে পারে না। জমির পি. এইচ খুব বেশি হয়। সাধারণত ৬-৮.৫ পি. এইচ পর্যন্ত মাটিকে কৃষির জন্য স্বাভাবিক ধরা হয়।

এইসব জমিতে ফসল চাষের একমাস আগে নির্দিষ্ট মাত্রায় গুঁড়ো জিপসাম ব্যবহার করে মাটি শোধন করা দরকার। তারপর সুষম সার ব্যবহার করলে ভাল ফল আশা করা যাবে। তার আগে নয়। বিভিন্ন গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেছে, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জমির পি.এইচ কমিয়ে দিয়ে জমিকে নিরপেক্ষ অবস্থার মধ্যে আনতে সাহায্য করে। তবে ইউরিয়া সারের স্বাভাবিক মাত্রা প্রয়োগে ক্ষার জমিতে কোন কুফল দেখা যায়নি। চাষের যথেষ্ট আগে (১-১.৫ মাস) জমিতে ধৈঞ্চা ইত্যাদি বুনে ও পরে ভাল করে চাষ দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিন এবং তারপর উপযুক্ত ফসলের চাষ করুন।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ৩ ❐ মাটির উৎপাদিকা শক্তি

(১) উৎপাদিকা শক্তি বলতে কী বোঝায় ?

যে কোনও ধরনের মাটির ফসল উৎপাদনের ক্ষমতাকে সেই মাটির উৎপাদিকা শক্তি বলা হয়। এই শক্তি অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে যার মধ্যে আছে জলসেচ, জলনিষ্কাশন, ফসল চাষের অনুকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু, মাটির উর্বরতা প্রভৃতি। তবে মাটির উৎপাদিকা শক্তি সর্বোপরি মাটির উর্বরচার ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে মাটি উর্বর হলেই সবসময় যে ভালো ফসল ফলবে, তাও নয়।

(২) মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে তফাৎ কোথায় ?

বিভিন্ন ফসলের চাষে গাছকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে এবং সুনির্দিষ্ট হারে খাদ্যউপাদান সরবরাহ করার নিজস্ব সহজাত ক্ষমতাকে মাটির উর্বরতা বলে অভিহিত করা হয়। এই উর্বরতার সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সমন্বয়ে মাটির ফসল উৎপাদনের সামগ্রিক ক্ষমতাকে বলা হয় মাটির উৎপাদিকা শক্তি।

আগেই বলা হয়েছে, মাটি উর্বর হলেই সবসময় ভালো ফসল ফলে না। আবার মাটি উর্বর না হলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি থাকে না।

মাটির উর্বরতা শক্তি দু'ধরনের হয়। এক, মাটির জন্মগত সহজাত বা অন্তর্নিহিত উর্বরতা। দুই, বাইরে থেকে সারের মাধ্যমে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদান মাটিতে প্রয়োগ করে অর্জিত উর্বরতা। মাটির উর্বরতার মতো উৎপাদিকা শক্তির ভাগ হয় না। এই শক্তির একটাই ধরন।

মাটির উর্বরতা উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর না করলেও, উৎপাদিকা শক্তি মাটির উর্বরতার উপর নির্ভরশীল।

(৩) মাটির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি কি সম্ভব ?

হ্যাঁ, মাটির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটা সম্ভব বলেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফসলের গড় উৎপাদন বেড়ে চলেছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর সাহায্য করছে এই উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিতে।

- **মাটির উর্বরতার শ্রেণিবিভাগ** (Classification of soil fertility) : মাটির উর্বরতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

(ক) **সহজাত বা অন্তর্নিহিত উর্বরতা** (Natural fertility) :জমিতে কোনও প্রকার উদ্ভিদখাদ্য বাইরে থেকে প্রয়োগ না করলেও মাটির যে উর্বরতা বজায় থাকে, তাকে **সহজাত** বা **অন্তর্নিহিত উর্বরতা** বলা হয়। এটি জমির **জন্মগত** ক্ষমতা। বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্যোপাদনের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম শস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলনের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের স্বাভাবিক শতকরা পরিমাণ নীচে দেওয়া হল।

নাইট্রোজেন (N) : ০.০১-০.০৫
ফসফরাস (P_2O_5) : ০.০৬-০.২০
পটাশিয়াম (K_2O) : ০.০৭-১.০

পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শতকরা ০.০৩ ভাগ (মেদিনীপুরের ল্যাটেরাইট মাটিতে) থেকে ০.১১ ভাগ (জলপাইগুড়ি জেলার মাটিতে) নাইট্রোজেন, ০.০৩-০.৩ ভাগ ফসফরাস ও ০.৪-০.৫ ভাগ পটাশিয়াম থাকে। সহজাত উর্বরতার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে।

খ. অর্জিত উর্বরতা (Acquired fertility) :বিভিন্ন প্রকারের সার প্রয়োগ, জলসেচ, কর্ষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ফলে মাটির যে উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, তাকে **অর্জিত উর্বরতা** বলা হয়। সহজাত

উর্বরতার মতো অর্জিত উর্বরতারও একটি সীমা (Limiting factor) আছে। সুতরাং বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগ করলেও ফলন খুব বেশি বাড়ে না। সেজন্যে মাটিতে উপস্থিত উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগ করা দরকার।

মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি সাধন (Conservation and improvement of soil fertility) :

মাটির উর্বরতা রক্ষা করা কৃষকের কাছে একটি প্রধান সমস্যা। মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে হলে মাটি থেকে উদ্ভিদখাদ্যের অপচয় বন্ধ ও মাটিতে উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে হলে নীচের বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যথা :

ক. জমির উপযুক্ত ব্যবহার (Proper use of Land)

জমির প্রকৃতি অনুযায়ী শস্য চাষ করতে হবে। কারণ, যে কোনও জমিতে যে কোনও ফসল চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায় না। কোন জমিতে কী ফসল চাষ করতে হবে তা অভিজ্ঞতালব্ধ বিবেচনার সঙ্গে ঠিক করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বালি মাটিতে আমন ধান চাষ করলে আমন ধান ভালো হয় না, কিন্তু মাটির ক্ষয়ীভবন দ্বারা মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যে মাটির ক্ষয়ীভবন বন্ধ করার জন্যে যে সব কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা জমির উপযুক্ত ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়। ঢালু জমিতে ঢালের আড়াআড়ি সারিতে ও পাহাড়ী অঞ্চলে সিঁড়ি বাঁধ দ্বারা ধাপে ধাপে শস্য চাষ করতে হবে। তাছাড়া যে সকল শস্যে অধিক জলসেচনের প্রয়োজন হয়, সে সব শস্য ঢালু জমিতে চাষ করা চলবে না।

- **জমির উর্বরা শক্তি ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে পার্থক্য** (Difference between Soil Fertility and Soil Productivity) :

উর্বরতা শক্তি (Soil Fertility)	**উৎপাদিকা শক্তি** (Soil Productivity)
(১) মাটির উপযুক্ত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট অনুপাতে বিষাক্ত দ্রব্যমুক্ত উদ্ভিদ-খাদ্য সরবরাহ করার জন্মগত ক্ষমতাকে **মাটির উর্বরতা** বলে।	(১) মাটির ফসল উৎপাদনের ক্ষমতাকেই সে মাটির উৎপাদিকা শক্তি বলে।
(২) মাটির উর্বরতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : স্বাভাবিক উর্বরতা ও অর্জিত উর্বরতা।	(২) মাটির উৎপাদিকা শক্তির কোনও ভাগ নেই।
(৩) মাটির উর্বরতা উৎপাদিকা শক্তির ওপর নির্ভরশীল নহে।	(৩) মাটির উৎপাদিকা শক্তি প্রধানত উর্বরতা শক্তির ওপর নির্ভরশীল।
(৪) মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনমত সার প্রয়োগ করে মাটির অর্জিত উর্বরতা বাড়ান যায়।	(৪) ফসল উৎপাদনের অন্যান্য অবস্থা অনুকূল হলে জমির উর্বরতা বাড়লে উৎপাদিকা শক্তিও বাড়ে।
(৫) মাটির উর্বরতা শক্তি কতিপয় বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যথা : মাটির পি. এইচ, ক্লে-কলয়েডের প্রভাব, উপকারী জীবাণুর কার্যকারিতা প্রভৃতি।	(৫) মাটির উৎপাদিকা শক্তি উর্বরতার ইতরবিশেষ ও ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন।
(৬) কোনও এক বিশেষ শস্যের ক্ষেত্রে একই জমি উর্বর নাও হতে পারে।	(৬) ভিন্ন ভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে একই জমির উৎপাদিকা শক্তি ভিন্ন রূপ হয়।
(৭) সব উর্বরমাটি উৎপাদক নাও হতে পারে।	(৭) সব উৎপাদক মাটি উর্বর হবেই।

খ. উত্তম কর্ষণ (Good tillage)

মাটিকে ফসল উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় আনতে হলে, উত্তম কর্ষণের প্রয়োজন। জমি কর্ষণ করলে আগাছা ও শস্যের অবশেষ মাটি চাপা পড়ে জৈব সারে পরিণত হয়। ফলে মাটিতে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এটি মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

গ. শস্য পর্যায় (Crop Rotation)

প্রতি বছর একই জমিতে একই শস্য চাষ করলে, উক্ত জমি থেকে বিশেষ উদ্ভিদ খাদ্য মাটির একটি স্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ ভিন্ন ভিন্ন শস্যের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যোপাদানের প্রয়োজন। কোনও জমিতে প্রতি বছর ধান চাষ করলে জমির একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকে নির্দিষ্ট খাদ্যোপাদান নিঃশেষ হয়ে যায়। সেজন্য ধান চাষের আগে ধান জমিতে সবুজ সারের উদ্ভিদের চাষ করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে হলে প্রতি বছর কোনও জমিতে একই শস্যের চাষ না করে, ঋতুভেদে বিভিন্ন শস্যের চাষ করা উচিত। এই পদ্ধতিকে শস্য পর্যায় বলে।

ঘ. **আগাছা দমন** (Control of weeds) :

জমিতে আগাছা জন্মালে আগাছাগুলো মাটি থেকে উদ্ভিদখাদ্য শোষন করে মাটিকে অনুর্বর করে দেয়। সাধারণত শস্য আগাছার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না। সেজন্যে জমির উর্বরতা রক্ষা করতে হলে জমিতে যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে বা আগাছা জন্মালেও যাতে প্রথম অবস্থায় দমন করা যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

ঙ. **মাটিতে উপযুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা** (Good aeration)

উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মাটিতে উপযুক্ত জল ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। কারণ, মাটিতে জল জমে থাকলে সুষ্ঠুভাবে বাতাস চলাচল না হওয়ার ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়।

চ. **সবুজ সারের শস্যের চাষ** (Cultivation of green manuring crops)

সবুজ সারের মধ্যে শিম্বিগোত্রীয় (যেমন : শন, ধৈঞ্চা, বরবটি, কলাই, মটর, লুসার্ণ, বারসীম ইত্যাদি) ও অশিম্বিগোত্রীয় (যেমন : যব, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি) শস্যের চাষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে মাটির উর্বরতা বাড়ে। এসব গাছগুলো মাটির নীচের স্তরের উদ্ভিদখাদ্য শোষণ করে নিজেদের দেহে জমায় ও গাছগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দিলে জৈব পদার্থ ও উদ্ভিদখাদ্য মাটিতে ফেরত আসে এবং তার ফলে মাটির উর্বরতা বাড়ে।

ছ. **আচ্ছাদন শস্যের চাষ** (Cultivation of cover crops)

কতিপয় শস্য যেমন, বরবটি, মিষ্টি আলু ইত্যাদি চাষ করলে মাটির ওপর একটি আচ্ছাদনের সৃষ্টি হয়। আচ্ছাদন শস্যের চাষ করলে ভূমিক্ষয় ও নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে উদ্ভিদখাদ্য নষ্ট হতে পারে না। এর ফলে মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়।

জ. **জৈব সার প্রয়োগ** (Application of manures)

জীবজাত সারকে **জৈব সার** বলে। মাটিতে উদ্ভিজ্জ জৈব সার (যথা : খোল, আবর্জনা সার, পাতা পচা সার ইত্যাদি) ও প্রাণীজ জৈব সার (যথা : গোবর, গোমূত্র, হাড়গুঁড়া ইত্যাদি) প্রয়োগ করলে উদ্ভিদ তার সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান পেয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ফসল চাষে জীবাণুসার (Bio-fertilizer) প্রয়োগ করতে হবে।

ঝ. **অজৈব সার প্রয়োগ** (Application of fertilizers)

জৈব সারে উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ কম থাকে। সেজন্যে উদ্ভিদের চাহিদা মেটাবার জন্যে মাটিতে অজৈব বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে মাটির উর্বরতা বাড়ে না। তবে এই সারের মাধ্যমে উদ্ভিদের চাহিদা মেটানো যায়। অবশ্য জৈব চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যাবে না।

ঞ. **মটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ** (Maintenance of optimum moisture in the soil)

উদ্ভিদের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে আর্দ্রতা থাকা দরকার। মাটিতে জলের পরিমাণ কম বা বেশি হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাছাড়া মাটিতে অধিক পরিমাণে জল থাকলে উদ্ভিদখাদ্য নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায় ও মাটির উর্বরতা কমে যায়। সুতরাং, মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে হলে জমি থেকে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জল বের করে দেওয়া একান্ত দরকার।

ট. **মাটির ক্ষয় নিবারণ** (Control of soil erosion)

কতিপয় উদ্ভিদখাদ্য যথা, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মাটির উপরিস্তরে জমা থাকে। সুতরাং, কোন কারণে মাটির উপরিস্তর ক্ষয় হলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। সেজন্যে জমির উপরিস্তর যাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঠ. **মাটি শোধন** (Soil reclamation)

মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ওপর উর্বরতা শক্তি নির্ভর করে। অধিক অম্ল ও অধিক ক্ষার মাটিতে কোন ফসলই ভালোভাবে উৎপন্ন হতে পারে না। এছাড়া এই সব মাটিতে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান থাকা সত্ত্বেও তা উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। সেজন্য মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সংশোধনের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

ড. **রোগ-পোকা দমন** (Control of insects pests and diseases)

রোগ-পোকা লাগলে ফসল অকালে নষ্ট হয়ে যায়। ফসল মাটি থেকে খাদ্যোপাদান শোষণ করে দেহগঠন করে। মাটির খাদ্যোপাদানের অপচয় হয়। অথচ জমি থেকে কোনও ফসল পাওয়া যায় না। সুতরাং, রোগ-পোকার আক্রমণে পরোক্ষভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। সেজন্যে রোগ-পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- **জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির উপায় :** (Ways to improve soil fertility)

জমির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্যে নানান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। জমির উর্বরতা সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি করার জন্যে সার প্রয়োগ করা দরকার। সার দু'রকমের, যথা : জৈব সার ও অজৈব বা রাসায়নিক সার। জীবজাত সারকে জৈব সার বলে। জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি হয়। এর ফলে হালকা মাটি ঠাসা হয় এবং এই মাটির জল ও উদ্ভিদ খাদ্যধারণের ক্ষমতা বাড়ে। অপর পক্ষে ভারী মাটি নরম, সচ্ছিদ্র ও সরস হয়। জৈব সার মাটির উপকারী জীবাণুদের কার্যকলাপ ও বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়া এই সার ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান ও হরমোন জাতীয় পদার্থ সরবরাহ করে। জৈব সার পচে হিউমাস গঠন করে এবং এটি কলয়েড অবস্থায় খুবই সক্রিয়। হিউমাস কণা মাটির দ্রবণীয় খাদ্যের উপাদানগুলোর বিনিময় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ফলে খাদ্যগুলো গাছের গ্রহণযোগ্য হয় এবং প্রাকৃতিক কারণে অপচয় হতে পারে না। সেজন্যে জৈব সার যেমন আবর্জনা সার, খামারের সার, খোল, মুরগীর সার (Poultry manure), সবুজসার ইত্যাদি মাটিতে প্রয়োগ করা দরকার।

জৈব সারে উদ্ভিদখাদ্য কম পরিমাণে থাকে। সেজন্যে জৈব সার প্রয়োগের পর শস্যের চাহিদা অনুযায়ী ঘাটতি উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানগুলো অজৈব বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে পূরণ করা যায়। অজৈব সার প্রয়োগে সাময়িক ভাবে ও অস্থায়ীভাবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মাটি পরীক্ষা করে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা দরকার। এতে সার প্রয়োগের খরচা কমে ও বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগের জন্যে মাটির প্রতিক্রিয়া রোধ হয়। ফসফরাস ও পটাশিয়াম ঘটিত সার পুরোটাই এবং এক-চতুর্থাংশ নাইট্রোজেন জমি তৈরির শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি নাইট্রোজেন দু-তিন বারে চাপান হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অনেক সময় ইউরিয়া জলে গুলে পাতায় স্প্রে করে প্রয়োগ করা হয়। এতে সারের পরিমাণ কম লাগে এবং সারের অপচয়ও কম হয়। এছাড়া মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে ইউরিয়া জলে গুলে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে জমির উর্বরতা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায় না। তবে এই সার প্রয়োগের ফলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশ মাটিতে পড়ে পচে জৈব সারে পরিণত হয়। এর ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ৪ ❐ বিভিন্ন ধরনের শস্য ও ফসল

গঠন

৪.১ কৃষিজ ফসলের ব্যবহারিক শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন ফসল চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া

৪.২ ব্যবহারের ভিত্তিতে উদ্যানজাত ফসলের শ্রেণীবিভাগ

৪.১ কৃষিজ ফসলের ব্যবহারিক শ্রেণীবিভাগ এবং বিভিন্ন ফসল চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া

ফসলের শ্রেণীবিভাগ একজন কৃষকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই শ্রেণীবিভাগ একজন কৃষককে তার জমির অবস্থান, জলসেচের সুযোগ, জমির উৎপাদিকা শক্তি এবং বাজারের অবস্থান অনুযায়ী কোন ফসল উৎপন্ন করবে তা জানতে, বুঝতে ও ঠিক করতে সাহায্য করে। বিভিনন ফসলকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে পারি—

১। সব ফসলকে দুটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়। যথা শস্যবিজ্ঞান এবং উদ্যান বিভাগ।

২। উদ্ভিদবিদ্যাগত ভাবে শ্রেণীবিভাগ। যেমন—পোয়েসি (ধান, গম, ভুট্টা), প্যাপিলিওনেসি (ছোলা, মুগ, কলাই, সোয়াবীন, বাদাম, ধঞ্চে), ক্রুসিফেরি (সরিষা, মুলো, ফুলকপি, বাঁধাকপি), কিউকারবিটেসি (কুমড়ো জাতীয় ফসল), মালভেসি (তুতো, ঢেঁড়শ), সোলানেসি (আলু, টম্যাটো, তামাক, বেগুন, লংকা), টিলিয়েসি (পাট) ইত্যাদি।

৩। বাণিজ্যিক শ্রেণীবিভাগ। যেমন—খাদ্য শস্য, গো খাদ্য, অর্থকরী ফসল ইত্যাদি।

৪। মরশুম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ। যেমন—**খরিফ ফসল** (ধান, কলাই, ভুট্টা, মুগ, বাদাম, পাট, জোয়ার, বাজরা, তরমুজ ইত্যাদি), **রবি ফসল** (গম, আলু, মুসুরি, ছোলা, সরিষা, মটর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, তিসি, বারসীম ইত্যাদি), **প্রাক-খরিফ** বা গ্রীষ্ম কালীন ফসল (মুগ, কলাই, বাদাম, তিল ইত্যাদি)।

৫। কৃষিবিদ্যাগত ভাবে শ্রেণীবিভাগ। চাষবাসের পদ্ধতি অনুযায়ী ফসলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— ** উঁচু জমির ফসল (অড়হর, তুলো, ভুট্টা, তিল, নেপিয়ার ঘাস, দীননাথ ঘাস ইত্যাদি), মাঝারি জমির ফসল (পাট, ছোলা, আলু, আখ, কলাই, সরিষা, ধান, গম ইত্যাদি), নীচু জমির ফসল (ধান, পাট, ধঞ্চে ইত্যাদি) ** হালকা মাটির ফসল (আলু, পেঁয়াজ, গাজর, মিষ্টি আলু, সুর্যমুখী, মুলো ইত্যাদি), মাঝারি মাটির ফসল (পাট, ছোলা, আখ, মটর, ভুট্টা, অড়হর, তুলো, বারসীম, সরিষা, লুসার্ণ, তামাক ইত্যাদি), ভারী মাটির ফসল (ধান, গম, বার্লি, তিসি, মুসুরি ইত্যাদি) ** অম্ল মাটির ফসল (রোয়া ধান, আলু, সরিষা ইত্যাদি), নোনা মাটির ফসল (লংকা, কুমড়ো জাতীয় ফসল, তিল, গম, বাজরা ইত্যাদি), ক্ষার মাটির ফসল (বার্লি, বারসীম, তুলো, বাদাম, ছোলা, ভুট্টা, মটর ইত্যাদি) ** অগভীর শিকড়যুক্ত ফসল (ধান, সরিষা, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি), মাঝারি গভীর শিকড়যুক্ত ফসল (গম, তামাক, বাদাম, ছোলা ইত্যাদি), গভীর শিকড়যুক্ত ফসল (ভুট্টা, তুলো, মিষ্টি আলু, আখ, অড়হর ইত্যাদি) ** সেচসেবিত ফসল (বোরো ধান, গম ইত্যাদি), বৃষ্টিনির্ভর ফসল (পাট, তুলো, ভুট্টা, বরবটি,

উঁচু জমির ধান ইত্যাদি), বৃষ্টিনির্ভর কিন্তু আংশিক সেচসেবিত ফসল (ছোলা, জোয়ার, বাজরা, সরিষা ইত্যাদি) ** বোনা ফসল (উঁচু জমির ধান, গম, সরিষা, ভুট্টা, পেঁয়াজ, জোয়ার, বাজরা, বাদাম ইত্যাদি), বপন করা ফসল (আলু, আখ, মিষ্টিআলু ইত্যাদি), রোপন করা ফসল (রোঁয়া ধান, ফুলকপি, পেঁয়াজ, বেগুন, ইত্যাদি)

৬। বিশেষ উদ্দেশ্যে ফসলের শ্রেণীবিভাগ। যেমন—পায়রা ফসল (খেসারী, সরিষা), জমি আচ্ছাদনকারী ফসল (খেসারী, বাদাম, কলাই, মিষ্টি আলু), অর্থকরী ফসল (পাট, আলু, তুলো, আখ), সাথী ফসল, সবুজ সার ফসল (ধঞ্চে, সুবাবুল, শণ, গ্লাইরিসিডিয়া), শীতকালীন ফসল (কপি জাতীয় ফসল), মুড়ি ফসল (আখ) ইত্যাদি।

৭। স্থায়িত্বকালভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ। যেমন—একবর্ষজীবী ফসল (ধান, সরিষা, গম, ভুট্টা, মুগ), দ্বিবর্ষজীবী ফসল (মুলো, বাঁধাকপি, গাজর), বহুবর্ষজীবী ফসল (আখ, রসুন, পেঁয়াজ, আদা)।

৮। ফসলের ব্যবহারিক শ্রেণীবিভাগ।

(১) তন্ডুল বা দানা শস্য (২) মিলেট জাতীয় শস্য (ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, রাগি, যব, ওট, চিনা, কাউন ইত্যাদি) (৩) ডাল জাতীয় শস্য (৪) তেল জাতীয় শস্য (৫) তন্তু জাতীয় শস্য (৬) চিনি বা শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় শস্য (৭) কন্দ জাতীয় শস্য (৮) গোখাদ্য বা পশুখাদ্য শস্য (বারসীম, লুসার্ন, নেপিয়ার ঘাস, গিনি ঘাস, সুদান ঘাস) (৯) শাক-সবজী জাতীয় শস্য (১০) নেশা বা মাদকদ্রব্য জাতীয় শস্য (তামাক, চা, কফি) (১১) ফল ও বাগিটা জাতীয় শস্য (১২) ফুল জাতীয় শস্য (১৩) আচার ও মশলা জাতীয় শস্য (লংকা, আদা, হলুদ, জিরা, মেথি, রসুন, পেঁয়াজ, এলাচ, চারচিনি ইত্যাদি) (১৪) ওষধি শস্য (১৫) রং জাতীয় শস্য (নীল) ইত্যাদি।

তন্ডুল বা দানাজাতীয় শস্য চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং সময় :

তন্ডুলশস্যের ইংরেজি নাম Cereals, যার উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Ciris অর্থাৎ শস্যের দেবী থেকে। ঘাসজাতীয় ফসল হলো তন্ডুলশস্য। কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। কার্বহাইড্রেট দেহের শক্তি উৎপাদনে বিশেষ কাজে লাগে। ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, রাগি প্রভৃতি হলো তন্ডুল জাতীয় ফসল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়েকটি তন্ডুলশস্য ঃ ধান, গম, ভুট্টা

ধান ঃ

ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল এবং প্রধান খাদ্য। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাতীয় নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ধানের চাষ হয়ে থাকে।

ধানের প্রকার ঃ বছরে তিনবার ধান চাষ করা যায়। এক এক সময়ের ধানকে এক এক নামে অভিহিত করা হয়—আউশ, আমন, বোরো। আউশ ধানের জীবনকাল উত্তরবঙ্গে ফাল্গুন থেকে শ্রাবন এবং দক্ষিণবঙ্গে বৈশাখ থেকে আশ্বিন। আমন ধানের জীবনকাল জ্যৈষ্ট থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত এবং বোরোধানের জীবনকাল অঘ্রান থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত।

জলবায়ু ঃ ধান উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। বেশি তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাযুক্ত এবং বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধান ভালো জন্মে। ১০০-২০০ সেমি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধানচাষ করা যায়। ধানের জীবনকালে ২১-৩৫ ডিগ্রি সেন্টগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন। ধানের বৃদ্ধির জন্য বড়ো দিন ও উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন।

মাটি ঃ ভালো জলধারন ক্ষমতাযুক্ত প্রায় সকল প্রকার মাটিতে ধানচাষ করা যায়। পলি দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে ধান ভালো জন্মে। আবার অধিক অম্ল বা ক্ষার মাটি বা কাঁকুড়ে মাটিতে ধান ভালো হয় না। বেলে দো-আঁশ মাটিতে জৈবসার প্রয়োগে ধান চাষ করা যায়। ধানচাষের উপযোগী মাটির পি.এইচ ৫-৬.৭।

জমি নির্বাচন ঃ প্রাক-খরিফ বা আউশ-উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি আউশ ধান চাষের উপযুক্ত। খরিফ বা আমন-বেলে দো-আঁশ থেকে এঁটেল মাটিযুক্ত উঁচু, মাঝারি বা নীচু অবস্থানের যে কোনো জমি আমন ধান চাষের উপযুক্ত। গ্রীষ্মকালীন বা বোরো-মাঝারি ও নীচু অবস্থানের সেচযুক্ত বেলে দো-আঁশ থেকে এঁটেল মাটি উপযুক্ত।

যদিও প্রাক-খরিফ বা খরিফ মরশুমে প্রধানত বৃষ্টিনির্ভর ধানচাষ হয়, তবু প্রয়োজনে সেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা করতে পারলে ফলন বেশী পাওয়া যাবে।

গম ঃ

পশ্চিমবঙ্গে তন্ডুলশস্য হিসাবে ধানের পরেই গমের স্থান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গম চাষ এলাকা ও উৎপাদনশীলতায় ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর কারন হলো পশ্চিমবঙ্গে শীতের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। অথচ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী জাতের ওপর আমরা নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে উন্নত মানের বীজ, সুষম সার ও সেচের যোগান ঠিকমত হচ্ছে না। আবার গম কাটার মরশুমে দক্ষিনবঙ্গে কালবৈশাখী ও উত্তরবঙ্গে আগাম বৃষ্টির জন্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় গমের ফলন বৃদ্ধির জন্য এরাজ্যের উপযোগী প্রযুক্তিতে চাষ করা প্রয়োজন।

গমচাষের মূলকথা ঃ

১। কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলভিত্তিক সঠিক জাত নির্বাচন

২। শংশিত বীজ ব্যবহার

৩। সঠিক সময়ে গম বীজ সারিতে বোনা কারণ পশ্চিমবঙ্গে শীত স্বল্পমেয়াদী

৪। একক এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ রাখা

৫। বীজের হার ও বোনার গভীরতা ঠিক রাখা

৬। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ

৭। মাটিতে অনুখাদ্যের অভাব থাকলে তা মেটাতে সঠিক মাত্রায় ও সময়ে প্রয়োগ

৮। সঠিক সময়ে পরিমাণ মত সেচ প্রয়োগ

৯। সঠিক সময়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ

১০। প্রয়োজনভিত্তিক শস্য-সুরক্ষা

১১। সঠিক সময়ে ফসল কাটা ও ঝাড়াই/মাড়াই করে ভালোভাবে শুকিয়ে গুদামজাত করা।

আবহাওয়া ও মাটি ঃ লম্বা শীতকাল ও শুষ্ক আবহাওয়ায় গমের বাড়বৃদ্ধি ও ফলন ভালো হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকলে গমের অঙ্কুরোদগ্ম ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাপমাত্রা ২০-২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস গম বোনার পক্ষে আদর্শ। ১৬-১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গমের পাশকাঠি ছাড়তে সাহায্য করে এবং তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে হলেই গমের বাড়বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে ফুল আসতে শুরু করে। ২০-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গম পাকতে সাহায্য করে। ফুল আসার সময়ে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশী থাকলে এবং আবহাওয়া মেঘলা হলে গমের ক্ষেতে নানারকম রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বৃষ্টিও গমের পক্ষে ক্ষতিকর। এমনকি মেঘলা আবহাওয়া অথবা বৃষ্টি গমের বৃদ্ধির সময় দেখা গেলে রোগের প্রকোপ ছড়াতে সাহায্য করে।

দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে ভালোভাবেই গম চাষ করা যায়। তবে জলসেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালো থাকা দরকার। রাজ্যের উত্তরবঙ্গে ও অন্যান্য এলাকার অম্ল মাটিতে গমের ভালো ফলন পেতে হলে মাটি অবশ্য পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং পরীক্ষাগারের সুপারিশমতো চুন বা ডলোমাইট গম বোনার একমাস আগে চাষ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চুন বা ডলোমাইট দেবার একমাসের মধ্যে ঐ জমিতে কোন রাসায়নিক সার দেওয়া যাবে না।

বোনার সময় ঃ কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বোনার সঠিক সময়। নাবি হিসাবে অগ্রহায়নের মাঝামাঝি থেকে পৌষ মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত (ডিসেম্বরের প্রথম তিন সপ্তাহ) বীজ বোনা যাবে। তখন আলাদা জাত নির্বাচন ও বীজের হার বৃদ্ধি দরকার। যদি ডিসেম্বরের পরে বীজ বোনা হয় তাহলে প্রতিদিন দেরীর জন্য গমের ফলন ১% করে কমে যাবে।

ভুট্টা ঃ

দানাশস্য হিসাবে ভুট্টার স্থান ধান এবং গমের পরেই। ভুট্টার ওপর বিভিন্ন ক্ষেত্রের মাত্রারিক্ত চাহিদা ভুট্টা চাষকে চাষীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলছে। আমাদের দেশে ভুট্টা মানুষের খাদ্য হিসাবে ২৫% (পপকর্ন, বেবীকর্ন, কর্নফ্লেকস এবং কাঁচা ভুট্টা পুড়িয়ে খাওয়া), প্রানীখাদ্য হিসাবে ১২% পোল্ট্রী খাদ্য হিসাবে ৪৯%, শিল্পে ১২% এবং পানীয় ও বীজ হিসাবে ২% ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পরিবেশের পরিবর্তন কৃষির ওপর প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। শীতের সময়কাল কমছে। যার ফলে বেশ কয়েকবছর ধরে গম চাষে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ব্যহত হচ্ছে। এরাজ্যের চাষীরা গম চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে। আবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃষ্টিপাত কমে এসেছে ও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের পরিমান দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সেচের জল মহার্ঘ্য হচ্ছে। ফলে বোরোধান চাষে জল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই গম ও বোরোধানের বিকল্প হিসাবে এ রাজ্যে ভুট্টাচাষের সুযোগ বাড়ছে। ভুট্টার খাদ্যগুন অপরিসীম। ধান ও গমের তুলনায় ভুট্টার পুষ্টিমূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী। ভুট্টা কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন ও কিছু প্রয়োজনীয় ভিটামিনের আধার। উন্নয়নশীল দেশগুলির কোটি কোটি মানুষ ভুট্টা থেকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ক্যালরি সংগ্রহ করেন। আমাদের রাজ্যেও পাহাড়ী ও লাল কাঁকুড়ে মাটি অঞ্চলের আদিবাসীরা দীর্ঘদিন থেকে ভুট্টাকে তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রেখেছেন। বিজ্ঞানীদের গবেষনায় অধুনা উদ্ভাবিত কোয়ালিটি প্রোটিন মেইজ (QPM) বা অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ ভুট্টা খাদ্যগুনের দিক থেকে সাধারন ভুট্টার চেয়ে অনেক বেশী।

বোনার সময় ঃ শস্য বৈচিত্রকরনে রবিশস্য হিসাবে ভুট্টা আদর্শ ফসল। প্রাক-খরিফ ও খরিফ খন্দেও ভুট্টা চাষ করা যায়। ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৫ ডিগ্রী সেনটিগ্রেড তাপমাত্রায় ভালোভাবে ভুট্টা চাষ করা সম্ভব। বস্তুতপক্ষে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস বাদ দিয়ে যে কোনো সময়ে জমির অবস্থানের ওপর নির্ভর করে সারা বছরেই ভুট্টা লাগানো যায়। যদিও বিভিন্ন মরশুমে ভুট্টা বোনার আদর্শ সময় নিম্নে দেওয়া হলো—

(১) প্রাক-খরিফ ঃ ফাল্গুন মাস (ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত)

(২) খরিফ ঃ আষাঢ় মাস (জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত)

(৩) রবি ঃ কার্তিক মাস (অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত)

মাটি ঃ ভুট্টা চাষ বেলে থেকে এঁটেল মাটি—সকল ধরনের মাটিতেই করা যায়। উর্ব্বর দো-আঁশ মাটি

ভুট্টা চাষের পক্ষে সবথেকে উপযুক্ত। জলনিকাশী ব্যবস্থাহীন নিচু জমি ভুট্টা চাষের অনুপযুক্ত। মাটির পি.এইচ ৫.৫-৭.৫ এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

তন্তু জাতীয় শস্য চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং সময় ঃ

পাট ঃ উষ্ণ আবহাওয়া, উর্বর পলিমাটি, মাটিতে যথেষ্ট রস এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাট চাষের উপযোগী। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ৫৪-৯৭% ও তাপমাত্রা ১৭-৪১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পাটগাছের বৃদ্ধির সহায়ক। তবে ৬৫-৮৫% আর্দ্রতা, ৩২-৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ২৫০-২০০০ মিমি বৃষ্টিপাত যা ৭০ দিন ব্যাপৃত, পাটগাছের বৃদ্ধি ও আঁশ উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

প্রায় সব রকম জমিতে পাট চাষ করা যায়। দো-আঁশ মাটি বিশেষতঃ পলি দো-আঁশ মাটিই ভালো। তিতা ও মিঠা পাট চারা অবস্থায় মাটিতে জল দাড়ানো সহ্য করতে পারে না। কিন্তু একটু বল হলে তিতা পাট কিছুটা দাড়ানো জল সহ্য করতে পারে, মিঠা পাট সাধারণতঃ তা পারে না।

বোনার সময় ঃ ফাল্গুনের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাট বোনা যায়।

তুলো ঃ বেশী গভীরতার মাটিতে তুলো চাষ ভালো হয়। জলনিকাশী ব্যবস্থা থাকা দরকার। তুলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। বৃদ্ধিকালে ২৭-৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। তুলো লোনা সহ্য করতে পারে এবং মাটির পি.এইচ ৫-৭.৫ এর মধ্যে থাকলে ভালো। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় রবি মরশুমে সেচবিহীন স্থানে তুলোর চাষ হয়। অন্যান্য এলাকায় বর্ষায় তুলোর চাষ হয়।

কন্দ জাতীয় শস্য চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং সময় ঃ

আলু ঃ আলুর ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সঠিক জমি নির্বাচন করা ভীষণ জরুরি। জলা জমি ও এঁটেল মাটিযুক্ত জমি ছাড়া সেচ ও জলনিকাশী সুবিধাযুক্ত অন্যান্য উঁচু জমিতে আলুর চাষ করা চলে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী-আগাছামুক্ত, মাঝারি উঁচু এবং উর্বর বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি আলু চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। আলু চাষের জন্য জমির পি এইচ এর মান ৬.৫-৭.৫ হলে ভালো হয়।

আলু লাগানোর সময়—(১) জলদি আলু-আশ্বিনের শেষ থেকে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত (অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত) (২) মাঝারি আলু—কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত (নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত) (৩) নাবি আলু—অগ্রহায়ন মাসের শেষ পর্যন্ত (নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। সাধারণভাবে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝির পর আলু লাগালে গাছ অনেক বেশী রোগপোকা সংবেদনশীল হয় ও ফলন কমে যায়।

চিনি বা শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় শস্য চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং সময় ঃ

আখ ঃ চিনি ও গুড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে আখ একটি প্রধানতম ফসল। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম প্রধান আর্থিক ফসল। তাই আখ চাষ করলে আখেরে লাভ-ই হয়। সব রকম প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য করেও আখ বেড়ে উঠতে পারে।

সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা আছে এমন উঁচু ও মাঝারি জমিতেই আখ চাষ ভালো হয়। জমির অম্লতা ৫.৮-৬.০ হলে ভালো হয়। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত দুটো মরশুমে বা বছরে দুবার আখ বসানো হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ন (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে বা হেমন্তকালীন আখ চাষ এবং ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) মাসে বা বসন্তকালীন আখ চাষ।

এছাড়াও আখ বসানো নির্ভর করে বিভিন্ন জাতের সময়কাল অনুযায়ী কিন্তু সব জাতের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির জন্য গড়ে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১২৫ সেমি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। ফসল পাকার জন্য প্রয়োজন হয় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা।

তৈলবীজ জাতীয় শস্য ঃ

কৃষি অর্থনীতিতে দানা শস্যের পরেই তৈলবীজের স্থান। শরীরের প্রয়োজনীয় ফ্যাট তৈল থেকে পাওয়া যায়। প্রতিদিন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মাথাপিছু প্রায় ৩৫ গ্রাম তৈলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পর অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে খোল পাওয়া যায় তা পশুখাদ্য এবং জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তৈলবীজের এলাকা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়েকটি তৈলবীজ শস্য ঃ

রবি তৈলবীজ ঃ সরিষা, তিসি, সূর্যমুখী, তিল

খরিফ তৈলবীজ ঃ বাদাম, তিল

প্রাক খরিফ তৈলবীজ ঃ তিল, বাদাম

তৈলবীজশস্য চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং সময় ঃ

সরিষা ঃ মূলত তিন প্রকারের সরিষার চাষ হয়। (১) টোরি সরিষা (২) শ্বেতসরিষা (৩) রাই সরিষা।

(১) টোরি সরিষা ঃ জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত, বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি টোরি সরষের চাষের পক্ষে উপযুক্ত। আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনতে হবে।

(২) শ্বেত সরিষা ঃ জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত, বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি শ্বেত সরষের চাষের পক্ষে উপযুক্ত। কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। এরপর বুনলে ফলন কমে যায়।

(৩) রাই সরিষা ঃ জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত, বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি রাই সরষের চাষের পক্ষে উপযুক্ত। কার্তিকের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। তবে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহেও প্রয়োজনবোধে বোনা যেতে পারে।

তিল ঃ জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত, বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি তিল চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বৎসরে তিনবার তিল চাষ করা যায়—প্রাক খরিফ (ফাল্গুন-চৈত্র), খরিফ (জৈষ্ঠ-আষাঢ়), প্রাক রবি (ভাদ্র-আশ্বিন)।

চিনাবাদাম ঃ জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত, বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি বাদাম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বাদাম চাষ বৎসরে ২ বার করা হয়। প্রাক খরিফ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও খরিফ (জ্যৈষ্ট-আষাঢ়)।

সূর্যমুখী ঃ সব ধরনের মাটিতে সূর্যমুখী চাষ করা যায়। তবে জল নিকাশী ব্যবস্থা থাকা চাই। সূর্যমুখী জল দাড়ানো একদম সহ্য করতে পারে না। মাটির পি.এইচ ৬-৬.৫ হলে ভালো হয়। সূর্যমুখী লবনাক্ত মাটিতেও ভালো হয়, তবে জমিতে বেশী লবন থাকলে বীজের গজা কম বের হয়। অগ্রহায়ন-পৌষ মাস (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) বীজ বোনা হয়।

তিসি ঃ জল দাঁড়ায় না এমন যে কোনো রকম জমিতে তিসির চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি এই ফসলের পক্ষে উপযুক্ত। পুরো কার্তিক মাসেই তিসি বোনা যেতে পারে।

ডালশস্য ঃ

ডালশস্য চাষ কেন করব ?

১। ডাল থেকে সবচেয়ে বেশী উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পাওয়া যায়। ডালশস্যে ১৮-২৫% প্রোটিন আছে।

২। ডালশস্যের মধ্যে এমন কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যা তন্ডুলশস্যের মধ্যে থাকে না।

৩। ডালশস্য শ্বিজাতীয় উদ্ভিদ হবার জন্য এদের গাছের শিকড়ে থাকা রাইজোবিয়াম জীবানু বাতাসের নাইট্রোজেন ধরে গাছকে সরবরাহ করে, তাই ডালশস্য চাষে নাইট্রোজেন কম লাগে। আবার ডালশস্য চাষ করার পরবর্তী ফসল চাষে নাইট্রোজেন সর কম দিতে হয়। ডালশস্য চাষের মাধ্যমে একর প্রতি ১২-১৫ কেজি নাইট্রোজেন বা ৩০ কেজি ইউরিয়া মাটিতে যুক্ত হয়। এজন্য শস্যপর্যায়ে বা ফসলচক্রে একটি ডাল জাতীয় ফসল রাখা উচিত।

৪। ডালশস্যের চাহিদা এবং উৎপাদনের ফারাক বেশী। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়াতে হলে ডালশস্যের এলাকা বাড়াতে হবে এবং বিঘাপ্রতি উৎপাদন বাড়াতে হবে।

৫। অন্যান্য ফসল চাষের চেয়ে ডালশস্য চাষের খরচ অনেক কম এবং লাভ বেশী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়েকটি ডালশস্য ঃ

রবি ডালশস্য - মুসুরি, ছোলা, মটর, খেসারি, অড়হর, সয়াবীন

খরিফ ডালশস্য - কলাই, মুগ, অড়হর, সয়াবীন

প্রাক খরিফ ডালশস্য - মুগ, কলাই

ডালশস্য চাষের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং সময় ঃ

মুগ ঃ জল দাঁড়ায় না এমন দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি অধিক উপযোগী। বেশী লোনা মাটিতে চাষ করা যাবে না। মাঝারি লোনা সহনশীল। মুগ বছরে ২ বার চাষ করা যায়। ফাল্গুন-চৈত্র এবং ভাদ্র মাসে।

কলাই ঃ দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি অধিক উপযোগী। কলাই বছরে ২ বার চাষ করা যায়। ফাল্গুন-চৈত্র এবং ভাদ্র মাসে।

অড়হড় ঃ হাল্কা ও মাঝারি মাটিতে ভালো হয়। তবে সব ধরনের মাটিতে অড়হড়ের চাষ করা যায়। অড়হড় বছরে ২ বার চাষ করা যায়। জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং আশ্বিন মাসে।

সয়াবীন ঃ জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত দো-আঁশ এবং এঁটেল দো-আঁশ মাটি অধিক উপযোগী। সয়াবীন বছরে ২ বার চাষ করা যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং অগ্রহায়ন মাসে।

মুসুরি ঃ দো-আঁশ মাটিতে সবচেয়ে ভালো হয়। কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়নের মাঝামাঝি পর্যন্ত চাষ করা যায়।

খেসারী ঃ সব রকম জমিতে চাষ করা যায়, তবে নিচু অবস্থানের এঁটেল মাটিতে ভালো হয়। লোনাও সহ্য করতে পারে। পয়রা ফসল হিসাবে আমন ধান কাটার কয়েকদিন আগে জমিতে ছিটিয়ে বোনা হয়। কার্তিক মাসে বীজ বপন করা হয়।

ছোলা ঃ জল দাঁড়ায় না এমন দো-আঁশ এবং বেলে দো-আঁশ মাটি অধিক উপযোগী। অগ্রহায়ন মাসে বীজ বপন করা হয়।

মটর ঃ পলি দো-আঁশ মাটি বেশী উপযোগী। যদিও সব মাটিতে কম বেশী ভালো হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে বীজ বোনা হয়।

৪.২ ব্যবহারের ভিত্তিতে উদ্যানজাত ফসলের শ্রেনীবিভাগ

উদ্যানজাত ফসল—হার্টিকালচার একটি ল্যাটিন শব্দ। যার অভিধানিক অর্থ বাগানে চাষ। হর্টিকালচার কৃষি বিজ্ঞানের একটি শাখা। কৃষি বিজ্ঞানের যে শাখায় একটি নির্দিষ্ট ঘেরাদেওয়া জমিতে ফুল, ফল, সবজি ইত্যাদি চাষ করা হয়, উৎপন্ন ফসলের প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হয় তাকে হর্টিকালচার বলে। সমগ্র হর্টিকালচারের বিষয়গুলিকে দুটি শাখায় ভাগ করা যায়। প্রধান শাখা ও অপ্রধান শাখা। প্রধান শাখার বিষয় হল—(১) সবজি (২) ফুল (৩) ফল (৪) সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং অপ্রধান শাখার ফসল হল—(৫) মশলা (৬) ঔষধি ফসল (৭) বাগিচা ফসল (৮) বন।

(১) সব্‌জি—সব্‌জি চাষ উদ্যানবিভাগের একটি প্রধান শাখা। বিভিন্ন প্রকার সব্‌জির উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করণ এশাখার বিষয়। আমাদের মত উন্নয়ণশীল দেশে খাদ্যতালিকায় অন্যতম প্রধান উপাদান হল সব্‌জি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক খাদ্য তালিকায় ৩২৫ গ্রাম সব্‌জি প্রয়োজন। তার মধ্যে সবুজ সব্‌জি প্রয়োজন ১২৫ গ্রাম। সব্‌জি শ্বেতসার, ভিটামিন, খনিজ-লবন ইত্যাদি খাদ্য উপাদানের উৎস। নানা ভাবে সব্‌জির শ্রেনী বিভাগ করা হয়। যথা—

- বোটানিকাল শ্রেনীবিভাগ (ফ্যামিলীর নাম অনুসারে)
- চাষের ঋতু অনুযায়ী (শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন ও বর্ষাকালীন)
- সব্‌জির ব্যবহৃত অংশের নাম অনুসারে (পাতাসব্‌জি, ফলসব্‌জি, ফুলসব্‌জি ইত্যাদি)
- সব্‌জি চাষের পরিচর্য্যাগত রীতি অনুযায়ী।

কিন্তু সব্‌জির সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেনীবিভাগটি হল নিম্নরূপ—

(ক) কুষ্মান্ড গোত্রীয় সব্‌জি—লাউ, কুমড়া, চাল-কুমড়া, শশা, তরমুজ, খরমুজ, উচ্ছে, পটল, ঝিঙে, ধুঁধুঁল, চিচিঙ্গা ইত্যাদি।

(খ) কোল-ক্রপস্ বা কপিজাতীয় সব্‌জি—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ব্রোকলি, মূলা, গাজর, শালগম, ইত্যাদি।

(গ) ফলজাতীয় সব্‌জি—বেগুন, লংকা, টমাটো, ক্যাপসিকাম, ঢেড়স/ভেন্ডি ইত্যাদি।

(ঘ) মূলজাতীয় সব্‌জি—মিষ্টি-আলু, খাম-আলু, ওলকচু, মানকচু, গাঁটিকচু ইত্যাদি।

(ঙ) কন্দজাতীয় সব্‌জি—পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

(চ) সীম ও শুঁটিজাতীয় সব্‌জি—সীম, থোকাসীম, বীন্‌স, বরবটি, সয়াবিন, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

(ছ) স্যালাড ও শাকজাতীয় সব্‌জি—লেটুস, পালংশাক, পুঁইশাক, লালশাক, সবুজনটে ইত্যাদি।

(২) ফুল ও বাহারী গাছ—ফুল হল সৌন্দর্য্য, ভালবাসা ও শান্তির প্রতীক। গাছের বংশবৃদ্ধিতে, বীজ উৎপাদনে ফুল মুখ্য ভুমিকা পালন করে। পূজা-পার্বন, উৎসব-অনুষ্ঠান, সৌন্দর্য্যায়নে ফুল ও বাহারী গাছের ব্যাপক ব্যবহার সুবিদিত। ফুল ও রং বাহারী গাছকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়।

(ক) বৃক্ষ—যেসব বহুবর্ষজীবী গাছের কাষ্ঠল দীর্ঘ-মোটা গুড়ি থাকে তাকে বৃক্ষ বলে। শীতল ঠআবহাওয়ার ফুল বৃক্ষ হল—রোডোডেনড্রন, পাইন, ক্যামেলিয়া, ম্যাগলিয়া, বটলব্রাশ ইত্যাদি। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার ফুল বৃক্ষ হল—কদম, শিমূল, পলাশ, জারুল, অশোক, চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, বকুল ছাতিম ইত্যাদি।

(খ) গুল্ম—যেসকল গাছের সুনির্দিষ্ট কাষ্ঠল গুড়ি থাকে না, অল্প উচ্চতার ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট গাছ তাকে গুল্ম বলে। যেমন—গোলাপ, জবা, জুঁই, গন্ধরাজ, রঙ্গন, হাসনুহানা, কামিনী, শিউলি, টগর, ইত্যাদি।

(গ) বীরুৎ—যে সমস্ত গাছের কোনরূপ কাষ্ঠল গুড়ি থাকে না, কেবল মাত্র নরম রসাল কান্ড থাকে, একবর্ষজীবি বা একঋতুজীবি তাদেরকে বীরুৎ বলে। যেমন—শীতকালিন বীরুৎ হল পপি, ভারবেনা, স্টক, ডায়ানথাস, প্যানজি, পীটুনিয়া, কারনেশন, কসমস, এসটার ইত্যাদি। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার বীরুৎ—গোলাপ, গাঁদা, গ্লাডিওলাস, দোপাটি, মোরগঝুটি, বোরোক্যালেনডুলা, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

(ঘ) কন্দ জাতীয় ফুল—যে সমস্ত ফুল কন্দ থেকে গাছ বেরিয়ে উৎপন্ন হয় তাদেরকে কন্দ জাতীয় ফুল বলে। যেমন—লিলি, টিউলিপ, ড্যাফোডিল, ডালিয়া, গ্ল্যাডিয়োলাস, এ্যামারিলিস, কলা ফুল, রজনীগন্ধা, পদ্ম, শালুক।

(ঙ) লতা জাতীয়—যে সমস্ত গাছ অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে বড় হয় তাদেরকে লতা জাতীয় গাছ বলে। যেমন—অপরাজিতা, মাধবীলতা, হংসলতা, বগনভেলিয়া, লতাকলকে।

(৩) ফল—ফল হল বীজের আধার। ফুলের স্ত্রী অংশের ডীম্বানুর সঙ্গে পুরুষ অঙ্গের শুক্রানুর মিলনে বীজ এবং পরিপক্ক ডিম্বাশয় বা ওভারী থেকে ফুলের সাহায্যকারী অংশ নিয়ে বা সাহায্যকারী অংশ না নিয়ে ফল গঠিত হয়। ফল হল পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান, যথা—ভিটামিন, প্রোটিন, খনিজ লবন ইত্যাদির সুলভ উৎস। ফল প্রধানত দু প্রকার। যথা—একক ফল ও যৌগিক ফল। একক ফল দু ধরনের যথা নিরস ফল ও সরস ফল। নিরস ফল যথা নারকেল, সুপারি। সরল ফল—যথা আম, জাম, আপেল, বাতাবি ইত্যাদি। যৌগিক ফলের উদাহরণ—কাঁঠাল, আতা, আনারস ইত্যাদি। কৃষি জলবায়ুর ভিত্তিতে ফলকে তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়।

(অ) শীতল অঞ্চলের ফল—আপেল, আখরোট, পিয়ার, পিচ, কাঠবাদাম, স্ট্রবেরী, কমলালেবু ইত্যাদি।

(আ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফল—আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা, পেপে, বেল, পেয়ারা ইত্যাদি।

(ই) উষ্ণ অঞ্চলের ফল—তরমুজ, খরমুজ, বেদানা, সফেদা, আতা, কাজুবাদাম, নারিকেল, তাল, খেজুর ইত্যাদি।

(৪) সংরক্ষন ও প্রক্রিয়াকরণ—বিভিন্ন ফল ও সব্জি উৎপন্ন হওয়ার মরসুমে একসঙ্গে প্রচুর পরিমানে বাজারে আমদানি হলে দাম কমে যায়। সংরক্ষণের অভাবে পচে নষ্ট হয়। তাই প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ফল ও সব্জি সংরক্ষণের। সংরক্ষণের জন্য ফল ও সব্জি প্রথমে পরিষ্কার করে, বিভিন্ন জীবাণু নাশক ও স্বাদ বর্দ্ধক পদার্থ যুক্ত করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মূল্যযুক্ত খাদ্যে পরিনত করা হয়। সকল সংরক্ষিত খাদ্য বস্তুকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—তরল আকার, ঘন আকার (সেমি সলিড), কঠিন আকার।

তরল আকার—তরল আকার বিভিন্ন রকম হয়।

(ক) জুস (ফলের রস ফুটিয়ে ছেঁকে জীবাণু-নাশক ও স্বাদবর্ধক যুক্ত করে)—উদাহরণ লেমন জুস, আমের জুস ইত্যাদি।

(খ) স্কশ (জুসের সঙ্গে শাঁস)—উদাহরণ লেমন স্কশ, অরেঞ্জ স্কশ, ম্যাঙ্গো স্কশ ইত্যাদি।

(গ) ভিনিগার (ফলের রস জীবাণুর ক্রিয়ায় অ্যাসিটিক অ্যাসিড)—আপেল ভিনিগার, আঙ্গুর ভিনিগার, অরেঞ্জ ভিনিগার ইত্যাদি।

ঘন আকার (সেমি সলিড)—ঘন আকার (সেমি সলিড) বিভিন্ন রকম হয়।

(ক) কেচাপ/আচার—উদাহরণ আমের আচার, লংকার আচার, মিশ্র আচার ইত্যাদি।

(খ) জেলি—আপেল জেলি, আমের জেলি ইত্যাদি।

কঠিন আকারের উদাহরণ—(ক) তাল মিশ্রী (খ) আলুর চিপ্স ইত্যাদি।

(৫) মশলাপাতি—মশলাপাতি হল বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের অংশবিশেষ যথা—মূল, কান্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি যাহা প্রধান খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও উৎকর্ষতা বাড়াতে ব্যবহৃত হয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ মশলাপাতির দেশ হিসাবে সু-পরিচিত। ভাস্কো-দা-গামার সময় থেকে বিভিন্ন মশলা বিদেশে রপ্তানি হয়ে আসছে। বর্তমানে মশলা রপ্তানি করে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। খাদ্যের উৎকর্ষতা বাড়ানো ছাড়াও অনেক মশলা এ্যালোপ্যাথী ঔষধ, হোমিওপ্যাথী ঔষধ, আয়ুরবেদিক ঔষদ ও প্রসাদনী দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। গাছের অংশ বিশেষ ব্যবহারের ভিত্তিতে মশলাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়।

(ক) ফুল—লবঙ্গ, জাফরান।

(খ) ফল—এলাচ, লংকা, গোলমরিচ।

(গ) বীজ—ধনে, জিরা, কালোজিরা, মৌরী, মেথী।

(ঘ) গাছের ছাল/বাকল—দারুচিনি।

(ঙ) পাতা—তেজপাতা, কারীপাতা।

(চ) মৃদগত কান্ড—আদা, হলুদ।

(ছ) কন্দ—পিয়াজ, রসুন।

(৬) ঔষধি গাছ—যে সকল গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত করা হয় তাকে ঔষধি গাছ বলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতবর্ষ ঔষধি গাছে সমৃদ্ধশালী এবং তার প্রভাবেই রচিত হচ্ছে 'মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থ। মানুষ্য জাতির উনোষ-র সঙ্গে সঙ্গে গাছ গাছড়ার ব্যবহারের মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল ঔষধি গাছের লালন পালন। ঋকবেদ, অথর্ববেদ (৪৫০০-১৫০০ বিসি) আমরা বিভিন্ন ঔষধি গাছের বর্ণনা ও ব্যবহার পাই। চরক সংহিতা (১০০০ বিসি) ৩৪০ রকম ভেষজ গাছের ব্যবহারের কথা বলা আছে। এ অধিকাংশ বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত হয়। আজ পর্যন্ত খুব অল্পপরিমান ফসল হিসাবে মানুষ চাষ করে। মনুষ্য রোগ নিরাময়ে আজ পর্যন্ত প্রায় ২০০০ মত ড্রাগ আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে ১৫০০ ড্রাগ গাছ থেকে তৈরী হয়। বাকীটা প্রানী ও খনিজ থেকে তৈরী করা হয়। ভারতবর্ষে ভেষজ চিকিৎসা ও ফার্মাসিউটিকাল শিল্পে উন্নতির প্রভূত সুযোগ আছে। গাছের অংশবিশেষ ব্যবহারের ভিত্তিতে শ্রেনীবিভাগ দেখানো হল এবং গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি গাছের নাম উল্লেখিত হল।

গাছের অংশবিশেষ ব্যবহারের ভিত্তিতে কয়েকটি ঔষধি গাছের নাম, উপক্ষার ও তার ব্যবহার।

ব্যবহৃত অংশ	ঔষধি গাছ	ঔষধ/উপক্ষার	ব্যবহার
(ক) মূল	সর্পগন্ধা	রেসারপিন	উচ্চরক্তচাপের ঔষধ
(খ) মূল ও পাতা	তামাক	নিকোটিন	মাদক দ্রব্য
(গ) মূল ও পাতা	বেলেডোনা	অ্যাট্রোপিন	রক্তচাপ বৃদ্ধি, স্নায়ু উজ্জীবিত
(ঘ) পাতা ও ফল	ধুতরো	ডাটুরিন	হাঁপানির ঔষধ
(ঙ) ফল	আফিং	মরফিন	ব্যথা-বেদনা উপশমকারী
(চ) বীজ	কফি	ক্যাফিন	ব্যথা-বেদনা উপশমকারী
(ছ) বীজ	নাক্সভোমিকা	স্ট্রিকনিন	পেটের পীড়া উপশমকারী
(জ) গাছের ছাল	সিঙ্কোনা	কুইনাইন	ম্যালেরিয়ার ঔষধ
(ঝ) গাছের পাতা, ফল, ছাল	নিমগাছ	অ্যাজাডাইরেক্টিন	চর্মরোগ নাশক, কীটনাশক

(৭) বাগিচা ফসল—যে সকল দীর্ঘজীবী ফসল বাগিচা ঘেরা এলাকায় বা একটি নির্দিষ্ট মৃত্তিকা ও জলবায়ু অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ করে দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে বাগিচা ফসল বলে। বাগিচা ফসল একবার লাগিয়ে তত্ত্বাবধান করলে দীর্ঘদিন যাবৎ ফলন পাওয়া যায়। ফসল সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণ করার পরেই ব্যবহারের উপযোগী হয়। বাগিচা ফসলজাত দ্রব্যের চাহিদা দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ব্যাপক রয়েছে। ভারতে গুরুত্বপূর্ণ বাগিচা ফসল হল—

(ক) পাতা জাতীয় বাগিচা ফসল—চা, পান।

(খ) ফল জাতীয় বাগিচা ফসল—নারকেল, সুপারী, কাজুবাদাম, কফি, কোকো।

(গ) তরুক্ষীর জাতীয় বাগিচা ফসল—রবার।

পশ্চিমবঙ্গের বাগিচা ফসলগুলি হল—**(ক) ছোটবাগানে**—নারকেল, সুপারী, পান চাষ। **(খ) বড় বাগিচায়**—চা, কাজু চাষ।

বাগিচা ফসলের প্রাথমিক পর্বে যখন গাছগুলি ছোট থাকে, ফলন পাওয়া যায় না, তখন বাগিচা ফসলের মধ্যে সাথী ফসল হিসাবে নানা রকম শাক-সব্জি, মশলাপাতি ইত্যাদির চাষ করা হয়।

(৮) বন— বন প্রতিশব্দ ফরেস্ট্রি, কথাটি এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। যার অভিধানিক মানে—সীমানা বা গ্রামের বাইরে যেসকল গাছপালা লাগানো হয় তাকে বন বা ফরেস্ট্রি বলে। বন দুই প্রকার—

(ক) প্রাকৃতিক বন/জঙ্গল—অ-কৃষি জমিতে প্রাকৃতিক ভাবে জন্মায়।

(খ) সামাজিক বন—প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে, মনুষ্য উদ্যোগে, রাস্তার পাশে, পতিত জমিতে সৃষ্ট বন।

যেকোন দেশের সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য সেই দেশের ভূখণ্ডের এক তৃতীয়াংশ/৩৩% বন-ভূমি থাকা বঞ্ছনীয়। ভারতে প্রায় ২২% এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫% বন-ভূমি আছে। এই ঘাটতি পূরনের লক্ষ্যে সৃষ্ট হয়েছে সামাজিক বন সৃজন প্রকল্প এবং বন-মহোৎসব। মানুষের মধ্যে বন সৃজনে, বন রক্ষার্থে, সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর জুলাই মাসের ১ম সপ্তাহ বন-সৃজন সপ্তাহ হিসাবে পালন করা হয়।

বন সৃজনের গুরুত্ব ঃ (ক) বৃষ্টি হতে সাহায্য করে (খ) বন্য প্রাণীর আশ্রয়স্থল (গ) দূষিত বায়ু পরিশোধন করে (ঘ) প্রকৃতিকে ঠান্ডা রাখে (চ) রাস্তায় ছায়া প্রদান করে ও সৌন্দর্য্য বাড়ায় (ছ) মানুষকে ফল, ফুল, বনজ খাদ্য, আসবাবপত্র তৈরীর কাঠ, ঔষধি উপকরণ, মশলাপাতি ইত্যাদি প্রদান করে। (জ) পশুখাদ্য দেয়। (ঝ) এককথায় সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে।

কৃষিজ জলবায়ু অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত বনজ গাছপালা দেখা যায়।

(ক) হিমালয়ের শীতল অঞ্চল— উচ্চপাহাড়ে—পাইন, ফার, স্প্রুস, রোডোডেনড্রন। নিম্ন উচ্চতায়—শাল, সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি।

(খ) তরাই অঞ্চলে—শাল, সেগুন, মেহগনি, শিশু, সিরিস, ইউক্যালিপটাস, অজুন, দেবদারু, ইত্যাদি।

(গ) গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল—বাবলা, নিম, ছাতিম, কদম, সোনাঝুরি, আকাশনিম, গুলমোহর, জারুল ইত্যাদি।

(ঘ) পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল— শাল, সেগুন, শিমূল, পলাশ, মহূয়া, অর্জুন ইত্যাদি।

(ঙ) সুন্দরবন অঞ্চল—সুন্দরী, গরান, গেওয়া, বানী, হেতাল ইত্যাদি।

উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জলবায়ু ও মৃত্তিকা

কৃষিজলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুসারে সারা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়—

(১) শীতল জলবায়ু অঞ্চল।

(২) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল।

(৩) উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল।

(১) শীতল জলবায়ু অঞ্চল—শীতল জলবায়ু অঞ্চলের অর্ন্তগত হল জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহারের হিমালয় সংলগ্ন অংশ, পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি বাদে দার্জিলিং জিলা, সিকিম ও অরুনাচল প্রদেশ।

এই অঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়। গাছের পাতা ঝরে ড়ে এবং গাছ বিশ্রমারত অবস্থায় থাকে। এই অঞ্চলের হর্টিকালচার ফসল তীব্রশীত ও তুষারপাত সহ্য করতে পারে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত (২৫০০-৩০০০ মি.মি.) ও তীব্রশীতে তুষারপাত এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চড়াই-উৎরাই, পাথুরে জমি, ধাপে ধাপে চাষ। মাটির গভীরতা কম, অম্ল-মাটি। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া আরামদায়ক, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

ফসল—ফলের মধ্যে আপেল, আখরোট, পিয়ার, পিচ, কাঠবাদাম স্ট্রবেরী ইত্যাদি জন্মায়। দার্জিলিং-এর কমলালেবু বড় এলাচ এবং আদা বিখ্যাত। ফুলের মধ্যে পপি, ভারবেনা, স্টক, ডায়ানথাস, প্যানজি, পীটুনিয়া, কারনেশন, কসমস, এসটার ইত্যাদি। গাছের মধ্যে রোডোডেনড্রন, পাইন, ক্যামেলিয়া, ম্যাগনেলিয়া ইত্যাদি। কম উচ্চতার পাহাড়ে প্রচুর বনজ গাছ জন্মায়। সব রকম কোল-ক্রপস্ বা কপিজাতীয়-সব্জি—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ব্রোকলি, মূলা, গাজর, শালগম, ইত্যাদি ভাল হয় এবং এদের বীজও ভাল উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের নিম্ন উচ্চতায় চা ভাল জন্মায়।

(২) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল—উত্তর পশ্চিমাংশের মধ্যে পড়ে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, চন্ডীগড়, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর পূর্বাংশের মধ্যে পড়ে বিহার, দার্জিলিং বাদে উত্তরবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়,

মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড। হিমালয় থেকে উৎপন্ন সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী ও তাদের শাখানদী, উপনদী বাহিত বালি ও পরিমাটি দ্বারা গঠিত ঢালু অঞ্চল।

পাহাড়ের পাদদেশীয় জলবায়ু বিরাজমান। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (২০০০-২৫০০ মি.মি.)। উষ্ণ-আদ্র জলবায়ু, উত্তর পশ্চিমাংশের তুলনায় উত্তর পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত, আদ্রতা বেশী এবং উষ্ণতা কম। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৩০-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। মাটির গভীরতা বেশী, বেলে-দোঁয়াশ থেকে পলি-দোঁয়াশ। মাটির পি.এইচ প্রশম থেকে সামান্য আম্লিক। জমির ঢাল পাহাড় থেকে সমুদ্রের (উত্তর-দক্ষিণ) দিকে।

ফসল—ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা পেপে, পেয়ারা, লেবু, বাতাবীলেবু ইত্যাদি জন্মায়। ঋতুভেদে সব রকমের সব্‌জি—কোল-ক্রপস্ বা শীতকালীন কপিজাতীয়-সব্‌জি, কুষ্মান্ডগোত্রীয় সব্‌জি ইত্যাদির ফলন ভাল হয়। মশলাবাতির মধ্যে আদা, হলুদ, ধনে, কালোজিরে, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদির ফলন ভাল। বাগিচা ফসলের মধ্যে সুপারি, রবার উৎপন্ন হয়। ফুলের মধ্যে সব রকমের পুল কম-বেশি হয়।

(৩) উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল—রাজস্থান, সমগ্র দক্ষিণ ভারত, মধ্যভারতে মালভূমি অঞ্চল, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের লালমাটির রাঢ়অঞ্চল, দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসহ সমগ্র দক্ষিনবঙ্গ এই অঞ্চলের অর্ন্তগত।

উষ্ণতা বেশী, গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৩৫-৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে শীতরে স্থায়ীত্ব কম, বায়ুতে আদ্রতা বেশী, বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০০ মি.মি.। মালভূমি অঞ্চলে তাপমাত্রা একটু বেশী, বৃষ্টিপাত কম (গড় ১০০০ মি.মি.), মাটি অনুর্বর। ভিতরের সমভূমির গড় বৃষ্টিপাত ১৫০০-২০০০ মি.মি., মাটির গভীরতা বেশী, উর্বর বেলে-দোঁয়াশ থেকে পলি-দোঁয়াশ ও কাঁদামাটি। মাটির পি.এইচ প্রশম থেকে সামান্য ক্ষারীয়/লবনাক্ত।

ফসল—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রায় সব ফসলই এই অঞ্চলে জন্মাতে পারে। ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা পেপে, পেয়ারা, লেবু, বাতাবীলেবু ইত্যাদি ছাড়াও নারকেল, সফেদা, আতা, বেদানা, তরমুজ ইত্যাদি জন্মায়। ঋতুভেদে সব রকমের সব্‌জি—কোল-ক্রপস্ বা শীতকালীন কপি-সব্‌জি, কুষ্মান্ডগোত্রীয় সব্‌জি ইত্যাদির ফলন ভাল হয়। বাগিচা ফসলের মধ্যে পান, সুপারি, কাজুবাদাম উৎপন্ন হয়। ফুলের মধ্যে সব রকমের ফুল কম-বেশি হয়। সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে সুন্দরী, গরান, গেওয়া, বানী, হেতাল ইত্যাদি ভাল হয়।

অনেক উদ্যানজাত ফসল একাধিক জলবায়ু অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায় জন্মাতে পারে। যেমন শীতল জলবায়ু অঞ্চলের কপিজাতীয় সব্‌জি ও বীরুৎ জাতীয় ফুল, নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ অঞ্চলে শীতকালে ভালই জন্মায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক ফল উষ্ণ অঞ্চলে ভালই জন্মায়।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ৫ ❐ জৈব ও জীবাণু সারের সাহায্যে ফসল চাষ পদ্ধতি

গঠন

৫.১ গম চাষ
৫.২ প্রধান প্রধান সবজির উন্নত চাষ পদ্ধতি
৫.৩ প্রধান প্রধান ফলের উন্নত চাষ পদ্ধতি

৫.১ গম চাষ

খাদ্যশস্য হিসাবে গম এর গুরুত্ব ধানের পরেই। শহর ও শহরতলীর পাশাপাশি গ্রাম বাংলাতেও গমের চাহিদা বেড়েছে। চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে উৎপাদন না হওয়ায় অন্য রাজ্য থেকে ব্যাপক পরিমাণে গম ও আটা আমদানী করা হচ্ছে। অথচ, গম উৎপাদনের তুলনামূলক খরচ অনেক কম। গম যেহেতু শীতকালীন ফসল, তাই বোরোধানের বিকল্প হিসাবেই গমচাষ করা উচিৎ। আপাত দৃষ্টিতে বোরোধান চাষ লাভজনক মনে হলেও, খরচ ও আয়ের তুলনামূলক হিসাব করলে দেখা যায়, মাঝারি উচ্চতার স্বল্প সেচের সুবিধাযুক্ত জমিতে গমচাষ অধিক লাভজনক। বোরোধান চাষে গমের তুলনায় প্রায় ৮-১০ গুণ বেশি জল লাগে। সুতরাং বেশি জমিতে চাষ করা যাবে এবং মূল্যবান সেচের জলের অনেক বেশি কার্যকরী ব্যবহার করা যাবে। হিসাব করে দেখা গেছে, এক বিঘা বোরোধান চাষ করে ২০০০-২২০০ টাকা লাভ হতে পারে। অন্যদিকে এক বিঘা গমচাষ করে লাভ হতে পারে ২৫০০-২৮০০ টাকা। অর্থাৎ গমচাষে লাভ বেশি। কিন্তু শীতকালে সব জমিতেই গম চাষ করা যায় না। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি, যেখানে সেচের সুবিধা সীমিত ও ব্যয় বহুল এবং নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বা শেষদিকে গম বোনা যায়, সেখানে গম চাষ করাই লাভজনক।

গম চাষে আশানুরূপ ফলন যে যে বিষয়ের উপর মূলত নির্ভর করে সেগুলি হ'ল—

(১) উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ু, (২) উচ্চফলনশীল জাতের উন্নত বীজ, (৩) সার প্রয়োগ, (৪) পরিচর্যা, (৫) জলসেচ ও (৬) শস্য সুরক্ষা।

জলবায়ু ও মাটি : রৌদ্রোজ্জ্বল, মেঘমুক্ত আকাশ, ১৮-২১° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত, ঈষৎ অম্ল (পি. এইচ-৫.৫-৬.৫), উর্বর এঁটেল-দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটি গমচাষের উপযোগী। ছায়াচ্ছন্ন, স্যাঁতসেঁতে জমিতে গমচাষ করা যায় না।

উন্নত জাত : সোনালিকা ও ইউ. পি-২৬২ জাত দু'টি খুবই জনপ্রিয় এবং দীর্ঘদিন ধরে এই জাত দু'টির চাষ হয়ে আসছে। ফলে, এদের রোগ সহনশীলতা ও ফলন আগের থেকে এখন অনেক কমে এসেছে। বর্তমানে অনেকগুলি জাতের গম বাজারে পাওয়া যায়, যেগুলির ফলন ও রোগ সহনশীলতা অনেক বেশি। এগুলি হ'ল—

(ক) সময়ে বোনার জন্য ঃ রাজলক্ষী, এইচ.পি-১৭০১, কে-৯১০৭, এন. ডবলিউ-১০১২ পি.বি. ডব্লু-৩৪৩, বি.বি. ডব্লু-৩৭৩ ইত্যাদি।

(খ) দেরীতে বা নাবি হিসাবে বোনার জন্য ঃ এইচ. পি-১৭৬১, এইচ. ডি-২৪০২, ২২৮৫, পূর্বালী, সোনালী, গঙ্গা, এন. ডবলিউ-১০১৪ ইত্যাদি।

(গ) লবণাক্ত জমিতে চাষের উপযোগী ঃ এস. ডবলিউ-৩৬, এস. এন. এইচ-৯, কে. আর. এল-১৩, এইচ. পি-১৫২৯, জবনার-৬৬৬, ২০২৮ ইত্যাদি।

বীজের হার ও বীজ শোধন

বীজ বোনার পদ্ধতি ও দানার ওজনের উপর নির্ভর করে বিঘা প্রতি ১৫-১৭ কেজি বীজ লাগে। সারিতে বুনলে বীজের পরিমাণ কম লাগে, পরিচর্যার সুবিধা হয় এবং ফলন বেশি হয়। ৮ ইঞ্চি দূরত্বে সারিতে ১ ইঞ্চি গভীরতায় বীজ বোনা উচিৎ। বীজ বোনার আগে অবশ্যই শোধন করে নেওয়া দরকার। এতে পরবর্তীকালে বীজবাহিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ১০ গ্রাঃ TV মিশিয়ে বীজ শোধন করা প্রয়োজন।

বোনার সময়

ফুল আসা ও দানা পুষ্ট হওয়ার জন্য ঠান্ডা আবহাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখানে শীতের স্থায়িত্বকাল খুবই কম। তাই ২০-২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেই গম বীজ বোনা শুরু করা উচিৎ। মনে রাখতে হবে শীতের প্রারম্ভে যত তাড়াতাড়ি গম বীজ বোনা যাবে ফলন ততই বেশি হবে। মোটামুটি অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ বা নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ গম বোনার পক্ষে আদর্শ। নাবি জাতের গমবীজ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা যায়।

জমি তৈরি ও বীজ বপন

গমচাষের জন্য ৪-৫ বার চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে খুব ভালো করে জমি তৈরি করা উচিৎ। বীজ বোনার প্রায় পূর্বে প্রথম চাষের সময় বিঘাপ্রতি জৈব সার ৪-১০ টন, হিউমিক এ্যাসিড যৌগ ২ কেজি; উন্নত মানের জৈব সার অথবা খইল ১০০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটিতে খুব ভালো 'জো' থাকে। বীজ বোনার সময় 'জো' কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে শেষ চাষের আগে হালকা করে সেচ দিয়ে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে 'জো' করে নিতে হবে। শেষ চাষের আগে N-P.K জীবাণু সার বিঘা প্রতি ১.৫-২ কেজি প্রয়োগ করতে হবে এবং পরে বার বার মই দিয়ে সেচ নালি থেকে আড়াআড়িভাবে সরু সরু নালি টানতে হবে। এই নালিগুলির সাহায্যে সেচ এর জল সমানভাবে ছড়ানো যাবে এবং অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া যাবে। বীজ বোনার পরও এই নালি টানা যেতে পারে।

ছিটিয়ে বোনার থেকে সারিতে বীজ বোনা সবসময়ই লাভজনক। এতে শ্রমিক একটু বেশি লাগলেও বীজের পরিমাণ কম লাগে, সার, জল, আলো, বাতাসের সুষম ব্যবহার হয়। ফলে সব গাছ সমান বাড়ে, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিচর্যার সুবিধা হয়, ফলন বাড়ে। তাই, সারিতে বীজ বোনা উচিৎ। বীজ বোনার যন্ত্র যদি না থাকে তবে লাঙ্গলের 'ফাল' এর পিছন পিছন চোঙার সাহায্যে বীজ বোনা যায়।

চাপান সার ও জলসেচ

বিঘা প্রতি তরল সার চাপান হিসাবে প্রথম সেচ-এর আগে দ্বিতীয় সার দ্বিতীয় সেচ এর আগে বা প্রথম সেচের ২১ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর পরই সেচ দিতে হবে।

গম চাষের জন্য জলসেচের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা জরুরি। কখনোই বেশি পরিমাণ জল দিয়ে সেচ দেওয়া যাবে, না আবার জমি খুব বেশি শুকিয়ে ফেলাও যাবে না। মাটি ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সেচের পরিমাণ ও অন্তর নির্ভর করে। তবে, গমের মুকুট শিকড় আসার সময়, থোড় আসার সময় থেকে থোড়ের মধ্যাবস্থা পর্যন্ত, ফুল আসার পর দুধ আসার সময় ও দানা পুষ্ট হওয়ার প্রারম্ভে অবশ্যই সেচ দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ৪-৫টি সেচ লাগবে। মুকুট শিকড় আসার সময় যদি মাটিতে রস থাকে, তবে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সেচ দিলেও খুবই হালকা করে ছিটিয়ে সেচ দিতে হবে। কোনও কারণে সেচের জল বেশি দেওয়া হয়ে গেলে বা বৃষ্টি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিচর্যা

শস্য পরিচর্যার প্রথম কথাই হল আগাছা নিয়ন্ত্রণ। গমের জমিতে বাথুয়া জাতীয় আগাছার পাশাপাশি ফ্যালা ঘাস, বুনো জই, করাত ঘাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আগাছা ফসলের সঙ্গে জল, খাদ্য, আলো, বাতাস ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং রোগপোকার আশ্রয় দেয়। তাই, যথাযথভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ না করলে ফসল ভালো হয় না ও ফলন কম হয়। প্রথম চাপান সার প্রয়োগের পূর্বে হাত নিড়ানি বা বিদা (Hoe) দিয়ে আগাছা মুক্ত করতে হবে এবং ১৫-২০ দিন পর আর একবার আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে।

শস্য সুরক্ষা

গমের ক্ষেতে নানারকম রোগপোকার আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। এর জন্য প্রথম থেকেই সুপরিকল্পিত উপায়ে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বীজ বোনার একমাস আগে থেকে জমিতে চাষ দেওয়া, জৈব সার প্রয়োগ, নিম খইল প্রয়োগ, বীজশোধন, সারিতে বীজ বোনা, সঠিক দূরত্ব মেনে বীজ বোনা ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়ার পর বীজ বোনা ও চারা বের হওয়ার পর থেকে নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করতে হবে ও রোগপোকার আক্রমণের মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সুসংহত উপায়ে শস্য রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। গমের প্রধান প্রধান রোগ পোকা ও তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

(১) গোড়াপচা রোগ ঃ আক্রান্ত গাছের শেকড় ও মাটি সংলগ্ন গোড়া বাদামি বর্ণ ধারণ করে, পরে পাতায় ও গমের খোসায় লম্বা লম্বা বাদামিদাগ দেখা যায়। আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকলে জমি তৈরির সময় বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি T.H জৈব সারের সাথে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

(২) ভূষা রোগ ঃ এটি বীজবাহিত রোগ। গমক্ষেতে কিছু কিছু শীষের দানা কালো কালো ভূষোয় পরিণত হয়। আক্রান্ত জমির মাটিতে এই ভূষো থেকে জীবাণু পড়লেও পরবর্তীকালে রোগ সংক্রমিত হতে পারে। আক্রান্ত শীষগুলিকে সাবধানে তুলে এনে নষ্ট করে ফেলতে হবে। বীজশোধন করা এই রোগের প্রকৃত প্রতিকার ব্যবস্থা।

(৩) পাতা ধ্বসা রোগ ঃ আক্রান্ত গাছের পাতার ডগা শুকিয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরবর্তীকালে পাতা ঝলসে গেছে বলে মনে হয়। আক্রান্ত জমিতে খান্ডার্স ১.৫ মিলি/লি. জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

(৪) কালো মরচে রোগ ঃ আক্রান্ত গাছের পাতায় ও ডাঁটায় বাদামি বর্ণের লম্বা লম্বা দাগ দেখা যায় এবং পরে আক্রান্ত স্থান কালো বর্ণ ধারণ করে। প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হারে P.F স্প্রে করলে এই রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ওষুধ ৭-১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

(৫) উই পোকা ঃ গমের জমিতে উইপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে নিম গুঁড়ো বিঘা প্রতি ১০ কেজি হারে বীজ বোনার আগে জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

(৬) মাজরা পোকা ঃ আক্রান্ত জমিতে মরা/সাদা শীষ দেখা যায়। পোকার কীড়া কান্ডের ভিতরে ঢুকে ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলে। শীষ আসার আগে শতকরা ৫টি বা তার বেশি পাশকাঠি মাজরা পোকায় আক্রান্ত হলে প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম B.T বিকালে স্প্রে করতে হবে। ৭-১০ দিন পরে দ্বিতীয় বার করতে হবে।

ফসল তোলা ও ফলন

ফসল তোলার উপযুক্ত সময় হল গম পাকতে শুরু করেছে এবং দানার আর্দ্রতার মাত্রা ১৯-২০% হয়েছে এমন সময়। গম গাছ পেকে হলুদ হয়ে যাওয়ার পর গম কাটলে অনেক দানা ও শীষ ঝরে পড়ে, ফলে ফলন কমে যায়। তাই, পুরোপুরি পেকে যাওয়ার আগেই গমগাছ কেটে নেওয়া উচিৎ। ফসল কাটার পর যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব ঝাড়াই-মাড়াই করে, ভালো করে শুকিয়ে (আর্দ্রতা ১২%) গম দানা গুদাম জাত করা প্রয়োজন। শুকনো গম ঠান্ডা করে বায়ু নিরোধক পাত্রে ভরে রাখলে অনেকদিন ভালো থাকে। উন্নতজাতের গম চাষ করলে বিঘা প্রতি ৫-৫.৫ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়।

পাট

পাট একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। এর তন্তুকে বলা হয় সোনালি আঁশ (Golden fibre)। পাট তন্তু থেকে চট তৈরি করার জন্য হুগলী নদীর উভয় তীরে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য পাটকল। বর্তমানের পরিবেশ নির্ভর আধুনিক কৃষিতে পাট চাষ আজও শুধু যে প্রাসঙ্গিক তাই নয়, বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে চাষ করলে আজও পাট চাষ লাভজনক। আজকাল কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকারক দিক সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশেবিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। কাপড় শিল্পে, কাগজশিল্পে, গৃহস্থালির ও নানা সৌখিন জিনিস তৈরিতে পাটতন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত তন্তুর চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বৃষ্টি নির্ভর চাষে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থার উপর চাষীদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কিন্তু মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগ, উন্নতজাতের ও গুণমানের বীজের ব্যবহার, শস্য পরিচর্যা, সুসংহত উপায়ে শস্য সুরক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তিতে তন্তু নিষ্কাশন ইত্যাদি যথাযথ ভাবে করলে বিঘা প্রতি তন্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তন্তুর গুণমান উন্নত হওয়ায় বাজারে উচ্চ মূল্য পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানভিত্তিক পাটচাষ সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

জলবায়ু ও মাটি

পাট গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন ফসল। ২৫-৩০° সেলসিয়াস উষ্ণতা, ৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং ১২৫-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত পাটচাষের পক্ষে উপযোগী। তবে, মার্চ মাস থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২৫-৩০ সেমি বৃষ্টিপাত হ'লে ভালো হয়।

এঁটেল থেকে বেলে দোআঁশ প্রায় সবরকম মাটিতে পাট চাষ করা যায়। তবে, ভালো ফলন ও উন্নতমানের আঁশের জন্য দোআঁশ বা পলিযুক্ত বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত (অম্লত্ব ৬-৭.৫)। উঁচু, মাঝারি বা নীচু সবরকম জমিতে পাট চাষ করা যায়। তবে চারাগাছ অবস্থায় জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকলে চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অনেক সময় চারা মরে যায়।

উন্নত জাত

পাটকে মূলত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—অলিটোরিয়াস বা মিঠা পাট ও ক্যাপসুলারিস বা তিতা পাট। পাটের উন্নত জাতগুলি হ'ল ঃ মিঠা পাট- নবীন, চৈতালি, বৈশাখী, বাসুদেব ইত্যাদি। তিতা পাট সোনালি, শ্যামলি, সবুজ সোনা ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে প্রথম বৃষ্টির সাথে সাথেই জমিতে চাষ দিতে হবে। লম্বা ও আড়াআড়ি ভাবে ২-৩ বার গভীরভাবে চাষ দিয়ে, আগাছামুক্ত করে, মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে এবং বারবার মই দিয়ে জমি ভালো করে সমান করে নিতে হবে। প্রথম চাষের সময় সম্ভব হ'লে বিঘা প্রতি ১ টন জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং শেষ চাষের আগে বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি N.P.K জীবাণু সার ও ১ কেজি PF প্রয়োগ করতে হবে। নিড়াণি দেওয়ার সময় ১০০ কেজি উন্নত মানের জৈব সার/খইল প্রয়োগ করতে হবে।

বীজের হার ও বীজ বোনা

পাটের বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। কিন্তু ভালো ফলন ও উন্নতমানের আঁশ পেতে গেলে লাইন করে বীজ বোনা উচিৎ। এতে বীজ কম লাগে। সব গাছ আলো-বাতাস-সার-জল ইত্যাদি সমানভাবে পায়। আগাছা নিড়ানো, শস্য সুরক্ষা সহজ হয়। রোগপোকা কম লাগে এবং আঁশের গুণমান ভালো হয়। তাই, সবসময় বীজ সারিতে বা লাইন করে বোনা উচিৎ। এর জন্য, বীজবোনার যন্ত্র বা 'সীডড্রিল' ব্যবহার করা সবচেয়ে সুবিধাজনক। ছিটিয়ে বীজ বুনলে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে বীজ বোনা হয়, সব জায়গায় সমানভাবে ও সমান গভীরতায় (২ ইঞ্চি) বীজ পড়ে। সারিতে বীজ বোনার ক্ষেত্রে মিঠা পাটের জন্য ৮-৯ ইঞ্চি দূরত্বে এবং তিতা পাটের জন্য ১০-১২ ইঞ্চি দূরত্বে সারি করে ২-২.৫ ইঞ্চি দূরত্বে চারা হয়, এমনভাবে বীজ বুনতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে বিঘা প্রতি ১২০০-১৫০০ গ্রাম এবং সারিতে বুনলে বিঘা প্রতি ৮০০-১০০০ গ্রাম বীজ লাগে। উন্নত জাতের, ভালো মানের বীজ সংগ্রহ করতে হবে এবং বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। একটি মুখবন্ধ পাত্রে প্রয়োজনীয় বীজ এবং কেজি প্রতি ৫ গ্রাম হারে TV / TH জাতীয় ওষুধ নিয়ে ১০-১৫ মিনিট ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে যাতে ওষুধ সব বীজের গায়ে সুষম ভাবে লেগে যায়।

পরিচর্যা

পাট চাষে পরিচর্যার গুরুত্ব সর্বাধিক। জমির আগাছা দুর করা, ফসল পাতলা করা ও মাটি আলগা করা ঠিক ঠিক ভাবে না হলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন প্রচন্ড ভাবে ব্যহত হয় ও আঁশের গুণমান খুবই খারাপ হয়। তাই, চারা অবস্থা থেকেই পরিচর্যার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। চারার ১৫-২০ দিন বয়স থেকে ৪০-৪৫ দিন বয়স পর্যন্ত কমপক্ষে দু'বার বিদা বা আঁচড়া এবং নিড়ানির সাহায্যে আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে, চারার গোড়ার মাটি আলগা করে এবং অতিরিক্ত চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে। ফসল পাতলা করার পর যেন গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪-৪.৫ ইঞ্চি হয়। পাটগাছ যখন ৩-৪ ফুট লম্বা হয় তখন আর একবার দুর্বল ও রুগ্ন গাছ তুলে ফেলে দিতে হয়।

শস্য সুরক্ষা

বেশ কয়েকটি পোকামাকড় ও রোগ জীবাণু পাটের ক্ষেত আক্রান্ত করে ফসলের ক্ষতিসাধন করে। তাই, নিয়মিত নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রোগপোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক চরমসীমা অতিক্রম করলে, অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার খরচের চেয়ে বেশি হলে, জৈব কীটনাশক যেমন B.B বা নিমের নির্যাস প্রয়োগ করতে হবে। পোকামাকড়ের মধ্যে আংকা পোকা, হলুদ মাকড়, লাল মাকড়, ঘোড়া পোকা, শুয়ো পোকা, ল্যাদা পোকা ও বলয় কীট এবং রোগের মধ্যে কান্ডপচা রোগ, ঢলে পড়া রোগ, মরচে ধরা রোগ এবং কালোবন্ধনী রোগ ফসলের ক্ষতি করে বেশি। এছাড়া, পাতায় ছিটে দাগ বা মোজাইক রোগ, খোলাপচা রোগ ও গোড়ায় কৃমি বা নিমাটোড কখনও কখনও পাটক্ষেতে আক্রমণ ঘটায় ও ফসলের ক্ষতি করে। সঠিক সময়ে বীজ বোনা, উন্নত মানের বীজ ব্যবহার, বীজ শোধন, আগাছামুক্ত পরিচ্ছন্ন চাষ, সারিতে বীজ বোনা ও সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা, সুষম সার প্রয়োগ, যথাসময়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও মাটি আলগা করা, শস্য পর্যায়ের প্রয়োগ, বন্ধু পোকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঠিকঠিক ভাবে গ্রহণ করলে রোগ পোকার সম্ভাবনা অনেকাংশে কম থাকে। সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও রোগপোকার আক্রমণ দেখা দিলে পরিবেশ ও বন্ধুপোকার পক্ষে কম ক্ষতিকারক ওষুধ সঠিক সময়ে, পরিমাণে ও পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল তোলা ও পাট পচানো

পাটগাছ পরিণত হওয়ার সাথে সাথে এর ছাল পুরু ও শক্ত হতে থাকে। পাটগাছে ফুল আসার সময় কান্ডের

মাঝামাঝি পর্যন্ত ছাল পুরু হয়ে যায় এবং উপরের অংশের ছাল তখনও পুরু হতে থাকে। ফুল থেকে ফল ধরতে শুরু করলে পাট কাটা উচিৎ। মিঠা পাটের ক্ষেত্রে ৯০-১২০ দিন ও তিতা পাটের ক্ষেত্রে ১২০-১৪০ দিন লাগে। এর আগে পাট কাটা হলে ফলন কম হয় এবং বেশি দেরিতে পাট কাটা হলে আঁশের মান খারাপ হয়ে যায়। ধারালো কাস্তে বা হাঁসুয়া দিয়ে গোড়া থেকে কেটে পাটগাছ ৩-৪ দিন জমিতে ফেলে রাখা হয় এবং পাতা ঝরে গেলে ৭০-৮০টি গাছ নিয়ে এক একটি আঁটি বাঁধা হয়। ঝরে পড়া পাতা থেকে পরের ফসলের জন্য মাটিতে বিঘাপ্রতি ২.৫-৩ কেজি নাইট্রোজেন, ১ কেজি ফসফেট ও ২ কেজি পটাশ যোগ হয় এবং জৈবসার যোগ হওয়ায় মাটির সার্বিক উর্বরতা শক্তি বাড়ে। প্রতি আঁটিতে ৩-৪টি করে শন বা ধইঞ্চা গাছ বেঁধে নিলে পচন ভালো হয়। এইভাবে, বিঘাপ্রতি ৩০-৪৫ কুইন্টাল কাঁচা পাট উৎপন্ন হতে পারে। এতে ৯-১২ শতাংশ পাতা, ৪০-৪৫ শতাংশ ছাল ও ৪৭-৫২ শতাংশ সবুজ কাঠি থাকে। ধীরে ধীরে বয়ে যায় এমন মিষ্টি জলে (নোনা নয়) পাট পচালে সবচেয়ে ভালো মানের আঁশ পাওয়া যায়। ১ ভাগ পাটের জন্য কমপক্ষে ২০ ভাগ জল থাকা উচিৎ। বহমান জল না পাওয়া গেলে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বদ্ধ জলে তিন বারের বেশি পাট পচানো না হয়। যেখানে পাট পচানো হবে সেখান থেকে বর্ষা শুরুর আগেই পাঁক তুলে নেওয়া উচিৎ। এতে পরিষ্কার জল ও ফলস্বরূপ ভালো মানের তন্তু বা আঁশ পাওয়া যাবে।

পাট পচানোর পদ্ধতির উপর তন্তুর গুণমান বহুলাংশে নির্ভর করে। একে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় পচন ও বিভিন্ন জীবাণুর জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পচন। আমাদের দেশে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই পাট পচানো হয়। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক ও জীবাণু পচন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। দুইভাগে পচন ক্রিয়া ঘটানো হয়ে থাকে। পাটগাছগুলিকে গাদা দিয়ে ছত্রাকের ক্রিয়ায় পচন এবং জলে ডোবানো অবস্থায় ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণুর ক্রিয়ায় পচন। অগভীর অথচ পরিষ্কার ধীরগতিতে বয়ে যাওয়া জলের মধ্যে পাটগাছের আঁটিগুলিকে জাঁক দেওয়া হয়। শুরুতে আঁটির গোড়ার দিক ৩-৪ দিন খালের জলে ডুবিয়ে রাখলে সব অংশ সমানভাবে পচবে। এতে উঁচু মানের আঁশ পাওয়া যাবে। এরপর গভীর জলযুক্ত স্থানে আঁটিগুলিকে পাশাপাশি রেখে শক্ত করে বেঁধে জাঁক দিতে হবে। এইভাবে উপর্যুপুরি ২-৩টি স্তরেও পাট পচানো যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উপরের স্তরের উপর ৪-৫ ইঞ্চি জল থাকে এবং নীচের স্তরটি মাটিতে ঠেকে না যায়। বড় পাথর খন্ড, ইঁট, ভারী কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে জাঁক দেওয়া উচিৎ এবং মাটি, কলাগাছ বা আম কাঠ কখনই ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এইভাবে ২ সপ্তাহের মধ্যেই পচন সম্পন্ন হয়ে যায়। ১০-১২ দিন পরই পচন ক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ। বেশি পচে গেলে আঁশের মান খারাপ হয়ে যায়। ডাঁটাগুলি ঠিকমতো পচে গেলে ৮-১০টি গাছের গোড়া একসাথে ধরে গোড়া থেকে কিছুটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং ভাঙা কাঠির টুকরো বেছে ফেলতে হবে। এখন আঁশ গুচ্ছ ধরে নাড়াচাড়া করলেই কাঠি থেকে আঁশ আলাদা হয়ে যাবে। এই আঁশ পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে, দড়ির উপর বিছিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। পরের দিকে ২-৩ বার রোদে শুকানো যেতে পারে। সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও পাটের আঁশের রং কালো হয়ে গেলে পাতিলেবু, তেঁতুল ইত্যাদির সাহায্যে কালো রং কিছুটা দূর করা যায়। ১ কেজি ছাড়ানো তেঁতুল ১ লি. জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখার পর ছেঁকে নিয়ে মিশ্রণে আরও ৫ লিটার জল মেশাতে হবে এবং ঐ জলে শ্যামলা কালো রং এর আঁশ ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে, তারপর নিংড়ে নিয়ে, ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে এবং শুকোতে হবে। ভালো ভাবে শুকানোর পর পাটতন্তুকে গাঁটবেঁধে রাখতে হবে।

ফলন

মিঠাপাট—বিঘাপ্রতি ৩.৫-৪.০ কুইন্টাল

তিতা পাট—বিঘা প্রতি ৪.০-৪.৫ কুইন্টাল

গোটা পাটের তন্তুর দৈর্ঘ্য ৪.৫-৫ ফুট হওয়া উচিৎ (কম পক্ষে)

বর্তমানে আঁশের মান আরও উন্নত করার জন্য জাঁক দেওয়ার আগে, আঁশ ছাড়ানোর পরে বিশেষ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

জাঁক দেওয়ার আগে

পাতা ঝরে গেলে পাটগাছের গোড়ার দিকে তরল ব্যাকটেরিয়া কালচার ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর স্বাভাবিক নিয়মে জাঁক দেওয়া হয়। এর ফলে প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে ও পচন ত্বরান্বিত হয়। পাটগাছের শুধু ছাল পচানো বা 'রিবন রেটিং' পদ্ধতিতে গোটা গাছ না পচিয়ে শুধুমাত্র গাছের ছাল পচানো হয়। পাটগাছের পাতা ঝরিয়ে নিয়ে গোড়ার দিকের ৪-৬ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ বাঁশের মুগুর দিয়ে থেঁতো করে নিতে হবে। বেশ কয়েকটি গাছের ছাল একসাথে নিয়ে পাকিয়ে ছোট ছোট 'বালা' করে রাখতে হবে। এই বালাগুলি বাঁশের মধ্যে ভরে নিয়ে জাঁক দিতে হবে। নারকেল পাতা বা পুরানো পাটকাঠি দিয়ে জাঁক ঢেকে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন জ্বালানী পাটকাঠি পাওয়া যাবে, কম জলে বেশি পাট পচানো যাবে, সময় কম লাগবে, বেশি পরিমাণ আঁশ পাওয়া যাবে, শ্রমিক কম লাগবে।

তৈলবীজ

তৈলবীজের চাষ বলতে বিভিন্ন জাতের সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, তিসি, কুসুম, রেড়ি, করঞ্জা ইত্যাদির চাষ বোঝায়। সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ইত্যাদির তেল প্রধানত ভোজ্য তেল হিসাবে বা খাওয়ার তেল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কুসুম, রেড়ি, করঞ্জা, তিসি ইত্যাদির তেল প্রধানত বার্ণিস ও পিছলকারী তেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পর পড়ে থাকে খইল। বিভিন্ন কাজে খইল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, সরিষা ও তিসির খইল গোখাদ্য হিসাবে, নিম, করঞ্জা ও রেড়ির খইল জৈবসার ও কীটনাশক হিসাবে এবং প্রায় সবরকম খইলই জৈব সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন তেল ভোজ্য তেল হিসাবে ব্যবহৃত হলেও আমরা মূলত নির্ভর করি সরিষার তেল এর উপর। প্রয়োজনের তুলনায় সরিষার উৎপাদন খুবই সামান্য এবং কিছুটা ঘাটতি তিল, সূর্যমুখী ইত্যাদির তেল দ্বারা পূরণ হলেও, এসবের উৎপাদনও এতটাই সীমিত যে, ভোজ্যতেলের মোট চাহিদার খুব অল্প পরিমাণই স্থানীয় ভাবে উৎপন্ন হয় এবং প্রচুর পরিমাণ ভোজ্য তেল অন্য রাজ্য থেকে বা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণের জন্য তৈলবীজ চাষের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বা ফলন বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে। বর্তমানে তৈলবীজ চাষে অনীহা দেখা যায় মূলত এর উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার জন্য। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উৎপাদনশীরতা বাড়ানোর জন্য যা যা করণীয় তা ঠিকঠিকভাবে করলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং তৈলবীজ উৎপাদনও অন্যান্য ফসলের মতোই লাভজনক হবে। তৈলবীজ শস্যের ফলন বা উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার কারণগুলি হল ঃ

(১) অন্যান্য ফসলের মতো তৈলবীজ চাষে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে তৈলবীজের চাষ করা হয়।

(২) বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় তৈলবীজের চাষ করা হয়। ফলে, প্রয়োজনের সময় সেচের অভাবে ফলন মার যায়।

(৩) প্রধান ফসল চাষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চাষ করার ফলে সঠিক সময়ে বীজবোনা ও পরিচর্যা করা হয়ে ওঠে না।

(৪) সার প্রায় দেওয়াই হয় না।

(৫) প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠার জন্য রোগপোকার আক্রমণ বেশি হয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

ফলে, ফলন প্রচন্ড ভাবে মার খায়। সুতরাং, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন, স্বল্পকালীন বা স্বল্পমেয়াদী উচ্চফলনশীল জাতের চাষ, সঠিক সময়ে বীজ বপন, জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, শস্যসুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিচর্যা, জলসেচ ইত্যাদি। গুরুত্ব সহকারে চাষ করলে তৈলবীজ চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে ও চাষ লাভজনক হবে।

(১) সরিষা

জলবায়ু ও মাটি

শুষ্ক ও শীতল শীতকালীন আবহাওয়া সরিষা চাষের অনুকুল। ১১-২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা, মেঘযুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল দিন সরিষা চাষের পক্ষে উপযোগী। তাই, রবি মরশুমে সরিষা চাষ করা উচিত। সরিষা চাষে বীজ বোনা সঠিক সময়ে হওয়া জরুরি। কারণ, দেরি হলে শুঁটি ধরার সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ও জাবপোকা সহ বিভিন্ন পোকার আক্রমণ বেশি হবে। ফলে, ফলন প্রচন্ডভাবে মার খাবে। উর্বর দোঁয়াশ মাটি সরিষা চাষের পক্ষে আদর্শ। তবে, বেলে দোঁয়াশ বা এঁটেল দোঁয়াশ মাটিতেও চাষ করা চলে। তবে, স্যাঁতসেতে এঁটেল মাটিতে সরিষা চাষ না করাই ভালো।

উন্নত জাত

সরিষাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—টোরি, শ্বেত সরিষা ও রাই। বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উন্নত জাতগুলি হ'ল টোরি ঃ বি-৫৪ (অগ্রণী), টি-৯, টি-৩৬, টি-৩৯, কম্পোজিট-৩ প্রভৃতি। শ্বেত সরিষা ঃ বি-৯ (বিনয়), সুবিনয়, ঝুমকা, পুষা কল্যানী ইত্যাদি। রাই ঃ বরুণা (টি-৫৯), সীতা (বি-৮৫), সরমা, ভাগীরথী ইত্যাদি।

বীজ বপন

বিঘাপ্রতি ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি বীজ লাগে। বীজ বোনার আগে শোধন করে নেওয়া উচিত। প্রতি কেজি বীজের সাথে ১০ গ্রাম হারে টাইকোজরমা ভিরিটি (TV) মিশিয়ে শোধন করতে হবে। বীজ বোনার আগে বিঘা প্রতি ১০-১২ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করে জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে এবং বীজ বোনার আগে যদি জমিতে ভালোরকম 'জো' না থাকে তবে অল্প সেচ দিয়ে 'জো' করে নিতে হবে এবং ২-৩ বার চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। চাষের সাথে সাথে ঘাস বেছে ফেলে জমি আগাছা মুক্ত করতে হবে। শেষ চাষের আগে প্রতি বিঘা জমি ভালো করে সমান করে ১৮-২০ ফুট অন্তর সেচের নালা তৈরি করতে হবে এবং আড়াআড়িভাবে ১২ ইঞ্চি দূরত্বে ১০ সারিতে বীজ বুনতে হবে। লাল পিঁপড়ে বা উইপোকার সমস্যা থাকলে বিঘা প্রতি ১০ কেজি হারে নিম খইল জমিতে ছড়াতে হবে। বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা উচিৎ। এতে সমহারে ও সমান গভীরতায় (১-১.৫ ইঞ্চি) বীজ বোনা হয়। ফলে, গাছের বৃদ্ধিও সুষম হারে হয়। টোরি ও শ্বেত সরিষাতে বিঘা প্রতি সারের মাত্রা হবে ১০:৫:৫ কেজি নাঃ : ফঃ: পঃ। বীজ বোনার পূর্বে বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি N.P.K. জীবানুসারে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা

বীজ বোনার ১০-১২ দিন পরে একবার এবং ১৮-২০ দিন পরে আরেকবার আগাছা মুক্ত করার পাশাপাশি ঘন হয়ে যাওয়া অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলে দিতে হবে এবং চারার গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে।

সেচ ও চাপান সার প্রয়োগ

'জো' অবস্থায় বীজ বোনা হ'লে ফুল আসার আগে একবার এবং ফল ধরার পরে একবার সেচ দেওয়া উচিত। সম্ভব হলে, বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ, ৫ সপ্তাহ ও ৭ সপ্তাহ পরে একবার করে এবং প্রয়োজন হলে ফল পাকার আগে আরেকবার সেচ দেওয়া ভালো। বীজ বোনার ১ মাস পরে চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে ভালো মতো জো না থাকলে সার প্রয়োগের পর হালকা করে সেচ দিতে হবে। প্রথম দিকে নালা থেকে ছিটিয়ে এবং গাছ বড় হলে গেলে জমি ভাসিয়ে সেচ দেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে জল দাঁড়িয়ে না থাকে। অর্থাৎ অতিরিক্ত জল বের করে দিতে হবে।

শস্য সুরক্ষা

সরিষা জাব পোকা, করাত মাছি, চিত্রিত পোকা ইত্যাদি পোকা এবং মূল-অবুর্দ, ধ্বসা, ডাউনি ও পাউডারী মিলডিউ, শিকড় পচা, ডাঁটা পচা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়।

জাব পোকা

অতিক্ষুদ্র, হালকা সবুজ, ডানাবিহীন পোকাগুলি দলবদ্ধভাবে কচিপাতা, ডগা, ফুল ও কচি ফলের রস শোষন করে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারণত ফাল্গুন মাস থেকে এই পোকার প্রাদুর্ভাব বেশি হতে দেখা যায়। নিমজাত বা জৈব কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

করাত মাছি

পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মাছি পাতার কিনারায় ত্বকের নীচে ডিম পাড়ে এবং ৫-৭ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে আটটি পা-যুক্ত, ঈষৎ সবুজাভ কালো কীড়া বেরিয়ে এসে কচি পাতা খেতে শুরু করে। ৩০-৩৫ দিন ধরে পাতা, কচি ডগা, পুষ্প মঞ্জরী, ফুল ও কচি ফল খেতে থাকে। আক্রান্ত জমিতে সেচ দিলে পোকার প্রকোপ কিছুটা কমে। জাবপোকার জন্য সুপারিশকৃত কীটনাশক প্রয়োগ করে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এছাড়া চিত্রিত পোকা, প্রজাপতি, উইভিল প্রভৃতি কীটশত্রুর আক্রমণ দেখা দিলে উপরোক্ত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে। সরিষা ক্ষেতের চারিদিকে ভুট্টা বা অড়হর গাছ লাগিয়ে পোকার আক্রমণ কিছুটা প্রতিহত করা যেতে পারে।

মূল-অবুর্দ রোগ

গাছের মূলে গুটি বা অবুর্দ হতে দেখা যায়। অপরিণত অবস্থায় সাদা এবং পরিণত অবস্থায় ধূসর কালো রঙয়ের হয়। আক্রান্ত গাছ বাড়ে না ও বিবর্ণ হয়ে যায়। ছত্রাক ঘটিত এই রোগটির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য P.L দিয়ে বীজ শোধন করে বোনা উচিৎ। শেষ চাষের আগে বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি পিশিলোমাইসিস লিলাসি-নাশ (P.L) প্রয়োগ করুন।

ধ্বসা রোগ

ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এই রোগের প্রকোপ বেশি হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা পচে যায় ও গাছ মরে যায়। বীজশোধন, জমিতে শেষ চাষের আগে ১.৫ কেজি T.V. or P.F. প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল তোলা ও ফলন

জাত অনুযায়ী ৭৫-১২০ দিন লাগে সরিষা পাকতে। গাছের রং হলদে হয়ে এলে কাস্তে দিয়ে গাছ কেটে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে ২-৩ দিন রোদে শুকানো প্রয়োজন। এরপর খামারের উঠোনে আরও কয়েকদিন মাথা উপর দিকে করে গাদা দিয়ে শুকানোর পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ঝাড়াই-মাড়াই করা হয় এবং ভালো করে পরিষ্কার

করে ৩-৪ দিন রোদে শুকানোর পর সরিষা বস্তায় ভরে গুদামজাত করা হয়। সাধারণত বিঘা প্রতি ৬০ থেকে ৮০ কিলোগ্রাম ফলন হয়। তবে উন্নত জাতের ভালো মানের বীজ এবং উপযুক্ত সার, সেচ, পরিচর্যার মাধ্যমে বিঘা প্রতি ১২০-১৬০ কিলোগ্রাম ফলন পাওয়া যেতে পারে।

মিশ্র চাষ

গম, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি ফসলের সাথে সরিষা চাষ করা যেতে পারে। এতে চাষের ঝুঁকি কম থাকে এবং একই জমি থেকে একই সাথে একাধিক ফসল তোলা যায়।

(২) তিল

জলবায়ু ও মাটি

রৌদ্রোজ্জ্বল বড় দিন, ২২-৩৪^0 সেলসিয়াস তাপমাত্রা, কমপক্ষে ৫০০ মিমি. বৃষ্টিপাত তিল চাষের উপযোগী। অত্যধিক বৃষ্টিপাত তিল চাষের পক্ষে প্রতিকূল। জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত বেলে দোঁয়াশ বা পলি দোঁয়াশ মাটি তিল চাষের পক্ষে আদর্শ। তবে, জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু জমিতে চাষ করলে যে কোনও ধরনের মাটিতেই তিল চাষ করা চলে।

উন্নত জাত

চাষের সময় অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের তিল চাষ করা হয়ে থাকে। যেমন, ভাদুই তিল, প্রাক শীতকালীন তিল সাদা বা ধূসর সাদা এবং প্রাক খরিফ তিল বাদামি ও কালচে বাদামি রঙয়ের হয়। আমাদের এখানে এই জাতীয় তিলের চাষ হয়ে থাকে। স্থানীয় উপযোগী উন্নত জাতগুলি হল, বি-৬৭ (তিলোত্তমা), রমা (আই. এস-৫), বি-১৪, বি-৯, টি-৯ ইত্যাদি।

বীজের হার ও বীজ বপন

ছিটিয়ে বুনলে বিঘা প্রতি ১২০০-১৫০০ গ্রাম এবং সারিতে বুনলে ৮০০-১০০০ গ্রাম বীজ লাগে। বোনার আগে বীজ কেজি প্রতি ১০ গ্রাম হারে T.V জীবাণু জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে শোধন করে নেওয়া উচিৎ। সারিতে বুনলে বীজ বোনার যন্ত্র বা সীড ড্রিল ব্যবহার করা উচিৎ। এর সাহায্যে বীজ সমদূরত্বে ও সমগভীরতায় পড়বে। ফলে, গাছের বৃদ্ধি সুষম ভাবে হবে। সারিতে বুনলে এক ফুট দূরত্বে এবং ১ ইঞ্চি গভীরতায় বীজ বুনতে হবে। চারা বের হওয়ার পর অতিরিক্ত চারা তুলে ৬ ইঞ্চি দূরত্বে সুস্থ সবল চারা রাখতে হবে।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

তিলের পূর্ববর্তী ফসল হিসাবে সব্জী বা আলু চাষ করা হলে এবং সুপারিশ মতো সার প্রয়োগ করা হলে তিল চাষে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। অন্যক্ষেত্রে, বিঘা প্রতি ৮-১০ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করে বীজ বোনার ১ মাস আগে জমি চষে রাখতে হবে এবং বীজ বোনার আগে ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে ও আগাছা মুক্ত করতে হবে। শেষ চাষের আগে বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি বায়ো N.P.K. প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার আগে জমিতে যেন ভালো মতোন জো থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বীজ বোনার ১ মাস পরে চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে এবং জমিতে জো না থাকলে হালকা করে সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ও জলসেচ

বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পরে বিদা বা নিড়ানি দিয়ে জমির মাটি আলগা করে দিতে হবে, ঘাস তুলে ফেলে ও অতিরিক্ত চারা তুলে হাল্কা করে দিতে হবে। ২৫-৩০ দিন পর আর একবার অনুরূপ ভাবে পরিচর্যা করতে হবে। তিল চাষে খুব কমই জল লাগে। ভালো রকম জো করে বীজ বোনার পর চাপান সার প্রয়োগের পরে একবার, গাছে ফুল আসার সময় একবার এবং ফল পাকার আগে একবার সেচ দেওয়ার প্রয়োজন।

শস্য সুরক্ষা

বিছা পোকা, ল্যাদা পোকা, থ্রিপস, চোষী পোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি কীটশত্রু এবং গোড়া পচা, ডাঁটা পচা, ফাইলোডী, মিলডিউ, অ্যানথ্রাকনোজ প্রভৃতি রোগের দ্বারা তিল শস্য আক্রান্ত হতে পারে।

ফাইলোডী রোগে আক্রান্ত হলে (কান্ড চ্যাপ্টা হয়ে যায়) এই রোগের বাহক জাবপোকা মারার জন্য নিমজাতীয় জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে এবং আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে।

ফসল তোলা ও ফলন

৯০-১০০ দিনের মধ্যে তিলগাছ কাটার উপযোগী হয়ে যায়। ফসল পুষ্ট হলে গাছ হলুদ হয়ে পাতা ঝরতে থাকে এবং শুঁটিগুলি বাদামি রং ধারণ করে। ৭৫ শতাংশ শুঁটি পেকে গেলে গাছ কেটে খামারে তুলে আনা উচিৎ। খামারে গোড়া বাইরের দিকে ও মাথা মাঝখানে রেখে গোলাকার গাদা দিয়ে ৭-৮ দিন জাঁক দেওয়া হয় এবং তারপর ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শুঁটি থেকে বীজ বা দানা বের করা হয়। দানা ভালো করে ৩-৪ দিন রোদে শুকানোর পর ঝাড়াই করে বস্তায় ভরা হয়। ভালো করে যত্ন নিয়ে চাষ করলে বিঘা প্রতি ১২০-১৪০ কেজি তিল পাওয়া যেতে পারে।

৫.২ প্রধান প্রধান সবজির উন্নত চাষ পদ্ধতি

চারা তৈরি

বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ভালোভাবে সবজি চাষ করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর ফলন পাওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি জলদি জাতের সবজি চাষে অধিক লাভ করাও সম্ভব। বিশেষত ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমাটো, ক্যাপসিকাম, ওলকপি ইত্যাদি সবজির জলদি ফলন পেতে গেলে শীতের অনেক আগেই চারা তৈরির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। শীতের সবজির চারা তৈরির জন্য, বিশেষত জলদি জাতের সবজির চারা তৈরির জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, অধিকাংশ সবজি চারাই তৈরি করা হয় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। অর্থাৎ তখনও বর্ষা থেকে যায় এবং পরিবেশ থাকে ভ্যাপসা গরম। গোড়াপচা, ঢলে পড়া, বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস রোগের প্রকোপ এই সময় বেশি থাকে। তাই এই সময় চারা তৈরির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা ও বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

রোগমুক্ত সবজির চারা তৈরি করার জন্য যেসব বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলো হল (ক) উপযুক্ত জাত ও উৎকৃষ্ট বীজ নির্বাচন, (খ) বীজ শোধন, (গ) বীজতলা শোধন, (ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে চারা তৈরি।

(ক) উপযুক্ত জাত ও উৎকৃষ্ট বীজ নির্বাচন

কোনও চাষে ফসল ও ফলন কেমন হবে তার ৬০ শতাংশই নির্ভর করে তার বীজের ওপর। আশানুরূপ ফলন পেতে গেলে প্রথমেই নজর দিতে হবে সময়োপযোগী জাত নির্বাচন করে উৎকৃষ্ট গুণমানের বীজ সংগ্রহের দিকে। বিশ্বস্ত সংস্থা থেকে গুণমান যাচাই করে রোগমুক্ত, উচ্চ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা যুক্ত বীজ কিনতে হবে। পরিচ্ছন্ন ও পুষ্ট বীজ থেকেই ভালো চারা পাওয়া যেতে পারে।

(খ) বীজ শোধন

শোধন করা না থাকলে বোনার আগে বীজ ভালোভাবে শোধন করা দরকার। এতে পরবর্তীকালে নানারকম বীজবাহিত রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

বীজ শোধন তিনভাবে করা যেতে পারে ঃ (১) গরম জলে, (২) শুকনো বীজে ওষুধ মাখিয়ে, (৩) ওষুধগোলা জলে বীজ ভিজিয়ে।

গরম জলে শোধন

এই পদ্ধতিতে ৪৮-৫০^0 সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম জলে ১৫-৩০ মিনিট বীজ ভিজিয়ে শোধন করা হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার, যাতে তাপমাত্রা খুব কম বা খুব বেশি না হয়। এই পদ্ধতিতে ফুলকপি ও বাঁধাকপির একপেশে রোগ, বেগুনের ফলপচা রোগ ইত্যাদির জীবাণু ধ্বংস করা যায়।

শুকনো বীজে ওষুধ মাখিয়ে শোধন

এই পদ্ধতিতে খুব সহজেই বীজ শোধন করা যায়। ১০ গ্রাম TV প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে দিলে ওষুধ বীজের গায়ে লেগে যায়। ফলে, বীজবাহিত রোগ-জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়।

ওষুধ গোলা জলে বীজ ভিজিয়ে শোধন

প্রতি কেজি বীজে ৫ গ্রাম TV/PF প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে বীজ বা কন্দ কিছুক্ষণ ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পরে ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়া হয়।

(গ) বীজতলা শোধন

বীজতলার মাটি ভালোভাবে তৈরি করে প্রয়োজনীয় জৈবসার ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। জৈবসারের সঙ্গে ট্রাইকোডারমা ও সিউডোমোনাস জাতীয় জৈব রোগনাশক মিশিয়েও মাটি শোধন করা যায়।

(ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে চারা তৈরি

সবজি বীজের দাম বেশি। বিশেষত বিভিন্ন সংকর জাতের বীজের দাম তো আকাশছোঁয়া। তাই, বহুমূল্য বীজ থেকে যাতে সর্বাধিক সংখ্যক সতেজ চারা পাওয়া যায়, তার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ও বিশেষ যত্ন নিয়ে চারা তৈরি করা প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি যেখানে আলো-বাতাস প্রচুর, জল দাঁড়ায় না অথচ সেচের সুযোগ আছে, সেরকম জমিই বীজতলা করার উপযুক্ত। দোআঁশ মাটিই বীজতলার পক্ষে ভালো। এঁটেল মাটির ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় জৈব সার মেশাতে হবে। বীজতলার মাটি দেড় থেকে দু'ফুট গভীর করে খুঁড়ে ভালো করে রোদ খাইয়ে নিতে হবে। এরপর, প্রতি বর্গমিটারে ২-৩ কেজি জৈব সার ভালো ভাবে মিশিতে দিতে হবে। বীজতলার জমি ১ মিটার চওড়া ও প্রয়োজন মতো লম্বা খন্ডে ভাগ করে ৬-৮ ইঞ্চি উঁচু করতে হবে। প্রতিটি খন্ডের দুপাশে ১০-১২ ইঞ্চি ফাঁকা জায়গা থাকা প্রয়োজন। বীজতলার চারদিকে দু থেকে আড়াই ফুট চওড়া সেচ বা জলনিকাশী নালা থাকা প্রয়োজন। জলদি জাতের সবজির জন্য শ্রাবণ মাসে বীজতলা তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে, বীজতলার ওপর ৪-৬ ফুট উঁচু দোচালা ঘর করে সাদা জল রং পলিথিন চাদরের ছাউনি দিতে হবে। এতে বৃষ্টির জল বাধা পাবে, অথচ সূর্যের আলো অবাধে বীজতলায় প্রবেশ করতে পারবে। চাষীরা সাধারণত নীচু ছাউনি দিয়ে থাকেন। এতে বাতাস চলাচল ব্যহত হয়ে ঢলে পড়া, গোড়া পচা ইত্যাদি রোগ হয় এবং চারা রুগ্ন হয়ে যায়। তাই, ছাউনি সবসময় উঁচু হওয়া প্রয়োজন। ধারের খুঁটির উচ্চতা ৪ ফুট এবং মাঝের খুঁটির উচ্চতা ৬ ফুট হওয়াই ভালো। খুঁটি থেকে বীজতলা ২-৩ ফুট ভিতরে করলে বৃষ্টির জলের ছাঁট বীজতলায় লাগবে না। বীজতলা ভালো করে শোধন করে, মাটি সমান করে, ৪ ইঞ্চি অন্তর আড়াআড়ি ভাবে আধ ইঞ্চি গভীর নালা টানতে হবে এবং ওই নালার ভিতর ১ ইঞ্চি অন্তর একটি করে বীজ দিয়ে নরম মাটি চাপা দিতে হবে এবং ঝারির জলে হালকা করে ভিজিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে বীজতলার ওপর ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধিত খড় চাপা দিতে হবে। লিটার প্রতি ১০ গ্রাম TV/PF-এর জলীয় দ্রবণে খড় কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পরে জল ঝরিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিলে শোধিত খড় পাওয়া যাবে। চারা বের হওয়া শুরু হলেই খড় সরিয়ে দিতে হবে। ট্যমাটো, লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, বেগুন ইত্যাদিতে পাতা কোঁকড়ানো, মোজাইক ইত্যাদি ভাইরাস রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে

পারলে ফসলের ক্ষতি অনেকাংশে কমানো যায়। ওইসব চারার বীজতলার চারদিকে মশারিরর জাল দিয়ে ঘিরে দিলে সাদা মাছি প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, চারাগাছ ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হতে পারে না। যেসব ক্ষেত্রে যথাসময়ে বীজতলা তৈরি করা সম্ভব হয় না বা খুব অল্প পরিমাণ চারার প্রয়োজন হয়, সেখানে চৌকোনা কাঠের বাক্সে অথবা পলিথিন প্যাকেটে চারা তৈরি করা যায়।

চৌকোনা কাঠের বাক্সে চারা তৈরি

অল্প জমির জন্য এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী। ২ ফুট × ২ ফুট × ৬ ইঞ্চি কাঠের বাক্সে মাটি ও জৈব সারের মিশ্রণ (প্রয়োজনে বালিও মেশাতে হবে) শোধন করে ৪ ইঞ্চি পুরু করে ভরে ভালো করে চেপে দিতে হবে এবং আগের মতো পদ্ধতিতে বীজ বুনে খবরের কাগজ বা চট দিয়ে বাক্স ঢেকে দিতে হবে। ৪-৫ দিন পরে ঢাকা খুলে ঝারির সাহায্যে নিয়মিত জলসেচ দিতে হবে। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল ঝড়বৃষ্টির সময় বাক্স ঘরে তুলে আনা যায়, আবার অন্য সময় খোলা আকাশের নীচে রাখা যায়। এছাড়া, প্রাথমিক বীজতলা হিসাবে কাঠের বাক্সে ঘন করে চারা তৈরি করে ৭-১০ দিন বয়সের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে, আরও বেশি শক্তপোক্ত ও সজীব চারা পাওয়া যায় এবং এই চারা থেকে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

পলিথিন প্যাকেটে চারা তৈরি

অসময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে বা মাটিতে জো না পাওয়া গেলে, এই পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা উচিত। খরচ এবং পরিশ্রম বেশি হলেও যথাসময়ে ফসল তোলা নিশ্চিত করতে এই পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগী। মাটি, জৈবসার ও প্রয়োজনে বালির মিশ্রণ শোধন করে ৪ ইঞ্চি মাপের পলিথিন প্যাকেটে ভরা হয় এবং প্রতি প্যাকেটে দু'টি করে বীজ বোনা হয়। চারা তৈরি হয়ে গেলে, পলিথিন প্যাকেট ব্লেড দিয়ে কেটে চারা জমিতে রোওয়া হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে চারার গোড়ায় মাটি ভেঙে না যায় বা চারার গোড়া নড়ে না যায়। জমিতে জো না থাকলে ৪০-৪৫ দিন বয়স পর্যন্ত চারা পলিথিন প্যাকেটে রাখা যেতে পারে।

চারা রোওয়ার ৭ দিন আগে বীজতলায় পর্যায়ক্রমে একবার সর্বাঙ্গবাহী ও একবার স্পর্শজনিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করা উচিত। সবজির ধরন ও জাত ভেদে ২১-৩০ দিনের চারা ৪-৬ পাতা অবস্থায় মূল জমিতে রোওয়া হয়।

লঙ্কা

সারা পশ্চিমবঙ্গেই লঙ্কা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সারা ভারতে যত লঙ্কা উৎপন্ন হয় তার তিন-চতুর্থাংশ আসে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু থেকে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলি হল মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং পাঞ্জাব। পশ্চিমবঙ্গে লঙ্কা চাষের এলাকা নগণ্য এবং এখানে মূলত লঙ্কা চাষ হয় কাঁচালঙ্কা উৎপাদনের জন্য। কিন্তু সবচেয়ে বেশি লঙ্কা ব্যবহৃত হয় শুকনো লঙ্কা হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ু থাকা সত্ত্বেও লঙ্কা চাষ সেভাবে জনপ্রিয় হয়নি আজও।

মাটি ও জলবায়ু

জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি, উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া, ২০-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা, বছরে ৬০-১২০ সেমি বৃষ্টিপাত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক লঙ্কা চাষের উপযোগী। লঙ্কাগাছ দীর্ঘকালীন কুয়াশা ও খুব কম তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। খুব বেশি বৃষ্টি ও অনিয়মিত তাপমাত্রায় ফুল, ফল ও পাতা ঝরে পড়তে পারে এবং গাছ পচে যেতে পারে।

সময় ও জাত নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে মাঘ-ফাল্গুন এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে লঙ্কাগাছ লাগানো হয়। তবে, উপযুক্ত পরিবেশে সারা বছর লঙ্কা চাষ করা যায়। প্রধানত দু'ধরনের লঙ্কা চাষ করতে দেখা যায় ঃ (ক) লম্বা ও ঝাঁঝালো জাতীয় যা মশলাপাতি ও আচার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, পুসা জ্বালা, এন. পি. ৪৬-এ, পন্থ সি-১, ভাগ্যলক্ষী, অন্ধ্র জ্যোতি, সিন্দুর ইত্যাদি এবং (খ) ঝাঁঝহীন বা কম ঝাঁঝালো জাতীয় বিভিন্ন আকারের শাঁসযুক্ত 'বেল' আকৃতির লঙ্কা। একে 'বেল পিপার' বা সুইট পিপার বা 'সিমলা মির্চা' (Capsicum) ও বলে। উন্নত জাতগুলি হল, ক্যালিফোর্ণিয়া ওয়ান্ডার, ইন্দ্রা, চাইনিজ জায়েন্ট ইত্যাদি। সুন্দরবন এলাকায় যেসব জাতের লঙ্কা চাষ হয় সেগুলো হল বেলডাঙা, সাগর সুন্দরী, বুলেট, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

দূরত্ব ও বীজের হার

রোয়া পদ্ধতিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি. এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৪৫-৬০ সেমি। রোয়ার জন্য বিঘাপ্রতি বীজ লাগে ২০০-২৫০ গ্রাম এবং বোনার জন্য বিঘা প্রতি বীজ লাগে ৪০০-৬০০ গ্রাম।

বীজতলা তৈরী

খোলামেলা উঁচু জায়গা যেখানে সারাদিন রোদ পায়, জল দাঁড়ায় না অথচ সেচের সুবিধা আছে, এরকম জমিই বীজতলার পক্ষে উপযুক্ত। জৈব পদার্থ যুক্ত দোআঁশ মাটিতে চারা ভাল হয়। বীজ বোনার ১০-১৫ দিন আগে বীজতলার মাটি ২০-২৫ সেমি. গভীর করে খুঁড়ে রোদ খাওয়াতে হবে এবং ঝুরঝুরে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে গোবর সার বা কম্পোস্ট সার মেশাতে হবে। ১ বিঘা জমির জন্য ৪ ফুট চওড়া ও ২৫ ফুট লম্বা দু'টি বীজতলার প্রয়োজন। মাটিতে ৩০ কেজি কম্পোস্ট, ২০০ গ্রাম T.H., ৫-৬ সপ্তাহে চারা রোওয়ার উপযোগী হবে। বিকেলের দিকে পড়ন্ত রোদে চারা রোওয়া উচিত। বীজবাহিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতি কেজি বীজে ১০গ্রাম TV/TH/PF দিয়ে বীজ বোনার ৬ ঘন্টা আগে শোধন করে নিতে হবে।

চারা রোপণ ও সার প্রয়োগ

মূল জমিতে ৫-৬ বার চাষ দিয়ে মাটি ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে এবং চারা রোওয়ার সাত দিন আগে বিঘাপ্রতি ২ টন গোবর সার বা কম্পোস্ট সার, ২ কেজি NPK জীবাণু সার প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সার হিসাবে ১ কেজি খইল/উন্নত জৈব সার দিতে হবে প্রথমবার গোড়ায় মাটি দেওয়ার সময় এবং একই পরিমাণ দিতে হবে দ্বিতীয়বার গোড়া বাঁধার সময়। বোনা চাষের জন্য বীজ ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর বোনা হয় এবং বোনার আগে জমি তৈরির সময় বিঘা প্রতি ২ কেজি NPK জীবাণু সার প্রয়োগ করা হয়।

পরিচর্যা

সুস্থ সবল গাছ এবং অধিক ফলন পাওয়ার জন্য সযত্ন পরিচর্যা অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত গোড়ায় মাটি দেওয়া, জলসেচ, আগাছা দমন এবং প্রয়োজনে জৈব রোগ ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। অধিক ফলন পেতে ফুল আসার আগে গাছের ডগা ছেঁটে দিতে হবে যাতে ডালপালা বেশি ছাড়ে এবং বেশি ফুল ও ফল ধরে। বোনা চাষের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত ঘন এলাকা থেকে চারা তুলে হালকা করে দিতে হবে এবং যে এলাকায় চারা কম হয়েছে, সেখানে মধ্যে মধ্যে নতুন চারা লাগিয়ে দিতে হবে। চাপান সার দেওয়ার আগে নিড়ানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করতে হবে এবং গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। আগাছা মুক্ত পরিচ্ছন্ন জমিতে রোগপোকার আক্রমণ কম হয় এবং ফলন বেশি পাওয়া যায়।

ফসল তোলা ও ফলন

চারা রোওয়ার দু থেকে আড়াই মাস পর প্রথম ফলন পাওয়া যায় এবং পরবর্তী ৩ মাস পর্যন্ত ৭ দিন অন্তর ফসল তোলা যায়। কাঁচালঙ্কার জন্য পরিপুষ্ট সবুজ লঙ্কা এবং পাকা লঙ্কার জন্য পরিপক্ক লাল লঙ্কা তোলা হয়। আচার তৈরির জন্য কাঁচা ও পাকা দু'রকম লঙ্কাই কাজে লাগে। বিঘা প্রতি কাঁচালঙ্কার গড় ফলন ৪০-৮০ কুইন্টাল এবং শুকনো লঙ্কার ফলন ১০-২০ কুইন্টাল।

শস্য রক্ষা

আশানুরূপ ফলন পেতে গেলে রোগপোকার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য নিয়মিত নিরীক্ষণ-এর মাধ্যমে, প্রয়োজনে নিমপাতা, জৈব সার ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। নানারকম রোগপোকার আক্রমণে লঙ্কার ফলন কম হয়। প্রধান প্রধান রোগ ও পোকামাকড়গুলি হল :

চিরুণি পোকা বা চোষী পোকা (Thrips), জাবপোকা (Aphids), শোষক পোকা (Jassids), সাদা মাছি (White fly), দয়ে পোকা (Mealy bug), ফল ছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি। রসশোষনকারী পোকাগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং ফল ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য নিমজাত বা জৈব কীটনাশক দেওয়া যেতে পারে।

বেগুন (Brinjal)

উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ এবং সেচ ও নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত ঈষৎ অম্ল থেকে প্রশম যে কোনও ধরনের মাটিতে এবং উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে বেগুন চাষ করা যায়।

জাত ঃ শীতকালীন-ভাঙ্গড়, মুক্তকেশী, কৃষ্ণনগর, চিত্রা, পুসাক্রান্তি ইত্যাদি

গ্রীষ্মকালীন—পুসা ক্রান্তি, পুসা ক্লাস্টার, নুরকি, মাকড়া ইত্যাদি

বর্ষাকালীন—মাকড়া, পুসা পার্পল লং, কাবেরি, রাজপুর সিলেকসন ইত্যাদি

বীজের হার ঃ ৬০-৭৫ গ্রাম

দূরত্ব ঃ ৩ ফুট × ২ ফুট

সারপ্রয়োগ ঃ জৈব সার ১.৫ টন, জীবাণু সার ২ কেজি করে পি. এস.বি ও অ্যাজোটোব্যাক্টর। রাসায়নিক ২০:১৩:১৩ কেজি N.P.K. প্রতি বিঘাতে। মূলসার হিসাবে জৈব ও জীবাণুসার পুরো মাত্রায় পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। বাকী নাইঃ ও পটাশ দুই ভাগে ভাগ করে চাপান হিসাবে চারা রোপনের ৩০ ও ৪৫ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে।

ফলন ঃ ২০-২২ কুইন্টাল/বিঘা।

শস্য সুরক্ষা ঃ বেগুন গাছে যেসব কীটশত্রুর আক্রমণ বেশি হতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল সাদামাছি, শোষক পোকা, লেস উইং বাগ, মাকড় এবং ডগা ও ফল ছিত্রকারী পোকা। রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছত্রাকঘটিত পাতায় দাগ, ঝিমানো, গোড়াপচা, কান্ড শুকানো, ফল পচা ইত্যাদি এবং জীবাণুঘটিত ঝিমানো রোগ।

সাদা মাছি, শোষকপোকা এবং লেস উইং বাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধ স্প্রে করতে হবে সকালের দিকে এবং পাতার নীচে। মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ফুল আসার আগে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য চারা বসানোর সময় গাছের গোড়ায় গাছ প্রতি ৫ গ্রাম এবং গোড়ায় মাটি ধরানোর সময় ১০-১৫ দিন অন্তর ১০,০০০ পি.পি.এম ক্ষমতা সম্পন্ন নিমতেল (২ মিলি/লি) স্প্রে করতে হবে বিকালের দিকে এবং ফেরোমোন ফাঁদ পেতে

পোকার আক্রমনের মাত্রার উপর নজর রাখতে হবে। ছত্রাকঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বীজশোধন, বীজ তথা চারা ও জমির মাটি শোধন করতে হবে এবং আক্রান্ত গাছে নিমজাব/জৈব ওষুধ ইত্যাদি ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জীবাণু ঘটিত ঝিমানো রোগের জন্য জল সেচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

হাইব্রীড টমেটো

বাঙালীর খাদ্যতালিকায় টমেটোর স্থান উপরের সারিতেই। পুষ্টি গুণেও টমেটোর জুড়ি মেলা ভার। নানারকম সব্জীতে, স্যালাড হিসাবে, স্যুপ তৈরিতে, সস হিসাবে ও নানাভাবে টমেটো মানুষের রসনায় পরিতৃপ্তি করে থাকে। আগে পাওয়া যেত দেশি টমেটো—নরম, অধিক বীজযুক্ত, অধিক টকস্বাদযুক্ত। পাকলে বেশি দিন ঘরে রাখা যায় না। দূরের বাজারে নিয়ে যাওয়া যায় না। বছরের নির্দিষ্ট সময়েই কেবলমাত্র চাষ করা যায়। কিন্তু হাইব্রীড তথা সংকর জাতের টমেটো চাষের প্রচলন হওয়ার সাথে সাথে সব্জী চাষ ও ব্যবহারের জগতে এক নবজাগরণ এসেছে। জাত ভেদে প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়, ক্রেতা বা ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নানা আকার ও আকৃতির টমেটো ফলে, শক্ত ও দূর বাজারে বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী, দীর্ঘদিন ঘরে রাখা যায়, শাঁস বেশি ও বীজ কম, মিষ্টতা বেশি, সস তৈরির উপযোগী এবং সর্বোপরি এর ফলন দেশি টমেটোর তুলনায় অতি মাত্রায় বেশি। তাই, হাইব্রীড টমেটো চাষ করে চাষী দু'পয়সা ঘরে তুলতে পারে।

জলবায়ু ও মাটি

জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত বেলে দোঁয়াশ মাটি টমেটো চাষের পক্ষে আদর্শ। তবে, বেলে থেকে এঁটেল সবরকম মাটিতেই টমেটো চাষ করা যায়, মাটি অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মাটির অম্লত্বমান ৫ থেকে ৭ এর মধ্যে হলে সেই মাটিতে টমেটো চাষ করা যাবে। অতিরিক্ত অম্ল মাটিতে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করে এবং ক্ষার মাটিতে জিপসাম প্রয়োগ করে মাটির অম্লত্ব সংশোধন করে টমেটো চাষ করা উচিৎ।

উন্নত জাত ও বোনার সময়

জাতভেদে হাইব্রীড টমেটো প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়। জলদি জাতের টমেটো যেমন, রজনী, রেশমী, ফায়ার গ্লো, ফায়ার ডান্স, সদাবাহার ইত্যাদি বীজ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেই বোনা চলে। তবে, বর্ষাকালে বীজ বোনার জন্য বীজতলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে ও উঁচু মাদা করে চারা লাগাতে হবে। জলদি জাতের টমেটো জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু জমি ও বেলে দোঁয়াশ মাটিতে চাষ করা উচিৎ। প্রধান সময়ের টমেটোর উন্নত জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, অবিনাশ-২, মোতি, হীরা, ত্রিশুল, রেখা, নবীন, রকি, হাইব্রীড ৮৮-৩ ইত্যাদি এবং নাবি জাতগুলির মধ্যে নবীন, নাথ-৮৮, হাইব্রীড ৮৮-২, রোহিনী ইত্যাদি প্রধান। হাইব্রীড টমেটোর মধ্যে কয়েকটি জাতের উচ্চতা ৩-৪ ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আবার কয়েকটি জাত ৬-৭ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

বীজের হার ও চারা তৈরি

১ বিঘা জমির জন্য ২০-২৫ গ্রাম বীজ লাগে। চারা তৈরির জন্য প্রথমেই বীজ শোধন করে নেওয়া উচিৎ এবং 'শীতকালীন সব্জীর চারা তৈরী'র পদ্ধতি মেনে চারা তৈরি করা উচিৎ। শুকনো বীজ শোধন করার জন্য কেজি প্রতি ১০ গ্রাম হারে TV/PF মিশিয়ে অথবা ৫ গ্রাম হারে জলে গুলে ব্যবহার করতে হবে। শুকনো বীজের ক্ষেত্রে বীজ ও ওষুধ ১০-১৫ মিনিট মুখবন্ধ পাত্রে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। ১৫ দিনের চারাতে ১% তরল সার স্প্রে করলে চারার চেহারা ও বৃদ্ধি ভালো হবে। শীতকালে নার্সারী বেডের উপর খড় বা খেজুর পাতা চাপা দেওয়ার প্রয়োজন হলে তা ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে নিতে হবে (৫ গ্রাম TV/PF/লি. জলে)। ২৫-৩৫ দিন বয়সী চারা মূল জমিতে বসানো যাবে।

চারা লাগানো ও সার প্রয়োগ

জাতভেদে এবং রোয়ার সময় ভেদে ২ ফুট × ২ ফুট, ২ ফুট ×১.৫ ফুট, ২.৫ ফুট × ২ ফুট ইত্যাদি দূরত্বে চারা লাগানো হয়। চারা লাগানোর সময় বা ৭-১০ দিন পরে প্রতি চারার গোড়ায় ৫ গ্রাম জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করতে হত। বিকালের নরম রোদে বা রোদ কমে যাওয়ার পর চারা লাগালে চারা কম মরে ও তাড়াতাড়ি মাটি ধরে নেয়। জমি তৈরীর সময়, চারা লাগানোর ২০-২৫ দিন আগে বিঘাপ্রতি ৩০-৩৫ কুইন্টাল জৈবসার অথবা ৫০-৬০ কেজি নিম খইল/উন্নত জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং চারা লাগানোর ৪-৫ দিন আগে বা পরে মূল সার হিসাবে বিঘা প্রতি ২ কেজি জীবাণু সার রূপে দেওয়া উচিৎ। সোনা সারে ক্যালসিয়াম ও সুপার ফসফেটএ সালফার থাকায় টমেটো চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। চাপান সার হিসাবে রোয়ার ৩ সপ্তাহ ও ৬-৭ সপ্তাহ পরে গোড়ায় মাটি ধরানো ও নিড়াণি দেওয়ার সময় প্রতিবারে ৬ কেজি করে নাইট্রোজেন ও ৩ কেজি করে পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে ২% ইউরিয়া এবং অনুখাদ্য মিশ্রণ সার স্প্রে করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর হালকা করে সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ও জলসেচ

পরিচ্ছন্ন চাষ, নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করা, সময়ে চাপান সার ও সেচ প্রয়োগ, গোড়ায় মাটি দেওয়া, গাছে লাঠির ঠেক (Support of stake) দেওয়া, রোগপোকার আক্রমণের প্রতি সজাগ নজর রাখা ইত্যাদি পরিচর্যার অন্তর্ভুক্ত। টমেটো চাষে খুব বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না। ঘন ঘন ও অতিরিক্ত সেচে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, রোগপোকার আক্রমণ বেশি হয় ও ফলন কম হয়। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটি শুকিয়ে না যায় এমন অবস্থায় সেচ দেওয়া ও জল দাঁড়িয়ে যায় এমন ভাবে সেচ না দেওয়া হয়।

ফসল সুরক্ষা

টমেটো গাছ জাবপোকা, সাদামাছি, ফলছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি কীটশত্রু এবং চারা ঢলেপড়া, জলদি ও নাবি ধ্বসা, গোড়াপচা, ঝিমিয়ে পড়া (Wilt), পাতা কোঁকড়ানো, সাহেব ইত্যাদি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। কুয়াশা, ভ্যাপসা গরম ও মেঘলা আবহাওয়ায় রোগপোকার প্রার্দুভাব বেশি হয়। নিয়মিত ক্ষেত নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ক্ষতির পরিমাণ অর্থনৈতিক চরমসীমা অতিক্রম করলে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিমজাত জৈব কীট-নাশক প্রয়োগ করা উচিৎ। টমেটো প্রায়ই সরাসরি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। নিম জাতীয়, জীবাণু বা তামাক জাতীয় জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করলে ভালো হয়। ফল পাকার সময় রাসায়নিক প্রয়োগ সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

ফলন

বিঘা প্রতি ৯০-১২০ কুইন্টাল ফলন হতে পারে।

হাইব্রীড বাঁধাকপি

বাঁধাকপি বাঙালীর একটি অতিপ্রিয় খাদ্য। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কেবলমাত্র শীতকালে চাষ হতো বলে অনেকে অন্য মরশুমে খাওয়ার জন্য বাঁধাকপি কেটে শুকিয়ে ঘরে রাখতেন। এতটাই জনপ্রিয় সব্জী এই বাঁধাকপি। উপাদেয় স্বাদের পাশাপাশি খাদ্যগুণেও এটি অনেক সব্জীকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থের পাশাপাশি বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' বর্তমান। হাইব্রীড বা সংকর জাতের বাঁধাকপি চাষের প্রচলন হওয়ার পর থেকে এখন প্রায় সারাবছরই টাটকা বাঁধাকপি পাওয়া যায়। বর্তমানে জলদি ও নাবি জাতের অনেক রকম বাঁধাকপি পাওয়া যায়, যেগুলি ৩৫-৩৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও চাষ করা চলে। হাইব্রীড বাঁধাকপির বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

মাটি ও জলবায়ু

জল দাঁড়ায়না এমন জমি এবং বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটি, বাঁধাকপি চাষের পক্ষে আদর্শ। অম্লত্বের মান ৬.০-৮.০ বাঁধাকপি চাষের উপযোগী। অত্যধিক অম্ল মাটিতে এই ফসল ভালো হয় না। সাধারণভাবে ২০-২৫° সেলসিয়াস উষ্ণতা বাঁধাকপি চাষের পক্ষে আদর্শ। তবে, অধিক উষ্ণতা সহনশীল জাতের বাঁধাকপি ৩৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও চাষ করা চলে।

বীজের হার ও দূরত্ব

হাইব্রীড বাঁধাকপি চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ৩৫-৪০ গ্রাম বীজ লাগে। বড় মাথা পাওয়ার জন্য ২ ফুট × ১.৫ ফুট এবং ছোট মাথা পাওয়ার জন্য ১.৫ ফুট × ১.৫ ফুট দূরত্বে চারা লাগানো উচিৎ। জলদি ও নাবি চাষে কখনো কখনো ১.৫ ফুট × ১ ফুট দূরত্বেও চারা লাগানো হয়। ঘন করে চারা লাগালে মাথা ছোট হয় এবং তাড়াতাড়ি ফসল তোলার উপযোগী হয়।

উন্নত জাত

বর্তমানে বাজারে অসংখ্য জাতের হাইব্রীড বাঁধাকপির বীজ পাওয়া যায়। প্রতিনিয়ত দেশি ও বিদেশি বাণিজ্যিক সংস্থা নানা জাতের বীজ বাজারে এনে চলেছে। সবগুলি যে স্থানীয় পরিবেশে ভালো ফল দেবে তা কিন্তু নয়। নতুন কোনও জাতের চাষ করতে গেলে প্রথমে অল্প জমিতে চাষ করে দেখে নেওয়া উচিৎ। বর্তমানে যেসব জাতের বাঁধাকপি বেশি চাষ হচ্ছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

গ্রীণ এক্সপ্রেস, রেয়ার বল, মাস্টার এক্সপ্রেস, কৃষ্ণা (হাইব্রীড-৬), হরিবাণী গোল, ট্রপিক্যাল, হাইব্রীড-৩, কে. কে. ক্রশ ইত্যাদি।

চারা তৈরী ও চারা রোপন

বাঁধাকপির চারা তৈরির জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিৎ। শীতকালীন চারা তৈরির পদ্ধতি মেনে যত্ন সহকারে চারা তৈরি করা উচিৎ। ১ বিঘা জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় চারা পাওয়া যাবে ৩ ফুট × ২৫ ফুট মাপের ২ টি নার্সারী বেড থেকে। যথাযথভাবে বীজ ও বীজতলা শোধন করে এবং বীজতলায় ২ কেজি উন্নত জৈব সার ও ২৫ গ্রাঃ T.V. প্রয়োগ করার পর হাল্কা করে জলের সেচ দিয়ে ১-২ দিন পরে ৪ ইঞ্চি × ২ ইঞ্চি দূরত্বে বীজ বোনা উচিৎ। বীজ যাতে মাটির $^{১}/_{২}$ ইঞ্চি গভীরে পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে। মোটামুটি ৪ সপ্তাহে চারা রোয়ার উপযোগী হয়। বীজ বোনার ১৫ দিন ও ২১ দিন পর ৫ গ্রাম/লি. হিসাবে T.V বা P.F জাতীয় ছত্রাকনাশক ও ২১ দিন পর নিম জাতীয় কীটনাশক স্প্রে করা উচিৎ। যথাসময়ে জৈব ও জীবাণু সার প্রয়োগ করে ভালো করে জমির মাটি তৈরি করার পর চারা লাগানোর আগের দিন হালকা করে সেচ দেওয়া প্রয়োজন এবং জলদি জাতের চারা লাগানোর জন্য জমিতে সামান্য উঁচু করে ভেলি তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে বৃষ্টির জল গাছের গোড়ায় জমতে না পারে। বিকালের নরম রোদে জমিতে চারা রোপন করতে হবে। প্রথম ৩-৪ দিন শালপাতার ঠোঙা দিয়ে চারা ঢেকে দেওয়া উচিৎ।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ

চারা রোয়ার কমপক্ষে ১৫-২০ দিন আগে বিঘা প্রতি ২৫-৩০ কুইন্টাল জৈবসার প্রয়োগ করে, জমিতে চাষ দিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং শেষ চাষের আগে বিঘাপ্রতি ২ কেজি এন. পি. কে জীবাণু সার প্রয়োগ করতে হবে। ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে, আগাছা মুক্ত করতে হবে ও সমান করে নিতে হবে। চারা লাগানোর আগে হালকা করে সেচ দিতে হবে।

চারা লাগানোর ৩ সপ্তাহ ও ৫ সপ্তাহ পরে চারার গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে হবে, আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে ও ২৫ কেজি উন্নত জৈব সার, ১১ কেজি জীবাণু সার N. P.K চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পরে সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা ও শস্য সুরক্ষা

বাঁধাকপি চাষে পরিচর্যা ও শস্য সুরক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত জমিতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আগাছা নিয়ন্ত্রণ, যথাসময়ে চাপান সার প্রয়োগ, জলসেচ, রোগপোকার আক্রমণ ইত্যাদির প্রতি সযত্ন নজর রেখে সময় মতো ব্যবস্থা নিতে হবে। জমির মাটি খুব বেশি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, কম করে জলসেচ দিতে হবে এবং জল যাতে না দাঁড়িয়ে যায় তার জন্য নিকাশী ব্যবস্থার প্রতি নজর দিতে হবে। বাঁধাকপি মাথা ছিদ্রকারী, জাবপোকা ও পাতা খেকো পোকা এবং পাতায় দাগ ধরা, একপেশে, চারা ঢলে পড়া, গোড়া পচা, বোরন ও মলিবডিনাম অনুখাদ্যের অভাব ইত্যাদি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী সময়মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফলন

বিঘা প্রতি গড়ে ৭০-৮০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যেতে পারে।

হাইব্রিড ভেণ্ডী

গ্রীষ্মকালীন সবজির মধ্যে ভেণ্ডী বা ঢ্যাঁড়স অন্যতম প্রিয় সবজি। হাইব্রিড বা সংকর জাতের ভেন্ডী গ্রীষ্মকাল ছাড়াও প্রায় সারাবছরই চাষ করা চলে। কারণ, ভেণ্ডী চাষের প্রধান সমস্যা, 'সাহেব রোগ' বা মোজেইক রোগ অধিকাংশ সংকর জাতের ভেণ্ডীতেই হয় না। তরকারি, ভাজা, ঝোল, চাটনি, পকোড়া সহ নানা উপায়ে ভেণ্ডী রান্না করে খাওয়া যায়। কৌটোয় সংরক্ষিত খাদ্য হিসাবেও ভেণ্ডী ব্যবহৃত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন এ. বি ও সি এবং আয়োডিন পাওয়া যায়। আয়োডিন থাকায় নিয়মিত ভেণ্ডী খাওয়ার ফলে গলগণ্ড রোগের সম্ভাবনা কমে যায়। মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্যের প্রতিরোধে ভেণ্ডী বেশ উপকারী। এছাড়া, ভেণ্ডী গাছের আঁশ কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু ও মাটি

দীর্ঘস্থায়ী উষ্ণ আবহাওয়া ভেণ্ডী চাষের পক্ষে অনুকূল। এইজন্য, গ্রীষ্মকালেই অধিক পরিমাণে ঢ্যাঁড়স চাষ হয়। দীর্ঘস্থায়ী ঠান্ডা আবহাওয়া ও তুষারপাতে ঢ্যাঁড়স গাছ বাঁচে না। ২০° সেলসিয়াস-এর কম উষ্ণতায় ঢ্যাঁড়স বীজ অঙ্কুরিত হয় না। গ্রীষ্ম ছাড়াও বর্ষাকালে, এমনকী বৃষ্টিবহুল অঞ্চলেও হাইব্রিড ভেণ্ডী চাষ করা যায়। জৈব পদার্থ যুক্ত হালকা দোআঁশ মাটি ভেণ্ডী চাষের পক্ষে আদর্শ হলেও প্রায় সবরকম মাটিতেই এর চাষ করা যায়। সামান্য অম্লত্ব সহনশীল হলেও ক্ষার বা নোনামাটিতে ঢ্যাঁড়স ভালো হয় না। ঢ্যাঁড়স চাষের উপযুক্ত অম্লত্ব হল ৬-৬.৮। ফাল্গুন মাস থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত হাইব্রিড ভেণ্ডীর বীজ বোনা যায়।

বীজের হার ও বীজ বোনা

দেশি বীজ লাগবে বিঘা প্রতি ১-২ কেজি এবং হাইব্রিড বীজ বিঘা প্রতি ৫০০-৭৫০ গ্রাম। গ্রীষ্মকালে গাছের বৃদ্ধি কম। সেজন্য অপেক্ষাকৃত বেশি বীজ লাগে। গ্রীষ্মকালে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি. (২ ফুট) এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি. (১.৫ ফুট)। বর্ষাকালে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি (২.৫ ফুট) এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি. থেকে ৬০ সেমি. (১.৫-২ ফুট)। গভীরভাবে লাঙল

দিয়ে ৪-৫ বার চাষ দেওয়ার পর বিঘা প্রতি ৪ টন গোবর সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং ১৫ দিন পর শেষ চাষের আগে বিঘাপ্রতি ১০০ কেজি উন্নত জৈব সার/খইল ও ২ কেজি N.P.K জীবাণু সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে মই দিয়ে জমি সমান করতে হবে। এর ৭ দিন পরে দূরত্ব অনুযায়ী সারিতে ১টি বা ২টি করে বীজ ১ সেমি. গভীরে বসাতে হবে। বীজ বসানোর আগে ১২ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরোদগম ভালো হবে এবং তাড়াতাড়ি ও সুষমভাবে চারা বের হবে। ভেণ্ডী বীজ ১০ গ্রাম T.V বা P.F প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার পর হালকা সেচ দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমি খুব বেশি ভিজে না যায় বা খুব বেশি শুকিয়ে না যায়।

চাপান সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা

বীজ বোনার একমাস পরে বিঘা প্রতি ৫০ কেজি উন্নত জৈব ও ১০ কেজি হাড় গুঁড়ো সার প্রয়োগ করে চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে গোড়া বেঁধে দিতে হবে ও সেচ দিতে হবে। প্রথম চাপান সার প্রয়োগের তিন সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় চাপান হিসাবে পুনরায় ৫০ কেজি জৈব ও ১ কেজি Bio N PK প্রয়োগ করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়াণি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। প্রয়োজন মতো ৭-১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। বীজ বোনার ৫০-৬০ দিনের মাথায় ফসল তোলা শুরু হয়। প্রতি ৩/৪ দিন অন্তর ছুরি দিয়ে বোঁটা কেটে ভেণ্ডী তোলা উচিত। রাত্রের দিকে ফলের বৃদ্ধি ভালো হয়। তাই, সকালে ফসল তোলা অধিক লাভজনক। সযত্ন ও পরিচ্ছন্ন চাষ করা সত্ত্বেও নানা রোগপোকার আক্রমণ দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে, প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল সুরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফলন

বিঘা প্রতি হাইব্রিড ভেণ্ডীর গড় ফলন ২৫-৩০ কুইন্টাল। হাইব্রিড ভেণ্ডীর অধিকাংশ জাতের বৈশিষ্ট্য হল, গাছ লম্বা হয়ে যায়। কখনও কখনও ৮-১০ ফুট লম্বা গাছও দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে, মাটি থেকে ১-১.৫ ফুট উঁচু থেকে গাছ কেটে বিঘা প্রতি ৫ কেজি হারে উন্নত জৈব সার হিসাবে প্রয়োগ করে সেচ দিলে নতুন ডালপালা বেরিয়ে অধিক ফলন দেয়।

উন্নত জাত

বর্ষা, নং-৭, মাহিকো-১২, ইমপ্রুভড বিজয়, নাথশোভা-১১০, অমর, অজয়-২, শ্যামলী, গ্রীন বেস্ট (সাকাতা) ইত্যাদি। দেশি জাতের মধ্যে পার্বণী ক্রান্তি ও সাতশিরা কিছু পরিমাণে সাহেব রোগ সহনক্ষম। তবে, বর্ষাকালের জন্য হাইব্রিড জাতের ভেণ্ডী চাষ করাই উচিত।

ভেণ্ডীর রোগপোকা

বেশ কয়েকটি রোগপোকা ভেণ্ডীর ফসল আক্রমণ করে ক্ষতি করে।

রোগ

ক) হলুদ শিরা মোজেইক বা সাহেব রোগ

ভেণ্ডী চাষের প্রধান সমস্যা হলো এই সাহেব রোগ। পাতার শিরা হলুদ ও বর্ণহীন হয়ে যায়, শিরা-উপশিরাগুলি মোটা হয়ে যায় এবং কখনও কখনও শিরা-মধ্যবর্তী অংশও হলুদ হয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় এবং পাতাগুলো হলুদ ছাপ ছাপ দেখায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। ফল ছোটো ছোটো, ফ্যাকাসে রঙের বিকৃত আকার

লাভ করে। এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। নিমজাতীয় কীটনাশক বা জৈব কীটনাশক স্প্রে করলে সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। ফলন্ত গাছে তামাকপাতা সাবান জল মিশ্রণ স্প্রে করে সাদা মাছির প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

খ) ঝিমিয়ে পড়া রোগ

ছত্রাকঘটিত এই রোগের আক্রমণে গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও বেঁটে হয়ে যায়, পাতা পুড়ে যায় ও গাছ ঝিমিয়ে পড়ে, অবশেষে মরে যায়। অনেক সময় গাছ সতেজ থাকে, কিন্তু অগ্রমুকুল এবং কচিফল শুকিয়ে যায়। খুব বাড়াবাড়ি হলে পুরো কাণ্ডই কালো হয়ে যায়। শস্যচক্র মেনে চাষ, রোগাক্রান্ত গাছের মূল সহ তুলে ফেলা, গ্রীষ্মকালে গভীর চাষ এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায়। এছাড়া, রোগের সম্ভাবনা দেখা দিলে ৪ গ্রাম প্রতিলিটার হিসাবে TV এবং ৪ গ্রাম PF জলে গুলে পর্যায়ক্রমে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

গ) পাতায় দাগ

পাতায় গোলগোল জলবসা দাগ দেখা যায়। দাগ ক্রমশ কালচে রং ধারণ করে, পাতা গুটিয়ে যায়, ঝিমিয়ে পড়ে এবং ঝুলে পড়ে। ছত্রাকঘটিত রোগ এটি। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝিমিয়ে পড়া রোগে যে ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সেই একই ওষুধ একই মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) নিমাটোড

আক্রান্ত গাছের শিকড়ে গাঁট গাঁট ফোলা অংশ দেখা যায়, গাছ ঝিমিয়ে পড়ে, বৃদ্ধি কমে যায় এবং ফলন হয় না। সরাসরি নিমাটোড নামক আণুবীক্ষণিক কৃমি জাতীয় জীবটিকে মেরে ফেলা প্রায় অসম্ভব। প্রতি বিঘায় ২.৫ কেজি P.L জমিতে প্রয়োগ করলে এই রোগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এছাড়া, আক্রান্ত জমিতে গাঁদা ফুলের চাষ করে এবং তিন বছর শস্যচক্রে ভেণ্ডীর চাষ না করে নিমাটোডের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব।

পোকা

ক) চোষী পোকা

অতি ক্ষুদ্র পোকা কচি পাতার রস শোষণ করে। ফলে, পাতাগুলি ক্রমশ বাদামি রং ধারণ করে কুঁকড়ে যায়। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে ও বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল আসার আগে পর্যন্ত নিম জাতীয় কীটনাশক প্রতিলিটার জলে ২ মিলিলিটার হারে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

খ) মাকড়

অতি ক্ষুদ্র হলুদ ও লাল মাকড় পাতার নিচে বাসা বাঁধে ও রস শোষণ করে গাছকে দুর্বল করে দেয়। আক্রান্ত পাতা হলুদাভ হয়ে নিচের দিকে কুঁকড়ে যায়, ফুল ও ফল ধরে না। আক্রান্ত গাছে ফুল আসার আগে জৈব কীটনাশক জলে গুলে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

গ) ফল ছিদ্রকারী পোকা

ছোটো ছোটো কীড়া ফল ছিদ্র করে ফলের মধ্যে বাস করে ও ফল খেয়ে নষ্ট করে। অনেক সময় কচি ডগা ছিদ্র করে ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। বিকালে B.T. ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

৫.৩ প্রধান প্রধান ফলের উন্নত চাষ পদ্ধতি

মানবদেহের অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণগুলির প্রধান আকর হ'ল বিভিন্ন রকমের ফল। কাঁচা বা সরাসরি খাওয়া হয় বলে ফলের মধ্যে বর্তমান প্রায় সবটা ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি মানব শরীরে কাজে লাগে। অধিকাংশ ফলই সহজ পাচ্য, খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু।

ফল চাষ লাভজনক

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফল জাতীয় খাদ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। চাহিদার তুলনায় ফলের যোগান কম তাই, প্রায় সবরকম ফলের দাম আজ আকাশ ছোঁয়া। আমাদের এখানে ফল চাষের প্রতি তেমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কোনদিনই। তাই, লাভজনক উপায়ে ফল চাষ করা হয়েছে বা হচ্ছে বিক্ষিপ্ত ভাবে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যত্ন সহকারে চাষ করলে ফল চাষ বা ফল বাগিচা থেকে অন্য অনেক অর্থকরী ফসল অপেক্ষা অনেক বেশি লাভ পাওয়া সম্ভব। লাভজনক উপায়ে ফলচাষ করতে গেলে যে বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে সেগুলি হ'ল ঃ

(১) জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু জমি ফল চাষের পক্ষে উপযুক্ত;

(২) চাষের প্রথম ৩-৪ বছর গাছ থেকে প্রায় কিছুই ফলন পাওয়া যাবে না (পেঁপে ও কলা বাদে)। ঐ সময় ফল বাগান থেকে অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে সব্জী, তৈলবীজ, ডালশস্য, গম জাতীয় তন্ডুল শস্য ইত্যাদি চাষ করা যাবে;

(৩) নিয়মিত আগাছা নিয়ন্ত্রণ, গোড়ার মাটি আলাগা করে দেওয়া, প্রয়োজনে জলসেচ দেওয়া, বছরে কমপক্ষে দুইবার জৈব ও জীবাণু সার প্রয়োগ করা, রোগপোকা আক্রমণের প্রতি সজাগ নজর রাখা—ইত্যাদির উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। বর্ষার আগে একবার ও বর্ষার পরে একবার গাছের গোড়ার চারদিকের মাটি আলগা করে দিয়ে সুপারিশ মতো জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সার প্রয়োগের পরপরই জল সেচ দিতে হবে।

(৪) উন্নত জাতের গাছ লাগাতে হবে এবং বাগিচাতে গাছগুলি চিহ্নিত করতে হবে।

খরচের মধ্যে প্রাথমিক ৩-৪ বছরে সব্জী বা অন্য ফসলের খরচ এবং বাগিচাতে লাগানোর জন্য 'মা' গাছ ক্রয়, গর্ত খোঁড়া, ঘেরা দেওয়া ইত্যাদির হিসাব ধরা হয়নি। তেমনই, আয়ের মধ্যে সাথী ফসল থেকে প্রাপ্ত আয় এবং 'মা' গাছ থেকে 'কলম' করে চারাগাছ বিক্রয়ের থেকে প্রাপ্ত আয় ধরা হয়নি। প্রথম প্রথম ফলন কম হবে। ফলে, আয় তথা লাভও কম হবে। কিন্তু গাছ লাগানোর ৭-৮ বছর পর থেকেই উপরোক্ত ফলন পাওয়া যাবে। গাছ লাগানোর ৭-৮ বছর পর থেকেই বর্ষার প্রারম্ভে প্রতি গাছ থেকে গড়ে ২৫টি করে কলম কাটা যাবে। এই হিসাবে এক একর জমি থেকে ২৫০টি গাছ ×২৫টি কলম ×৪.০০ = ২৫,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। কলম কাটার সরঞ্জাম, শ্রমিক ইত্যাদির খরচ বাদ দিয়েও কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা আয় হবে। অর্থাৎ, বাগিচা স্থাপনের প্রাথমিক খরচ এবং প্রথম ৪-৫ বছরের কম ফলনের ঘাটতি কলম বিক্রির প্রথম ১-২ বছরের আয় থেকেই উসুল হয়ে যাবে। পরবর্তী বছর থেকে নিয়মিত উচ্চ হারে লাভ ঘরে তোলা যাবে। আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, লিচু ইত্যাদির গাছ বড় হয়ে গেলে উচ্চ মূল্যের কাঠ পাওয়া যাবে।

আম (Mango)

ফলের 'রাজা' আম পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র জন্মে। তবে প্রাচীন ও নবীন পলিমাটি অঞ্চলে এর ফলন ভালো হয় ও আমের গুণমান ভালো হয়।

উন্নত জাত

গোলাপ খাস, বোম্বাই, হিমসাগর, কিষান ভোগ, ফজলি, ল্যাংড়া, আম্রপালি, মল্লিকা, লক্ষণভোগ ইত্যাদি।

চারা রোপন

বর্ষার আগে অর্থাৎ মে-জুন মাসে ৩০ ফুট ×৩০ ফুট দূরত্বে ৩ ফুট ×৩ ফুট ×৩ ফুট মাপের পিট বা গর্ত খুঁড়ে রাখতে হবে। আম্রপালি, মল্লিকা জাতীয় ছোট গাছের জন্য ঐ দূরত্ব হবে ১৮ ফুট × ১৮ ফুট। গর্তের মাটির সঙ্গে গাছ প্রতি সুপারিশ মতো সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে ১ মাস পর অর্থাৎ বর্ষা শুরু হ'লে ২ বছর বয়সি কলমের চারা বসাতে হবে।

সার প্রয়োগ

গর্তের মাটির সঙ্গে গাছ প্রতি ২৫ কেজি খামারের সার বা গোবর সার এবং ৫০০ গ্রাম হাঁড় গুড়ো প্রয়োগ করতে হবে। পিঁপড়ে, উঁই ইত্যাদির প্রার্দুভাব থাকলে ১ কেজি নিম খইল প্রয়োগ করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় বছরে বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে গাছ প্রতি ২৫ কেজি খামারের সার ও ৫০০ গ্রাম হাঁড় গুড়ো ও ১ কেজি খইল সমান দুই ভাগে ভাগ করে প্রয়োগ করতে হবে। ক্রমে বছর বছর ঐ সারের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং ফলন্ত পূর্ণবয়স্ক গাছে সুপারিশ মতো (১.০ : ০.৭৫ : ১.০ কেজি) হারে N.P.K. সার প্রয়োগ করতে হবে জৈব সার, জীবাণু সার ও হাঁড় গুড়ো প্রভৃতি দিয়ে।

পরিচর্যা ও জলসেচ

আম গাছের গোড়ায় ও আশেপাশে আগাছা যাতে না হতে পারে তার জন্য নিয়মিত নিড়ানি ও খুরপির সাহায্যে আগাছা মুক্ত করতে হবে ও গোড়ার মাটি আলগা করতে হবে। চারা লাগানোর পর থেকে প্রথম ৪-৫ বছর আমবাগানে বিভিন্ন ধরনের সব্জী, ফুল, তৈলবীজ, ডালশস্য ইত্যাদি চাষ করা যায় 'সাথীফসল' হিসাবে। চারাগাছে মাঝে মাঝে জলসেচ দিতে হবে, বিশেষত গ্রীষ্মকালে ও খরার মরশুমে নিয়মিত জলসেচ করা অত্যন্ত জরুরি। বড়গাছেও প্রয়োজনে জলসেচ দিতে হবে মাঝে মাঝে, বিশেষ করে আমগাছে মুকুল আসার পর থেকে ফল বড় হওয়া পর্যন্ত গাছের গোড়ার মাটি যেন বেশি শুকিয়ে না যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

শস্য সুরক্ষা

ফল গাছের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ফলন

১৬-১৮ কুইন্টাল। আম্রপালি, মল্লিকা জাতীয় প্রায় সব উন্নত জাতের আম গাছেই এক বছর বেশি ফলন হয়, আবার পরের বছর কম ফলন হয়। এই বৈশিষ্ট্য আমগাছের স্বাভাবিক জীনগত বৈশিষ্ট্য।

কলা (Banana)

উন্নত জাত ঃ মর্তমান, কাবুলি, জায়েন্ট গভর্নর, রোবাস্টা, কাঁঠালি, জি-৯, কাঁচাকলা ইত্যাদি।

জলবায়ু ও মাটি

নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ায়, আম্লিক থেকে প্রশম, দোঁয়াশ থেকে এঁটেল, উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে কলা ভালো হয়।

চারা রোপন

আষাঢ়, আশ্বিন ও ফাল্গুন মাসে সাধারণত কলাগাছ লাগানো হয়ে থাকে। তবে, সারা বছরই কলাগাছ লাগানো যায়। ২-৩ মাস বয়সি সুস্থ সবল তেউড় ৭ ফুট ×৭ ফুট দূরত্বে ১.৫ ফুট × ১.৫ ফুট × ১.৫ ফুট মাপের গর্ত করে যথারীতি জৈব ও জীবাণু সার মিশিয়ে ১৫-২০ দিন পরে লাগানো হয়ে থাকে।

সার প্রয়োগ

কলাগাছের চারা তথা তেউড় বসানোর আগে গর্তের মাটির সঙ্গে গাছ প্রতি ১০ কেজি খামারের সার বা গোবর সার, হাড় গুঁড়ো, জীবাণু সার প্রভৃতি মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর ১ মাস পর থেকে প্রতি দেড় মাস অন্তর সম পরিমাণ সার গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। চারা বসানোর ৩ মাস পরে আর একবার ১০ কেজি জৈবসার প্রয়োগ করতে পারলে ভালো হয়। বড় গাছের সুপারিশকৃত সার ৪-৫ ভাগে ভাগ করে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা ও জলসেচ

আগাছামুক্ত পরিচ্ছন্ন চাষে গাছে রোগ পোকা কম হবে, ফলন ভালো হবে ও বেশি হবে। কলাগাছে নিয়মিত জলসেচ করার প্রয়োজন হয়। ড্রিপ (Drip) বা ফোঁটা সেচ পদ্ধতিতে সেচ এর ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

শস্য সুরক্ষা

অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

ফলন

১০-১২ কুইন্টাল/বিঘা

লেবু (Lime and Lemon)

জাত

পাতি, কাগজি, গন্ধরাজ, মুসাম্বি, কমলা ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকায় কমলালেবু এবং পশ্চিমের লাল কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে মুসাম্বি চাষ এর সম্ভাবনা থাকলেও সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পাতি ও কাগজি লেবু চাষ করা যায়। এখানে পাতি ও কাগজি লেবুর চাষ পদ্ধতি আলোচনা করা হল। পাতিলেবুর উন্নত জাত তিহিতি এবং কাগজি লেবুর উন্নত জাত লিসবন, ইউরেকা ইত্যাদি।

চারা লাগানো

বর্ষা শুরুর ১ মাস আগে ২ ফুট ×২ ফুট ×২ ফুট মাপে কেটে রাখা গর্তে ১২ ফুট× ১২ ফুট দূরত্বে চারা লাগানো হয়। সাধারণত ভাল জাতের 'মা' গাছ থেকে গুটি কলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে নেওয়া হয়। ১ বছর বয়সী চারা হাপর থেকে তুলে নিয়ে জমিতে বসানো হয়।

সার প্রয়োগ

গাছ লাগানোর সময় গাছ প্রতি ১০ কেজি খামারের সার এবং ২৫০ গ্রাম হাড় গুঁড়ো প্রয়োগ করতে হবে। কীটশত্রুর উপদ্রব থাকলে গুঁড়ো কীটনাশক ৫-১০ গ্রাম গোড়ায় ছড়িয়ে দিতে হবে। লেবু গাছে আষাঢ়, আশ্বিন ও ফাল্গুন মাসে সার প্রয়োগ করা উচিৎ। সুপারিশ মতো সার তিন ভাগে ভাগ করে ঐ সময় প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা ও জলসেচ

নিয়মিত গোড়ার মাটি খুঁড়ে আলগা করে দিতে হবে ও আগাছা তুলে ফেলতে হবে। চারা লাগানোর পর প্রথম তিন বছর অন্তবর্তী ফসল হিসাবে নানা ধরনের স্বল্প মেয়াদি ফসল করা যায়। লেবু গাছে খুব বেশি জলসেচ-এর প্রয়োজন হয় না। গ্রীষ্মকালে এবং খরার সময় মাঝে মাঝে জীবনদায়ী (Life saving) জলসেচ দিতে হবে।

শস্য সুরক্ষা : অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

ফলন :৮-১০ কুইন্টাল/বিঘা।

আনারস (Pineapple)

জাত : মরিসাস, কুইন, কিউ, জায়ান্ট কিউ।

চারা রোপণ

অম্লধর্মী (৫-৬ ক্ষারাম্লমান), উঁচু, জলসেচ ও নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত জমি আনারস চাষের উপযোগী। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে আনারাস ভালো হয়। ৪ ফুট দূরত্বে জোড়া সারিতে ১ ফুট × ১.২ ফুট দূরত্বে চারা বসালে সর্বাধিক ফলন পাওয়া যাবে। তেউড় লাগিয়ে আনারসের বংশবিস্তার করা হয়। অর্থাৎ তেউড়ই হল আনারসের চারা। তেউড় লাগানোর আগে ছত্রাকনাশক TV/PF গোলা জলে ৩০ মিনিট গোড়ার অংশ ডুবিয়ে রেখে শোধন করে নেওয়া উচিৎ। কার্তিক-অঘ্রান বা আষাঢ় -শ্রাবণ মাসে চারা লাগানো যায়।

সার প্রয়োগ

সুপারিশকৃত সার দুই ভাগে ভাগ করে চারা বসানোর ২ মাস পরে প্রথম ভাগ এবং ১১ মাস পরে দ্বিতীয় ভাগ প্রয়োগ করতে হবে। পরের বছর বর্ষার আগে ও পরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

পেয়ারা (Guava)

জাত : বারুইপুর, এল-৪৯, সীড লেস, হরিঝা ইত্যাদি।

চারা লাগানো

ভালো জাতের 'মা' গাছ থেকে গুটি কলম করে চারা সংগ্রহ করার পর ১ বছর হাপরে রেখে পরের বছর বর্ষায় ১৮ ফুট × ১৮ ফুট দূরত্বে ২ ফুট × ২ ফুট × ২ ফুট গর্ত করে ঐ চারা বসাতে হবে। ১ মাস আগে খুঁড়ে রাখা গর্তের মাটির সাথে যথারীতি জৈব ও জীবাণু সার মেশাতে হবে। দ্বিতীয় বছর থেকে সুপারিশকৃত সার ২ ভাগে ভাগ করে বর্ষার আগে ও পরে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা ও জলসেচ

পেয়ারা বাগানে স্বাভাবিক পরিচর্যাই করতে হবে এবং গরমকালে বা খরার মরশুমে মাঝে মাঝে জলসেচ-এর ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝে মাঝে শুকনো ও রোগগ্রস্ত ডাল কেটে ক্ষত স্থানে কপার অক্সিক্লোরাইড এর প্রলেপ দিতে হবে।

ফলন

পেয়ারা গাছে প্রায় সারা বছরই ফল পাওয়া যায়। তবে, বর্ষাকালে ফলন বেশি হয়। বর্ষাকালে ফলের ভালো দাম পাওয়া যায় না তাই, ওই সময় পরিচর্যা, সার প্রয়োগ, হরমোন প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কম ফলন নেওয়া সম্ভব হলে শীতকালে বেশি ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৩০-৩২ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যাবে একটা পূর্ণ বয়স্ক ফলন্ত বাগান থেকে।

পেঁপে (Papaya)

পেঁপে একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। কাঁচা অবস্থায় সবজি হিসেবে এবং পাকা অবস্থায় সুস্বাদু ফল হিসাবে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি পাকা পেঁপে থেকে জ্যাম, জেলি, মার্মালেড ইত্যাদি সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। পেঁপের পুষ্টিগুণ অন্যান্য অনেক খাদ্য অপেক্ষাই বেশি। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে ২৫০০ আই. ইউ. ভিটামিন-এ, ৭০ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি, ৫ গ্রাম প্রোটিন এবং প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি$_1$, বি$_2$ ইত্যাদি বর্তমান। পেঁপে বিরেচক এবং পরিপাকে সহায়ক। কাঁচা পেঁপের আঠায় যথেষ্ট পরিমাণে 'প্যাপেন' থাকায়. হজমিকারক ওষুধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। প্যাপেন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হজমকারী উৎসেচক পেপসিন-এর সমতুল্য। এছাড়া, চর্মরোগ, পাকস্থলীতে ক্ষত, ক্ষুধামান্দ্য, কৃমি, একজিমা, বৃক্কের প্রদাহ এমনকী ক্যান্সার রোগের নিরাময়েও প্যাপেন ও পেঁপেজাত ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

মাটি ও জলবায়ু

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পেঁপে চাষের উপযোগী। অপেক্ষাকৃত কম বায়ুর বেগ এবং তুষারপাত মুক্ত পরিবেশে পেঁপে গাছ ভালোভাবে জন্মায় ও যথেষ্ট ফলন দেয়। জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত ও যথেষ্ট জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর, প্রশম পলিমাটি পেঁপে চাষের পক্ষে আদর্শ। চটচটে ও শক্ত এবং বৃষ্টি হলে কয়েক ঘন্টা জল জমে থাকে, এমন মাটিতে পেঁপে চাষ ভালো হয় না। সাধারণভাবে বেলে, বেলে দোআঁশ, কাদা দোআঁশ, পলি দোআঁশ মাটিতেও পেঁপে চাষ করা যায়।

উন্নত জাত

পেঁপে গাছ সাধারণত বীজ থেকে উৎপন্ন হয়। তাই, পুরোপুরি মাতৃগুণ সম্পন্ন চারা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে, কোনো নাম করা জাতকে কোনো অঞ্চলে এককভাবে চাষ করে জাতের গুণগুলি মোটামুটি ধরে রাখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে চাষের উপযোগী কয়েকটি উন্নত জাত হল ঃ

ক) ওয়াশিংটন

কান্ডের পর্ব ও পর্ণবৃন্ত ঘনবেগুনি বর্ণের, ফল গোলাকার থেকে ডিম্বাকৃতির, মাঝারি থেকে বড়ো আকারের, শাঁস পীতবর্ণ, শাঁসালো, মিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত, বীজ থেকে অধিক সংখ্যক পুরুষ গাছ জন্মায়।

খ) কুর্গ হানিডিউ বা কুর্গ মধুবিন্দু

হানিডিউ বা মধুবিন্দু জাত থেকে উদ্ভূত। ফলে অল্পসংখ্যক বীজ থাকে, গাছের খুব নিচু থেকেই ফল ধরে, উভলিঙ্গ ফুল উৎপন্ন করে, ফলগুলি লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, মিষ্ট সুগন্ধযুক্ত ও বেশ ঝাঁঝালো।

গ) রাঁচি

ছোটো গাছে ফল ধরে, লম্বাটে গোল, ৩-৪ কেজি ওজনের ফল, পাকা ফলের শাঁস বেশ নরম, মিষ্ট, উজ্জ্বল হলুদাভ ও গন্ধবিহীন।

অন্যান্য উপযোগী জাতগুলি হলো আরলি-বাউন্টি, সিলোনিজ রাউন্ড, হানি ডিউ, সিঙ্গাপুর, সিলেকশন-১, কো-১, কো-২ সাহারানপুর সিলেকশন, ম্যামথ, মাদাম রাসেল ইত্যাদি। প্যাপেন সংগ্রহের জন্য উপযোগী জাতগুলি হলো কো-৫, কো-২, পুসা ম্যাজেস্টি, এম. এফ-১ ইত্যাদি। এই সব জাতের পেঁপে থেকে হেক্টর প্রতি ৫০০-৭৫০ কেজি প্যাপেন সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বীজের হার ও চারা তৈরি

বিঘাপ্রতি ৬০-৭৫ গ্রাম বীজ লাগে। বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নত জাত ও গুণমানের বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

উন্নত জাতের, বড়ো আকারের, গাছে পাকা, রোগমুক্ত ফল থেকে কালো রঙের বীজ সংগ্রহ করে কাঠের ছাই মাখিয়ে ২-৩ দিন ছায়ায় শুকানো এবং প্রতি কেজি বীজে ৫ গ্রাম TV অথবা TH মিশিয়ে মুখবন্ধ পাত্রে ১৫-২০ মিনিট ঝাঁকিয়ে বীজ শোধন করা প্রয়োজন। বীজতলার মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে, আগাছামুক্ত করে, প্রতি বর্গমিটার বা ১০ বর্গফুট জমিতে ২ ঝুড়ি গোবর সার বা খামারের সার ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে এবং মূল জমি থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু বীজতলা তৈরি করে বীজতলার মাটি প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম T.H মিশিয়ে ভালো করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এতে মাটিবাহিত বিভিন্ন ছত্রাকঘটিত রোগজীবাণু ধ্বংস হবে। ১ মিটার বা ৩ ফুট চওড়া এবং প্রয়োজন মতো লম্বা বীজতলায় ৪ সেমি ব্যবধানে সারিতে ৩ সেমি অন্তর ২ সেমি. গভীর বীজ বুনে হালকা ঝুরো মাটি দিয়ে বীজ ঢাকা দিতে হবে। পিঁপড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীজতলার চারদিকে নিমগুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। বীজ বোনার পর ঝারি দিয়ে নিয়মিত পরিমাণ মতো জলসেচ দিতে হবে। বৃষ্টিপাত ও তীব্র রোদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বীজতলার ৪-৬ ফুট ওপর দিয়ে ছাউনি করে সাদা পলিথিন ও প্রখর রোদের সময় পাটকাঠি বা তালপাতার ছাউনি দেওয়া উচিত। ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা চারা রোয়ার পক্ষে উপযুক্ত। ৪″ × 6″ প্যাকেটে চারা তৈরি করে প্রয়োজন ও সুবিধা মতো চারা রোপণ করা যায়। এজন্য মাটি, জৈবসার ও বালির ১:১:১ অনুপাতের মিশ্রণ ভরে দেওয়া হয় এবং বীজতলার মতোই শোধন করে প্রতিটি প্যাকেটে ২-৩টি বীজ লাগানো হয়।

বীজ ছাড়াও '**ঢিবি দাবা কলম**' প্রক্রিয়ায় চারা তৈরি করে ভালোজাতের 'সদৃশ' বা মাতৃগুণ সম্পন্ন চারা তৈরি করা যায়। তাই, ভালো ফল দেয় এমন গাছের ফল দেওয়ার হার কমে এলে (৫-৬ বছর বয়সে) গাছের গোড়া থেকে ৮-১০ ইঞ্চি ওপরে কেটে ফেলা হয় এবং কাটা মুখ পলিথিন দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে জল বা ক্ষতিকর রোগজীবাণু প্রবেশ করতে না পারে। কয়েকদিনের মধ্যেই গুঁড়ি থেকে চারদিকে শাখামুকুল বের হবে। এইসময় পরিমিত জলসেচ করতে হবে, যাতে মাটি বেশি শুকিয়ে না যায় বা বেশি ভিজে না যায়। শাখাগুলি ২-২.৫ ইঞ্চি মোটা হলে গোড়া থেকে ২ ইঞ্চি গভীর করে কেটে দিতে হবে এবং কাটা অংশে একটি শুকঁনো কাঠের টুকরো প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। কাটা অংশে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড মিশিয়ে স্প্রে করে দিলে ভালো হয়। এরপর কাটা অংশের কিছু ওপর অবধি গুঁড়ির চারদিকে নরম ভিজে মাটি চাপা দিতে হবে।৪০-৪৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি কাটা অংশে/ মূল উৎপন্ন হবে এবং গুঁড়ি থেকে মূলসহ শাখাগুলিকে সাবধানে বিচ্ছিন্ন করে মূল জমিতে লাগাতে হবে। উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যায় এই গাছে ২-৩ মাসের মধ্যেই ফল ধরে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ

পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও সারাবছর সেচের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি পেঁপে চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। জমির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবল বাতাসরোধী গাছ লাগানো প্রয়োজন। নরম, গভীর, জৈবসারযুক্ত মাটিতে পেঁপে ভালো হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে কয়েক পশলা বৃষ্টি হলে জমিতে গভীরভাবে লাঙল দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি হারে ধইঞ্চা বীজ বুনে দিয়ে ৩০-৪০ দিনের চারা লাঙল ও মই দিয়ে কাদার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। এর ফলে, নাইট্রোজেন সারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জৈবসার মাটিতে মিশবে। ১৫-২০ দিন পরে জমি সমান করে জলনিকাশী নালা তৈরি করতে হবে ও চারা লাগানোর জন্য ৬ ফুট × ৬ ফুট দূরত্বে ১.৫ ফুট × ১.৫ ফুট × ১.৫ ফুট গর্ত করে প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি পচানো খামারের সার ও ১-২ কেজি হাড়ের গুঁড়ো মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে ভরে দিতে হবে।

স্বাভাবিকভাবে পেঁপে একলিঙ্গ উদ্ভিদ অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ গাছের অস্তিত্ব ভিন্ন কিন্তু কুর্গ হানিডিউ জাতীয় কিছু কিছু গাছ উভলিঙ্গ ফুল উৎপন্ন করে। এই ফুলে পুং-স্তবক ও স্ত্রী স্তবক উভয়ই বর্তমান। স্ত্রী ফুল থেকে উৎপন্ন ফল স্বাভাবিক আকার ও আকৃতির হয়, কিন্তু উভলিঙ্গ ফুল থেকে উৎপন্ন ফলগুলি লম্বাটে বা নলাকৃতির হয়। যাইহোক, চারা লাগানোর সময় প্রতি গর্তে ২টি করে চারা লাগাতে হবে, যাতে ফুল আসার পর প্রতি ১০টি গর্তের ১টিতে পুরুষ ফুলযুক্ত গাছ থাকে এবং বাকি চারা গোড়া থেকে কেটে ফেলে দিতে হবে। মেঘলা দিনে বা শীতল আবহাওয়ায় পেঁপে চারা লাগানো উচিত। বীজতলা থেকে কাঠির সাহায্যে ধীরে ধীরে চারা তুলতে হবে, যাতে শিকড় কেটে না যায় এবং প্রতিটি গর্তে অল্প দূরত্বে সাবধানে ২টি করে চারা লাগাতে হবে। বর্ষাকালে চারা রোপণ করার সময় গোড়ায় বেশি করে মাটি ধরিয়ে দিতে হবে, যাতে গোড়ায় বর্ষার জল দাঁড়াতে না পারে। সারাবছর ধরেই পেঁপের চারা লাগানো যায়। তবে, গরমকালে ঘন ঘন সেচ দিতে হয় এবং শীতকালে চারা লাগালে অপেক্ষাকৃত ছোটো গাছে ফল ধরে।

সার প্রয়োগ

চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর জমির উর্বরতা ও জাত অনুসারে প্রতি গাছে ১০ কেজি ভালো করে পচানো খামারের সার বা গোবর সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে এবং পরবর্তীকালে ৪ মাস অন্তর তিন বারে মোট ১৫ কেজি খামারের সার এবং ৩০ গ্রাম বায়ো NPK গাছের গোড়ায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। পরের বছর থেকে সুপারিশকৃত সার তিন ভাগে ভাগ করে আশ্বিন, ফাল্গুন ও শ্রাবণ মাসে গাছের গোড়ার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর পরই সেচ দিতে হবে।

জলসেচ ও পরিচর্যা

চারা লাগানোর পর নিয়মিত জলসেচ করা জরুরি। শীতকালে ১০-১২ দিন অন্তর, গরম কালে ৬-৭ দিন অন্তর এবং বর্ষাকালে প্রয়োজন মতো জলসেচ করা প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গোড়ার মাটি শুকিয়ে না যায় বা জল জমে কাদা না হয়ে যায়। বর্ষার জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। চারা লাগানোর ২০-২৫ দিন পরে গাছের গোড়া খুঁড়ে, আগাছামুক্ত করে গোড়ায় মাটি ধরাতে হবে। কখনও কখনও পেঁপে গাছে এক সঙ্গে অসংখ্য ফল ধরে ফলে, ঘন-সন্নিবিষ্ট ফলগুলির বৃদ্ধি ভালো হয় না। ফল ছোটো হয়ে যায় ও আকৃতি খারাপ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে, ছোট অবস্থায় ফল ঝরিয়ে কমিয়ে দেওয়া উচিত।

ফসল তোলা ও ফলন

জমিতে চারা লাগানোর ৫-৬ মাসের মধ্যেই ফল ধরে এবং ১০-১২ মাসের মধ্যেই ফসল তোলার উপযোগী হয়। কাঁচা পেঁপে সবজি হিসেবে ব্যবহারের জন্য কাঁচা অবস্থায় যে কোনো সময়ই গাছ থেকে তোলা যায়। তবে, পাকা ফল সংগ্রহের জন্য ফলের ত্বকের রং ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করলে এবং ত্বকের রস বা তরুক্ষীরের ঘনত্ব কম হয়ে গেলে, একটা একটা করে ফলগুলি জালতির সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফলের আকার অনুসারে শক্ত ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে এক বা দুই স্তরে ফল রেখে ওপরে নরম খড় বিছিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখলে ৬-৭ দিনে পেঁপে পেকে কমলা-হলুদ রং ধারণ করে এবং শাঁস নরম হয়ে যায়। চারা লাগানোর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। চতুর্থ বছরের পর গাছ কেটে নতুনভাবে চাষ করা উচিত। প্রতি গাছে গড়ে বছরে ৪৫-৭৫টি ফল পাওয়া যায়। বাৎসরিক গড় ফলন বিঘা প্রতি ৫০-৭০ কুইন্টাল।

ফল সংরক্ষণ

৯-১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮০-৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পরিপক্ক পেঁপে ১০-১৫ দিন রাখা যায়।

সাথী ফসলের চাষ

পেঁপের চারা জমিতে লাগানোর পর গাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারির মাঝে ফাঁকা জায়গায় নানারকম সাথী ফসলের চাষ করা যায়। প্রথম বছরে পেঁপে থেকে সরাসারি আয় খুব বেশি হয় না, কিন্তু সর্ষে, ডাল জাতীয় ফসল, গম, বিভিন্ন সবজি ইত্যাদি সাথী ফসলের চাষ করে আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়। শিম্বগোত্রীয় ফসল যেমন, বীন, মটরশুঁটি, বরবটি ইত্যাদি চাষ করে জমির উর্বরতা ক্ষমতাও বাড়ানো যায়। প্রথম ১-২ বছরে পেঁপের জমি থেকে বিঘা প্রতি ২-৩ হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় করা যায় বিভিন্ন সাথী ফসল থেকে। পাশাপাশি, বাগিচায় আগাছার পরিমাণ কম থাকে ও জমির উর্বরতা শক্তি বজায় থাকে। আম, পেয়ারা, লিচু ইত্যাদি ফল বাগানে সাথী ফসল হিসেবেও পেঁপে চাষ করা যায়।

রোগপোকার সমস্যা ও প্রতিকার

পেঁপে গাছের উল্লেখযোগ্য রোগপোকা গুলি হল ঃ

(ক) রসশোষক পোকা

জাবপোকা, থ্রিপস ইত্যাদি চারা অবস্থায় কচি পাতার রস শুষে খায়। পাতার নিচের দিকে বসে এরা রস শোষণ করে। ক্রমে, আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই পোকা পেঁপে গাছের প্রধান সমস্যা, ভাইরাসঘটিত সাহেব রোগের জীবাণু সংক্রমিত করে। সিম জাতীয় কীটনাশক বা জৈব কীটনাশক ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে এই পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। গাছে ফল ধরার পর কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়। ওই সময় তামাক পাতার নির্যাস স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়। ১০০ গ্রাম তামাক পাতা ১ লিটার জলে ও ২৫ গ্রাম নরম সাবান ১ লিটার জলে আলাদা আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে ২৪ ঘন্টা পর নিংড়ে নিয়ে আরও ৩ লিটার জল মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। নিমশীল্ড, নিম গোল্ড, নিমিন ইত্যাদি নিমজাতীয় কীটনাশক প্রয়োগেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

(খ) গোড়া পচা রোগ

স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, জলবসা ভারী মাটি এবং উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কাণ্ড যেখানে মাটি স্পর্শ করে থাকে সেই অঞ্চলে জলবসা নরম অংশ দেখা যায়। পরে, কাণ্ডের ছাল ফেটে দুর্গন্ধ ও পচা রস বেরিয়ে আসে। ধীরে ধীরে ওপর ও নীচের দিকে রোগ সংক্রমিত হয় এবং আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে ঢলে পড়ে। বীজশোধন, বীজতলা শোধন, জলনিকাশী ব্যবস্থা করা, আক্রান্ত চারা তুলে পুড়িয়ে ফেলা ছাড়াও প্রয়োজনে আক্রান্ত গাছে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হারে T.V গুলে ৭ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

(গ) অ্যানথ্রাকনোজ

গাছের পাতা ও ফল উভয়ই এই ছত্রাকঘটিত রোগটির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত স্থানে প্রথমে হলুদ ও পরে বাদমি বর্ণ ধারণ করে। ক্ষতস্থানে সমকেন্দ্রিক বলয়াকার কালচে দাগ দেখা যায়। বড় ক্ষতগুলিতে ফিকে লাল রঙের স্ফোটক দেখা যায়। প্রখর সূর্যালোকপ্রাপ্ত গাছের কাণ্ডের ওপর ঝলসানো বাদামি বর্ণের দাগ দেখা যায় এবং ক্রমে গাছটি মরে যায়।

গাছের ফল ও কাণ্ডকে সরাসরি সূর্যালোক থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রীষ্মকালে শুকনো কলাপাতা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। আক্রান্ত গাছে ৪ গ্রাম TV + ৪ গ্রাঃ P.F ওষুধ জলে গুলে ৭ দিন অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করলে রোগ নিরাময় হয়।

(ঘ) মোজাইক বা সাহেব রোগ

এটি অতি ক্ষুদ্র সাদা মাছি বা শোষক পোকা বাহিত ভাইরাস ঘটিত রোগ। আক্রান্ত গাছের পাতায় হলুদ ও সবুজ ছিট ছিট রং দেখা যায়, পাতা ও অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, পাতা কুঁকড়ে যায় ও গাছ ফলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রোগাক্রান্ত গাছ শিকড় সহ তুলে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আক্রান্ত জমিতে নিমজাত কীটনাশক ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। ওষুধ স্প্রে করার ৭ দিনের মধ্যে কাঁচা বা পাকা পেঁপে তোলা যাবে না। সাবান মিশ্রণ স্প্রে করার ৭ দিনের মধ্যেও কাঁচা বা পাকা পেঁপে তোলা যাবে না। সাবান মিশ্রিত তামাক পাতার জল স্প্রে করেও এই রোগের বাহক পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্যাপেইন সংগ্রহ

কাঁচা পেঁপের আঠা বহুকাল ধরে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। পেঁপের আঠাকে রসায়নাগারে শোধন করে পাওয়া যায় প্যাপেইন, একটি অতি প্রয়োজনীয় উৎসেচক যা প্রোটিন অনুকে ভেঙে সরল ও গ্রহণযোগ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। রান্নাঘরে মাংস রান্না থেকে শুরু করে নানা বৃহৎ শিল্পে এই প্যাপেইন ব্যবহৃত হয়। ভেষজ শিল্প, চর্মশিল্প, রেশম শিল্প, পশম শিল্প, মদ তৈরি ইত্যাদি শিল্পে আজ ব্যাপকভাবে পেঁপের আঠা বা তার থেকে উৎপন্ন পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে।

পেঁপের আঠা সংগ্রহ করার পদ্ধতি

কাঁচা ফলের খোসা ত্বক চিরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ও ভালো মানের আঠা পাওয়া যায়। তাই, বাণিজ্যিকভাবে কাঁচাফলের খোসা চিরে পেঁপের আঠা সংগ্রহ করা হয়। যে কোনও জাতের পেঁপে থেকেই আঠা সংগ্রহ করা যেতে পারে। যদি আঠা সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই পেঁপের চাষ করা হয় তবে, কো-৫, পুসা ম্যাজেস্টি, কো-২, কো-৪, কো-৬, পুসা ডেলিসাস ইত্যাদির চাষ করা উচিৎ।

আঠা সংগ্রহের জন্য ছুরি হিসাবে বাঁশের কুচি, কাঠের টুকরো, ক্ষুরের ব্লেড, স্টেনলেস স্টীলের ছুরি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অন্য কোনও ধাতুর ছুরি ব্যবহার করা উচিৎ নয় কারণ, সেক্ষেত্রে ধাতুর সাথে আঠার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। পেনসিলের মতো একটা বাঁশের টুকরোর একপ্রান্তে একখন্ড ব্লেড বসিয়ে নিয়ে আঠা নিষ্কাশন ছুরি তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। কাঁচা পেঁপের খোসা চিরে প্রায় সারাবছরই পেঁপের আঠা সংগ্রহ করা যায় তবে, বর্ষাকালে এবং ভোরবেলা অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আঠা নির্গত হয়। খোসা চেরার আগে গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরিয়ে ফেলে দেওয়া উচিৎ এবং ফলের বোঁটার কাছ থেকে লম্বালম্বি সোজাভাবে ফলের ডগা পর্যন্ত চেরা উচিৎ। চেরার গভীরতা এমন হওয়া উচিৎ যাতে খোসার পুরু অংশ পুরোপুরি চেরা হয় অথচ ভেতরের শাঁস অংশ অক্ষত থাকে।

ফসলচক্রে শুঁটি জাতীয় ফসলের অপরিহার্যতা

আধুনিক নিবিড় চাষবাসে শুঁটি জাতীয় ফসলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শুঁটি ফসল মাটির জৈব পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে এবং মাটির স্বাস্থ্য ভাল রাখে। তাই শুঁটি জাতীয় ফসলকে 'মাটির আরোগ্য শক্তি' বলা হয়।

রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন জৈব বন্ধনের মাধ্যমে শুঁটি ফসল আত্তিকরণ

করে, যার ফলে মাটির সার্বিক উর্বরতা বাড়ে। এই জাতীয় ফসলকে চাষের জমিতে 'মিনি নাইট্রোজেন সার তৈরীর কারখানা' বলা চলে নীচের সারণি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সারণি ঃ বিভিন্ন ফসলের উপযোগী রাইজোবিয়াম প্রজাতি ও তাদের নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতা

ফসলের নাম	উপযোগী রাইজোবিয়াম প্রজাতি	রাইজোবিয়াম প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধির পরিমাণ (%)	নাইট্রোজেন সংবন্ধন (কেজি/বিঘা)
মটর	রাইজোবিয়াম লেগুমিনোসেরাম	৩০-৪৮	৮-১০
মুসুর	ঐ	২৪-৩০	১০-১২
বরবটি	রাইজোবিয়াম স্পিসিস	৩৫-৬৫	৮-১০
অড়হর	ঐ	৪০-৭৫	২২-২৫
মুগ/কলাই	ঐ	৩৫-৪০	৮-১০
চীনাবাদাম	ঐ	১২-৫৫	৭-১০
ছোলা	ঐ	২৫-৫০	৮-১০
সয়াবিন	ব্রাডি রাইজোবিয়াম জ্যাপোনিকাম	৩৫-৫০	১২-১৫
বীন/রাজমা	রাইজোবিয়াম ফ্যাসিওলি	৪০-৫০	১০-১৫
আলফা-আলফা	এনসিফার মেলিলোটি	৫০-৮০	১৪-২২
বারসিম	রাইজোবিয়াম ট্রাইফলী	৬০-৮০	১২-২০

- রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার নাইট্রোজেন সংবন্ধনের ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় প্রযুক্ত ফসলের প্রয়োজন মিটিয়েও মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তী ফসল গ্রহণ করতে পারে।
- রাইজোবিয়াম বা অন্যান্য জীবাণু সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীবাণুগুলোর সংখ্যা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটিতে কার্বন ও নাইট্রোজেন যোগ হয়।
- মাটির ভৌত, রাসায়নিক প্রভৃতি গুণাবলী বৃদ্ধি পায়।
- শুঁটি ফসল চাষে বিভিন্ন জৈব অম্ল নিঃসরণের ফলে মাটিতে আবদ্ধ ফসফরাস উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে।
- মিশ্র বা সাথী ফসল চাষ পদ্ধতিতে শুঁটি ফসলের অন্তর্ভুক্তিতে বহুমুখী সুবিধা পাওয়া যায়।

তাই যে কোনও চাষ পদ্ধতিতেই শিম্বি গোত্রীয় ফসলের অন্তর্ভুক্তিতে মাটিতে জৈব পদার্থ তথা অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্যের বৃদ্ধি ঘটে, বিশেষভাবে নাইট্রোজেন সংবদ্ধ হয়ে জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ প্রদত্ত কয়েকটি ফসলের চাষে একর প্রতি সার (কেজিতে) প্রয়োগের সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ

ফসল	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
দেশি ধান	১৬	৮	৮
সরিষা	২০	১০	১০
মুগ, কলাই, ছোলা ইত্যাদি	৮	১৬	১৬

অর্থাৎ শিম্বি গোত্রীয় ফসলে ফসফেট বা পটাশ ঘটিত সারের অর্ধেক মাত্রায় নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োজন। অন্যান্য ফসলের বেলায় ফসফেট সারের দ্বিগুণ পরিমান নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয় সঠিক উৎপাদনের জন্য। এর কারণ শুঁটি ফসল রাইজোবিয়ামের সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে নাইট্রোজেনের প্রয়োজন মেটায়।

অর্থকরী ডাল শস্য মুসুর

ডাল শস্যের মধ্যে মুগের পরই মুসুরের স্থান। রবি মরশুমে দ্বিতীয় প্রধান ডাল শস্য মুসুর। মুসুরে সাধারণত সেচ লাগে না। শুধু ফল আসার আগে প্রয়োজনে ঝাপটা সেচ দিলেই চলে। আবার ধানের জমিতে পায়রা চাষ হিসাবেও খেসারি, ছোলার মত মুসুর চাষ করা যায়। সুতরাং একটু সচেষ্ট হলে এরাজ্যে মুসুর চাষের এলাকা বাড়ান সম্ভব।

জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত যে কোন মাটিতেই মুসুর চাষ হতে পারে।

উন্নত জাত ঃ এ রাজ্যের জন্য উপযোগী উন্নত মুসুরের জাত নীচে দেওয়া হল ঃ

জাত	মেয়াদ (দিন)	উৎপাদন হার (কুঃ/একর)
আশা (বি-৭৭), টি-৩৬,	১১৫-১২০, মাঝারিজাত	৬-৭
এল ৯-১২ রঞ্জন (বি-২৫৬)	১১৫-১২০, মাঝারিজাত	৬-৭
সুব্রত (WBL-৫৮)	১২০-১২৫, মাঝারিজাত	৭-৮
সি-৩১, বি-৩১, বি-৯৪	১১৫-১২০, মাঝারিজাত	৫-৬

*শুখা এবং খরাপ্রবণ এলাকাতেও এসব জাত ভাল ফলন দেয়।

বীজ বপন ঃ কার্তিকের ১ম সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণের ১৫ তারিখ পর্যন্ত মুসুর বোনা যাবে। লাইনে বুনলে বিঘা প্রতি ৩.৫ কেজি এবং ছিটিয়ে বুনলে ৪-৪.৫ কেজি বীজ প্রয়োজন।

বীজ শোধন ঃ প্রতি কেজি বীজ ১০ গ্রাম 'প্যান্থার টিভি' (ট্রাইকোডারমা ভিরিডি) এবং প্রতি বিঘায় বীজের জন্য ২৫০ গ্রাম 'Bio NPK' (রাইজোবিয়াম) দিয়ে শোধন করে জমিতে বুনতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ সম্ভব মতো গোবর বা কম্পোষ্ট সার, বিঘা প্রতি ২০ কেজি সুধা সুষম জৈব সার, ২৫ কেজি রক ফসফেট দিয়ে প্রথম চাষ দিতে হবে। এর পর বিঘা প্রতি ১ কেজি Bio NPK (মুসুর) ছড়িয়ে দ্বিতীয় চাষ দিতে হবে এবং বীজ বুনে মই দিয়ে দিতে হবে। পায়রা চাষ করলে বীজ বোনার এক সপ্তাহ আগে সার, ধান জমিতেই ছড়িয়ে দিতে হবে এবং মাটিতে রস থাকা অবস্থায় বীজ বুনতে হবে।

পরিচর্যা ঃ বীজ বোনার ১৫-২০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে যাতে প্রতি বর্গমিটারে

১১০-১২০টি চারা থাকে। বোনার ৩০ দিন পরে একবার এবং এর ১৫ দিন পরে আর একবার ২ শতাংশ হারে তরল সার স্প্রে করলে ফলন বাড়বে।

রোগ পোকা দমন ঃ ঢলে পড়া রোগ বা গ্রে মোল্ড রোগ প্রতিরোধ করতে মূল জমিতে শেষ চাষের আগে ৫০০ গ্রাঃ 'টি ভি' গোবর সারের সাথে মিশিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ফল ছিদ্রকারী পোকা বা অন্য পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে 'নিম তেল' অথবা 'বিটি' শুঁটি ধরার পরে ৭ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে। সাধারণত ১১৫-১২০ দিনে ফসল পাকে। পাতা শুকিয়ে ঝরতে শুরু করলে সকালের দিকে ফসল তুলতে হবে।

মুগ/কলাই চাষ

উদ্ভিদ জাতীয় প্রোটিনের প্রধান উৎস ডাল (প্রোটিন ২২-৪৪%)। ভাতের সঙ্গে সর্বাধিক ব্যবহার হয় ডাল। ডালের খোসা একটি উচ্চ খাদ্যগুণ সম্পন্ন পশুখাদ্য। ডালশস্য চাষ করলে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ে। এতদসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রয়োজনের মাত্র ১০-১২ শতাংশ ডাল এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। সুতরাং ডাল শস্যের চাষ বাড়াতে সকল কৃষকেরই যত্নবান হওয়া উচিত। এ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ডাঙ্গা জমিতে খরিফ মরসুমে মুগ ও কলাই চাষ বৃদ্ধির ও তার ফলন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে প্রাক-খরিফ মরসুমেই মুগ বা কলাই চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন। আসলে ডালশস্য চাষের প্রসার না হওয়ার প্রধান কারণ হল এর ফলন কম হওয়া। এই ফলন কম হওয়ার আসল কারণ হল, এই চাষে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার না করা। নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন অবশ্যই বাড়বে এবং সুউচ্চ বাজারদরের জন্য লাভের পরিমাণও বাড়বে।

(১) উন্নত ও ভাইরাস সহনশীল জাতের বীজ ব্যবহার ঃ

সোনালি, পুসা বিশাল, সম্রাট, পন্থ মুগ-২ প্রভৃতি মুগের জাতগুলি হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল এবং এদের শুঁটি প্রায় এক সাথে পাকে। কলাই-এর মধ্যে পন্থ ইউ-১৯, বসন্তবাহার বা সারদা ভাইরাস রোগ সহনশীল।

(২) ডাল শস্য চাষের জন্য নিরপেক্ষ জমি (পি.এইচ-৬-৭.৫ এর মধ্যে) প্রয়োজন। সুষম মাত্রায় সার বিঘা প্রতি N : P : K = ৩ ঃ ৬ ঃ ৩ দেওয়া ভাল। তবে রাইজোবিয়াম জীবাণু সার বা বায়ো এন-পি-কে দিয়ে বীজ শোধন অবশ্য করণীয়। এর জন্য বোনার পূর্বে ৫০০ গ্রাম বায়ো এন-পি-কে বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ বুনতে হবে।

(৩) বিঘা প্রতি সম্ভব মতো গোবর সার বা ২০ কেজি সুধা সুষম, এবং ৫০ কেজি রক ফসফেট প্রয়োগ করে জমি চাষ দিতে হবে। ১ ফুট অন্তর লাঙ্গলের লাইন করে বীজ বুনলে আগাছা নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

(৪) বোনার ৩০ দিন পরে একবার এবং ১৫ দিন পরে আর একবার ২% হারে তরল সার স্প্রে করলে ফলন অনেক বাড়বে।

(৫) পাতার তলায় লেদা পোকার ডিম বা ছোট লেদা পোকার ঝাঁক লক্ষ্য করে মেরে ফেলতে হবে।

(৬) লেদা পোকার আক্রমণ বেশি হলে বা শুঁটি ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হলে নিম তেল লিটার প্রতি ৪ গ্রাম হারে বিটি (ব্যাসিলাস থুরিনজিএনশিস) আক্রমণের শুরুতে বিকালে স্প্রে করুন। ৫-৭ দিন পর ২য় বার স্প্রে করুন।

সঠিক ভাবে যত্ন নিলে এই পদ্ধতিতে বিঘা প্রতি ২.৫ কুইন্টল ফলন অবশ্যই পাওয়া যাবে।

চীনাবাদাম চাষ লাভজনক

চীনাবাদাম একটি লাভজনক ফসল। প্রোটিন (২৫ শতাংশ), তেল (৪৮ শতাংশ) এবং খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে চীনাবাদাম সমাদৃত। বাদাম তেলের গুণগতমান উন্নত হওয়ায় বিদেশের বাজারেও ভারতের

চীনাবাদাম তেল জনপ্রিয়। চীনাবাদামের খইল ও সবুজ গাছ পশুখাদ্য হিসাবে খুবই পুষ্টিকর এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধিরও সহায়ক। সুতরাং চীনাবাদাম চাষের এলাকা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি।

বোনার সময় ঃ বছরে তিনবার চীনাবদাম চাষ করা যায়। তবে শীত ও গ্রীষ্মকালীন ফসলের ফলন বেশি হয়।

ক) **খরিফ ঃ** জ্যৈষ্ঠ মাস - পশ্চিমাঞ্চলের ডাঙ্গা জমিতে একক অথবা সাথি ফসল হিসাবে।

খ) **রবি ঃ** কার্তিক মাস—নদীর চর অঞ্চলে অথবা ধান কাটার পর মাটিতে অবশিষ্ট রসের সাহায্যে চাষ করা যাবে।

গ) **গ্রীষ্মকালীন ঃ** ফাল্গুন—সেচসেবিত অঞ্চলে চাষ করা যাবে।

উন্নত জাত

জাত	মেয়াদ (দিন)	ফলন (৩৩ শতক বা প্রতি বিঘা)
টি.জি.এ-২৪	১০০-১০৫ (শীত বা গ্রীষ্মকাল)	৫০০-৬০০ কেজি
ঐ	১১৫-১২০ (বর্ষাকালীন)	২০০-২৬০ কেজি
জি. ৫২-১	১০৫-১১০ (শীত বা গ্রীষ্মকাল)	৪০০-৪৬০ কেজি
ঐ	১১৫-১২০ (বর্ষাকালীন)	২০০-২৫০ কেজি
জি.পি.বি.ডি-৫	১০৫-১১০ (শীত বা গ্রীষ্মকাল)	৫০০-৬০০ কেজি
ঐ	১১৬-১২৫ (বর্ষাকালীন)	২৫০-৩০০ কেজি
এ. কে ১২-২৪	১০৫-১১০ (শীত বা গ্রীষ্মকাল)	৪০০-৫০০ কেজি

বীজ শোধন ঃ বীজ বোনার ২ দিন পূর্বে প্রতি কেজি বীজ ১০ গ্রাম সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্স (পি এফ) দিয়ে শোধন করা প্রয়োজন এবং জমিতে বীজ বোনার পূর্বে পরিমাণ মত ভাতের মাড়ের সাথে ২৫০ গ্রাম বায়ো এন.পি.কে. (রাইজোবিয়াম) দিয়ে ১ বিঘার জন্য প্রয়োজনীয় সবটা বীজ মাখিয়ে জমিতে বুনতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ বিঘা প্রতি সম্ভব মতো গোবর বা কম্পোস্ট সার, ২০ কেজি 'বিজয় অথবা সুধা সুষম এবং ৩০ কেজি রক ফসফেট ছড়িয়ে জমিতে প্রথম চাষ দিতে হয় এবং শেষ চাষের পূর্বে ১.৪ কেজি বায়ো এন পি কে (রাইজোবিয়াম) এবং ৫০০ গ্রাম প্যান্থার পি এফ প্রয়োগ করুন। (আলুর জমিতে ফসফেট ও পটাশ সারের প্রয়োজন নেই।)

দূরত্ব ঃ ১২″ × ৪″ দূরত্বে বীজ বসাতে হবে।

পরিচর্যা ঃ বোনার ১৮-২০ দিনের মাথায় ১০ কেজি পটাশ সার ও ১.৫ কেজি সালফার প্রয়োগ করে গোড়ায় মাটি তুলে দিন। ৩৫-৪০ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার নিড়াণ দিয়ে গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

সালফার এর পরিবর্তে ৫০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করলে সালফার ও ক্যালসিয়াম জোগাবে, যা বাদামের ফলন বৃদ্ধিতে অপরিহার্য। বোনার ৪০ দিন পর লিটার প্রতি ১ গ্রাম সুপারবোর এবং তার ১৫-২০ দিন পর অনুখাদ্য মিশ্রণ স্প্রে করুন। বোনার ১৫ দিন পরে একবার এবং ফুল আসার সময় একবার নিড়াণির সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

সেচ ঃ শীত ও গ্রীষ্মকালীন চীনাবাদামে অন্তত ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ফুল আসার সময় একবার এবং এর ৩ সপ্তাহ পর আর একবার সেচ অত্যন্ত জরুরি।

শস্যরক্ষা ঃ জমিতে উঁই পোকার উপদ্রব থাকলে শেষ চাষের আগে বিঘা প্রতি ১০ কেজি নিম খইল প্রয়োগ করতে হবে। চিরুণি পোকা, জাব পোকা বা লেদা পোকা দমনের জন্য বিউভেরিয়া বেসিয়ানা অথবা শক্তিশেল-২ প্রতি লিটার জলে ২ মিলি হিসাবে ট্রিগার সহযোগে বিকালে পাতার নীচে স্প্রে করা প্রয়োজন।

টিভি অথবা পি এফ দিয়ে বীজ শোধন ও মূল জমিতে প্রয়োগ করলে রোগের উপদ্রব কম হবে।

ফসল তোলা ঃ দানা পরিপুষ্ট হলে ফসল তোলা প্রয়োজন। বাদামের খোলার ভিতরটা কালচে রং দেখা দিলে ফসল তুলতে হয়।

বিভিন্ন ফসলের চাষে প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করা ওষুধের পুরো নাম

TV	=	ট্রাইকোডারমা ভিরিডি।
TH	=	ট্রাইকোডারমা হারজিনিয়াম
PF	=	শিউডোমোনাস-ফ্লওরেসেন্স
BB	=	বিউভেরিয়া বেশিয়ানা
BT	=	ব্যাসিলাস থুরিন্‌জিএনসিস্‌
বায়ো NPK	=	নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ-সরবরাহকারী জীবাণু সার।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ৬ ❐ জৈব উপাদানের সাহায্যে ধান চাষ

গঠন

৬.১ 'শ্রী' (SRI) পদ্ধতিতে ধান চাষ

৬.২ ড্রাম সীডারের সাহায্যে ধানের চাষ

৬.১ 'শ্রী' (SRI) পদ্ধতিতে ধান চাষ

'**শ্রী**' বা **এস.আর.আই** (System of Rice Intensification) ধান চাষ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন হেনরি ডি লাওলানি নামক একজন ফরাসি যাজক। তিনি ফ্রান্স থেকে ১৯৬১ সালে মাদাগাসকারে (আফ্রিকা মহাদেশের পাশে ভারত মহাসাগরের উপকূলে একটি ছোট্ট দ্বীপ) আসেন এবং একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ভাত যেহেতু মাদাগাসকারের বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্য, তাই তিনি ধানের ফলন কীভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে ১৯৮৩ সালে তিনি এস. আর. আই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। তবে ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত প্রচারের অভাবে মাদাগাসকারের চাষীদের ছাড়া এই চাষ পদ্ধতি ততটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই চাষ পদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্বের মানুষ এই চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হয়।

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ নিয়ে চীন, ইন্দোনেশিয়া, কমোবাডিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত প্রভৃতি দেশে বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং স্বল্প খরচে ধানের অধিক ফলন পাওয়া গেছে। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশই একমাত্র রাজ্য যেখানে ২০০৩ সালের খরিফ মরসুমে রাজ্যের ২২ টি জেলাতেই পরীক্ষামূলকভাবে এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হয় এবং চাষীরা সেচের জল প্রায় অর্ধেক ব্যবহার করেও যথেষ্ট লাভজনক ফলন লাভ করেন। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে এই পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয়েছে।

এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধান চাষে সুবিধাগুলি কী কী (Advantages)

● এই চাষ পরিবেশ বান্ধব। এই পদ্ধতিতে চাষের ফলে মাটিতে অক্সিজেনের ঘাটতি হয় না, তাই উপকারী জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি ও কার্যকারিতা সঠিকভাবে বজায় থাকে।

● এই পদ্ধতিতে বিঘা প্রতি মাত্র ১ কেজি বীজ লাগে। অপরদিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে বিঘা প্রতি ৬-৮ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। কম বীজ ব্যবহার করেও এস. আর. আই পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে ৩০-৩৫ শতাংশ অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব।

● চাষীভাইয়েরা যে পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকেন, সেই তুলনায় এই পদ্ধতিতে সার কম প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে জৈবসার বেশি ব্যবহার করে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম করে বেশি সুফল পাওয়া যায়। সুতরাং, জৈব চাষের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি আদর্শ।

● প্রচলিত পদ্ধতির চাইতে সেচের জল এই পদ্ধতিতে ৩৫-৫০ শতাংশ কম লাগে। তাই যেসব এলাকায় সেচের জলের অভাব আছে, সেখানে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী।

● সেচের জন্য স্বল্প জল ব্যবহৃত হওয়ায় বাড়তি জল পানীয় বা অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

● প্রচলিত পদ্ধতিতে ধান জমিতে সব সময় জল ধরে রাখা হয়। এর ফলে মিথেন নামক একটি ক্ষতিকারক গ্যাস ধানের জমি থেকে নির্গত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এই মিথেন গ্যাস বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। অপরদিকে এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধানের জমিতে যেহেতু জল ধরে রাখা হয় না, তাই এই সমস্যা এক্ষেত্রে নেই।

● প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ করতে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জল অধিক মাত্রায় তুলে নেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ আর্সেনিকের প্রকোপ বাড়ছে। এস. আর. আই পদ্ধতিতে যেহেতু সেচের জল অনেক কম প্রয়োজন হয়, তাই এই সমস্যা অনেক কম।

● এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধানগাছের শিকড় জল ও খাদ্য উপাদান গ্রহণ করতে অনেক গভীরে শুধু প্রবেশ করে তাই নয়, গুচ্ছাকারে অনেক বেশি আয়তনে বিস্তৃতি লাভ করে। এই শিকড় অনেক বেশিদিন সজীব থাকে এবং ধান গাছ সহজেই মুখ্য, গৌণ ও অণুখাদ্য গ্রহণ করে সঠিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে ও অধিক ফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে গাছ ঝড়বৃষ্টিতেও সহজে পড়ে যায় না।

● এই পদ্ধতিতে রোয়া ধান প্রচলিত পদ্ধতির চাইতে বেশি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে।

● যেহেতু এস. আর.আই পদ্ধতিতে ধানের চারা অধিক দূরত্বে রোপন করা হয় তাই প্রতিটি ধানগাছ অধিক পরিমাণে আলো ও বাতাস পায় এবং এর ফলে রোগপোকার আক্রমণ কম হয়। আর রোগপোকার উপদ্রব কম হওয়ায়, রোগনাশক বা কীটনাশকের জন্য খরচ নেই বললেই চলে। সুসংহত শস্য রক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সহজেই ফসল ফলান সম্ভব।

● যেহেতু এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধানগাছের শিকড় শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সহজেই লাভ করে, যা যথেষ্ট সংখ্যক পাশকাঠি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অপরদিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে যেহেতু জমিতে সবসময় জল ধরে রাখা হয়, তাই শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ঘাটতি হয় এবং এর ফলে পাশকাঠির বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয় না।

● এস. আর. আই পদ্ধতিতে আগাছা তুলে বাইরে ফেলে না দিয়ে ধানের জমিতে মাটির সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হয়, এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জৈব পদার্থ মাটিতে যুক্ত হয় যা পরবর্তীকালে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক হয়।

● এস. আর. আই পদ্ধতিতে ফসল প্রচলিত পদ্ধতির ৭-৮ দিন আগে পরিপক্কতা লাভ করে। এর ফলে পরবর্তী ফসল সঠিক সময়ে বপন বা রোপন করা সম্ভব হয়।

● এক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে শীষযুক্ত পাশকাঠির সংখ্যা, প্রতি শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা ও দানার ওজন বেশি হওয়ায় বাড়তি ফলন পাওয়া যায়।

● এক্ষেত্রে দানার ফলন বৃদ্ধি ছাড়াও খড়ের ফলন বেশি হয়।

এস. আর. আই পদ্ধতিতে চারা রোয়া (Transplanting of Seedings)

● খুব অল্প বয়সের চারা খরিফ মরসুমে সাধারণত ৮-১২ দিন বয়সের এবং বোরো মরসুমে ১৫-১৮ দিনের চারা (দু'পাতা বিশিষ্ট) অতি যত্ন সহকারে (মাটিসহ) বীজতলা থেকে এমনভাবে তুলতে হবে যাতে শিকড়ে কোন প্রকার আঘাত না লাগে। চারা তোলার জন্য পুরু ১৮''× ১৫'' মাপের লোহার পাত ব্যবহার করা যেতে পারে।

● প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতি গুছিতে ৩-৪টি চারা নিয়ে লাইন থেকে লাইন ৮ ইঞ্চি এবং গুছি থেকে গুছি

৪-৬ ইঞ্চি দূরত্বে সাধারনত রোয়া করা হয়। অপরদিকে এস. আর. আই পদ্ধতিতে প্রতি গুছিতে কেবলমাত্র ১টি চারা ১০ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি দূরত্বে রোয়া করতে হবে।

● বেশি দূরত্বে রোয়া করার ফলে এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধানগাছের শিকড়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা কম হয়।

এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধান জমির অবস্থা কী ধরণের হওয়া উচিত : এই পদ্ধতিতে ধানক্ষেত্রে জল ধরে না রেখে কেবল ভেজা ভেজা রাখতে হয়। তাই এই পদ্ধতিতে অক্সিজেনের ঘাটতি বিশেষ হয় না। আর এ ধরনের জমির অবস্থা পেতে হলে ধানের জমির সমতল হওয়া দরকার এবং জমির বাড়তি জল বের করতে জমিতে ২০ ফুট অন্তর নালা কাটতে হবে। তবে প্রতি ৮ টি লাইন পর বা ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি অন্তর একটি করে নালা রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।

এস. আর. আই পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত : এই পদ্ধতিতে পাশকাঠির সর্বোচ্চ বৃদ্ধিকাল পর্যন্ত মাটি কেবল ভেজা রাখলেই চলবে। এই সময়ে ৩-৫ দিন অন্তর সেচ দিলেই চলবে। এর পরে ধান গাছে ফুল আসা ও দানা গঠন পর্যন্ত জমি কাদা কাদা থাকলেই চলবে। ধান গাছের সর্বোচ্চ বৃদ্ধিকালে মাঝে মাঝে জমি শুকিয়ে চুল চেরা করে দিয়ে পুনরায় সেচের জল দিলে জমি থেকে যেমন দূষিত গ্যাস নির্গত হয়, সেই সঙ্গে জিঙ্ক, তামা প্রভৃতি অণুখাদ্যের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অক্সিজেনের ঘাটতি না হওয়ায় উপকারী জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি দ্রুত হয়, যা পরবর্তীকালে খাদ্যোপাদানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে।

এস. আর. আই পদ্ধতিতে জমিতে খাদ্যউপাদানের চাহিদা কিভাবে মেটানো উচিৎ : এই পদ্ধতিতে জৈবসারের মাধ্যমে গাছের খাদ্যউপাদান সরবরাহের দিকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। এজন্য একর প্রতি কমপক্ষে ২ টন ভালো মানের জৈবসার (গোবর সার বা পাতা পচাসার) রোয়ার ৩-৪ সপ্তাহ পূর্বেই মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে কেঁচোসার সংগ্রহ করতে পারলে পরিমাণে কম লাগবে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী রাসায়নিক সারের পরিবর্তে বায়ো N.P.K. জীবাণুসার, রক ফসফেট, উন্নত মানের জৈব সার/খোল সার, তরল জৈব সার প্রভৃতির সাহায্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য জোগাতে হবে। এছাড়া এস. আর. আই পদ্ধতিতে ধানগাছের শিকড় থেকে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয়, যা মাটির উর্বরতার মান বাড়াতে সাহায্য করে।

এস. আর. আই পদ্ধতিতে আগাছার সমস্যা কীভাবে মেটানো সম্ভব : এই পদ্ধতিতে ধানক্ষেতে যেহেতু জল ধরে রাখা হয় না, তাই আগাছার সমস্যা বেশি হয়। এজন্য রোয়ার ১০-১২ দিন পর থেকে ৩-৪ বার আগাছার সমস্যা দূর করতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে ধানক্ষেত থেকে আগাছা তুলে নিয়ে অন্যত্র অথবা সারের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সাধারণত চক্রযুক্ত প্যাডি উইডার ধানের দুটি লাইনের মাঝ বরাবর টেনে দিয়ে আগাছা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। এর ফলে জমিতে অক্সিজেনের সরবরাহ যেমন বাড়ে, একই সঙ্গে আগাছার সমস্যাও থাকে না। এছাড়া এই পদ্ধতিতে আগাছা যেহেতু মাটির সঙ্গেই মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাই মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণও অনেকটাই বৃদ্ধি পায়।

'শ্রী' পদ্ধতিতে ধানের সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি

● বীজ অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। এজন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য ১০ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ডিরিডি ব্যবহার করা যেতে পারে।

● বীজতলায় অধিকমাত্রায় জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনও রাসায়নিক সারের প্রয়োজন নেই। বীজতলা পলিথিনের ওপর বা মাটির ওপরও করা যেতে পারে।

● প্রতি শতক বীজতলায় ২.৫ কেজি বীজ হাল্কা ভাবে বীজ তলায় ফেলতে হবে। উক্ত বীজতলায় তৈরি চারা সঠিকভাবে অঙ্কুরোদগম হলে এক একর জমিতে রোয়া করা যাবে। অপরদিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে ১০ শতক বীজতলার চারা এক একরে রোয়া করা হয়। শ্রী পদ্ধতিতে এক একর জমি রোয়ার জন্য ২৫′× ৪′ মাপের ৪-৫টি বীজতলার প্রয়োজন হয়।

● মূল জমি ভালভাবে সমতল করে নিয়ে ২০ ফুট অন্তর নালা কাটতে হবে। বাড়তি জল যাতে বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য জমির চারধারেও নালা কাটতে হবে।

● মূল জমিতে একর প্রতি কমপক্ষে ২ টন গোবর বা পাতা পাঁচা সার রোয়ার ৩-৪ সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

● খরিফে মূল সার হিসাবে একর প্রতি ৪.৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৯ কেজি ফসফেট ও ৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। বোরোতে এই পরিমাণ হবে যথাক্রমে নাইট্রোজেন ১০ কেজি, ফসফেট ২০ কেজি ও পটাশ ১৩ কেজি।

● এস. আর. আই পদ্ধতিতে চারা দু'পাতা হলে (খরিফের ১০-১২ দিনের এবং বোরোতে ১৫-১৮ দিনের) মাটি সহ (শিকড়ে যেন আঘাত না লাগে) চারা তুলে নিয়ে ১০ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি দূরত্বে রোয়া করতে হবে।

● প্রথম চাপান ও নিড়াণি রোপনের ১০-১৫ দিনের মাথায় এবং বোরোতে ১৫-১৮ দিনের মাথায় দিতে হবে। চাপান সার হিসাবে এই সময় একর প্রতি ৪.৫ কেজি এবং বোরোতে ১০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে জমি ঘেঁটে দিতে হবে।

● খরিফে দ্বিতীয় চাপান দিতে হবে ২০-২৫ দিনের মাথায় এবং বোরোতে ৩০-৩৫ দিনের মাথায়। এক্ষেত্রে, বিঘা প্রতি নাইট্রোজেন সারের মাত্রা হবে খরিফে ৪.৫ কেজি এবং বোরোতে ১০ কেজি।

● তৃতীয় চাপান খরিফে রোপনের ৩৫-৪০ দিনের মাথায় বা কাঁচথোড়ের আগে এবং বোরোতে রোপনের ৪৫-৫৫ দিনের মাথায় বা কাঁচথোড়ের আগে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে একর প্রতি সারের পরিমাণ হবে খরিফে ৪.৫ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৩ কেজি পটাশ এবং বোরোতে ১০ কেজি নাইট্রোজেন ও ৭ কেজি পটাশ।

মনে রাখতে হবে ১ কেজি নাইট্রোজেন = ২.২ কেজি ইউরিয়া।

১ কেজি ফসফেট = ৬.২৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট।

১ কেজি পটাশ = ১.৬৬ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ।

● রোগপোকার আক্রমণ হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এস. আর. আই পদ্ধতিতে চাষ করার সময় যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে

● মূল জমিতে যেন প্রয়োজন মত জল ঢোকানোর ও বের করানোর ব্যবস্থা থাকে।

● চারা দু পাতা হলেই যত দ্রুত সম্ভব রোয়া করতে হবে।

● ধানের জমি চুলচেরা (Hair crack) হয়ে গেলেই জল ঢুকিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে ছিপছিপে জল মাঝে মাঝে ধরে রাখলেই চলবে।

● জমির মধ্যে মাঝে মাঝে গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখির বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৬.২ ড্রাম সীডারের সাহায্যে ধানের চাষ

'ড্রাম সীডার' ধানের বীজ বোনার একটি সহজ সরল যন্ত্র। এতে প্লাস্টিকের তৈরি ৪টি ড্রাম একটি লোহার দন্ডের উপর সাজান এবং দন্ডের দুই প্রান্তে ২ টি চাকা এবং যন্ত্রটি টানার জন্য একটি হাতল লাগান থাকে। যন্ত্রটির ওজন মাত্র সাত কেজি।

ড্রাম সীডার ব্যবহারের সুফল ঃ

- চাষের খরচ কমানো যায় এবং নীট লাভ বেশি হয়, কারণ
- এক ব্যক্তি ১ দিনে এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় ৭ বিঘা জমি বুনতে পারে। অঙ্কুরিত ধান বীজ বোনা হয়। সুতরাং, বীজতলা তৈরি করা বা চারা রোপন করা প্রয়োজন হয় না। সেচের জল কম লাগে এমন কি রোগপোকার আক্রমণও কম হয়।
- রোয়া ধানের তুলনায় ১০-২০ শতাংশ বেশি ফলন হয়। সারিতে বীজ বোনা হয় বলে পরবর্তী শস্য পরিচর্যা সহজ হয়।
- গাছ সুস্থ সবল ভাবে বেড়ে ওঠে। বোরো বীজতলায় রোগের সম্ভাবনা এড়ানো যায়। জমির সমস্ত শীষ একই সঙ্গে পাকে।
- রোয়া ধানের তুলনায় এই ফসল ১০-১৫ দিন আগে পাকে।

ড্রাম সীডার কিভাবে ব্যবহার করবেন ঃ

- ধানের বীজ ১ দিন ভিজিয়ে রেখে এবং ২-৩ দিন জাঁক দিয়ে অঙ্কুরিত করতে হবে। সমস্ত বীজই সামান্য অঙ্কুরিত হলে ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে ঝরঝরে করে ড্রামে ভরতে হবে।
- ড্রামে বীজ এমনভাবে ভরতে হবে যেন ড্রামের ১/৩ অংশ খালি থাকে এবং ড্রামের গায়ে আঁকা ত্রিভুজাকৃতির চিহ্ন যেন সামনের দিক নির্দেশ করে।
- ড্রামের পাতলা ছিদ্র খোলা রাখলে প্রতি ৩৩ শতকে ৩ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। একজন ১ ঘন্টায় ১ বিঘা জমি বুনতে পারবে।
- জমি কাদা করে যত্ন সহকারে মই দিয়ে সমান করতে হবে এবং বীজ বোনার ১ দিন আগে অতিরিক্ত জল বের করে দিতে হবে।
- বীজ বোনার পর ৩-৪ দিন সেচ দেওয়া যাবে না। পরের ১০-১২ দিন শুধু জমি ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- চারা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলের পরিমাণ বাড়াতে হবে, তবে ২.৫-৩ সে.মি-এর বেশি জল রাখার দরকার নেই।

ড্রাম সীডারের সাহায্যে ধানের চাষ ঃ

জমি নির্বাচন : বোরো এবং প্রাকখরিফ মরশুমে যে কোনো সেচসেবিত জমিতে এবং খরিফ মরশুমে উঁচু এবং মাঝারি উঁচু জমিতে এই পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

বোনার সময় ঃ বোরো মরশুমে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে বীজ বোনা ভালো। খরিফ মরশুমে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বুনতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ সমস্ত ফসফেট ও ২/৩ অংশ পটাশঘটিত সার শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার খরিফে বোনার ১৫ দিন পর থেকে এবং বোরো চাষে বীজ বোনার ২০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

স্বল্প মেয়াদি বোরো ধানে একর প্রতি N : P : K - ১০০ ঃ ৫০ ঃ ৫০ এই অনুপাতে প্রয়োজন। বোরোতে

দ্বিতীয় চাপান বোনার ৫০-৫৫ দিন পরে এবং শেষ বার কাঁচা থোড় অবস্থায় প্রয়োজনীয় খাবার জৈব ও জীবাণু সারের মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগপোকা দমন ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ

সঠিক পরিচর্যা করলে রোগপোকার আক্রমণ কম হয়। প্রয়োজনভিত্তিক কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত। 'প্যাডি উইডার' এর সাহায্যে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা ভাল। অন্যথায় নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলতে হবে।

বোরো ধানে বিভিন্ন পদ্ধতির আয়-ব্যায়ের হিসাব (বিঘা প্রতি)

		ড্রাম সীডার পদ্ধতি	প্রচলিত পদ্ধতি
১।	চাষের মোট খরচ	৩৩২৫ টাকা	৪০৫৫ টাকা
২।	মোট ফলন (ধান)	৬৯০ কেজি	৬৬০ কেজি
৩।	মোট আয়	৫৫৭৫ টাকা	৫৩৫০ টাকা
৪।	নীট লাভ	২২৫৫ টাকা	১২৯৫ টাকা

ড্রাম সীডার প্রস্তুতকারক শ্রী অভিজিত দে, বেহালা (৯৪৩৩০১২১৬৭)।

আমন ধানের পর পায়রা গম বা বিনা কর্ষণে গম চাষ

ধান এবং গম আমাদের প্রধান তন্ডুল শস্য। সারা দেশে ধান-গম শস্য পর্যায় প্রায় ১০ মিলিয়ন হেক্টরের বেশি জমিতে করা হয়। তবে আমন ধানের পর গম চাষ নির্ভর করে ধান কাটার সময়ের উপর। ধান কাটা দেরিতে হলে গম বোনার কাজে দেরি হয়। এর ফলে গমের ফলন কমে যায়। আমাদের রাজ্যে প্রায় ৬.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ হয়। এখানে ধান-গম শস্যক্রম তুলনামূলকভাবে কম জনপ্রিয়। মূল কারণ, গম কাটার সময় বৃষ্টিপাত এবং গম ঝাড়াই করার অসুবিধা। মনে রাখা জরুরি, আমন ধানের পর গম চাষে ভূগর্ভস্থ জলের খরচ অনেক কম। বোরো ধান চাষের প্রবণতা বেশি। অথচ, এক একর বোরো ধান চাষে যা জল লাগে, সেই জলে ৫-৬ গুণ এলাকায় ভালভাবে গম চাষ করা সম্ভব। নানা কারণে এরাজ্যে গমচাষ কমে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে মাঝারি এবং নীচু জমিতে বোরো ধান চাষে জলের খুবই সমস্যা রয়েছে। খরিফ ফসল কাটতে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ লেগে যায়। সেখানে মাটিতে চাষ দিয়ে গম বুনতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি বা শেষ সপ্তাহ লেগে যায়। এই সব জমিতে বিনা কর্ষণে কার্তিকের মাঝামাঝি ধান কাটার আগেই 'পায়রা গম' চাষ করা সম্ভব। ধান কাটার পর সার এবং বীজ যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বোনা দরকার। এইভাবে আমন ধান জমির মাটির রসকে কাজে লাগিয়ে বিঘা প্রতি ২.৫-৩.০ কুইন্টাল ফলন (একরে ৭.৫-৯.০ কু.) পাওয়া সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে সঠিক সময়ে গম বোনা সম্ভব। এতে মাটির রসকে কাজে লাগিয়ে কম সেচে এবং সর্বোপরি চাষের খরচ কমিয়ে গম চাষে লাভবান হওয়া সম্ভব।

গমের পায়রা চাষে জলের সাশ্রয় (২৪০ টাকা), সময়মত বীজ বোনা (কার্তিকের ১৫-২০ তারিখ), খরচ ও আয়ের অনুপাত (১:৪) এবং চাষের মোট খরচ (প্রায় ৬৫০ টাকা/বিঘা) খুব কম। বোরো ধান চাষে বিঘা প্রতি জলের খরচ ১০০০ টাকা, খরচ এবং আয়ের অনুপাত ১:২ এবং বিঘা প্রতি চাষের খরচ প্রায় ৩৫০০ টাকা লাগে। সুতরাং, বোরো ধানের এলাকা খানিকটা কমিয়ে সেই জমিতে এই পদ্ধতিতে গম বোনা যেতে পারে। উপরন্তু যে এলাকায় সেচের জলের টান পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেইসব এলাকায় ঝুঁকি না নিয়ে 'পায়রা' গম বা 'বিনা চাষে' গম চাষ যুক্তিযুক্ত।

চাষ পদ্ধতি : বৃষ্টি হলে জল জমবে না এরূপ মাঝারি ও নীচু জমিতে 'পায়রা গম' বা যন্ত্রে বোনা গম চাষ করা যায়, যেখানে ধান কাটতে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ হয়।

পায়রা গম বীজ আমন ধান কাটার ১০-১২ দিন আগে ধানের মধ্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজ বোনার সময় জমিতে রস থাকবে, কিন্তু জল থাকবে না। বিঘা প্রতি ২০ কেজি বীজ ও একটি 'জারমিনেইড প্যাকেট' G-20 ২০ লিটার জলে গুলে ২ ঘন্টা ভেজাতে হবে। পরে একটু ছায়ায় শুকিয়ে ছড়াতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য UP ২৬২, রাজলক্ষী (HD1735), UW ৪৬৮, PBW ৩৪৩, HD ২৭৩৩ ও ২৬৪৩ ইত্যাদি উপযুক্ত জাত।

সার প্রয়োগ : মূল সার হিসাবে বিঘা প্রতি ২০ কেজি ১০ঃ২৬ঃ২৬ সার বীজ বোনার ৪-৫ দিন আগে জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। এর পর মুকুট শিকড় ছাড়ার সময় প্রথম সেচ (বোনার ৩০ দিন পর) ও চাপান হিসাবে ১০-১২ কেজি ইউরিয়া এবং দ্বিতীয় সেচের সময় ৫-৭ কেজি ইউরিয়া চাপান দিতে হবে। ফুল আসার সময় তৃতীয় সেচ দিতে হবে। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করলে জীবাণু সার দিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদান সরবরাহ করতে হবে।

পরিচর্যা : বোনার ৩০-৩২ দিন পর একবার 'জিলেটস্পার্ক' এবং ৪০-৪৫ দিনের মাথায় 'ফ্ল্যাশ ট্রিগার' স্প্রে করলে ফলন বাড়ে। বোনার ১১০-১২০ দিন পর গম কাটার উপযোগী হয়।

সারণি ঃ বিভিন্ন পদ্ধতিতে গম চাষের ফলন, খরচ ও লাভ

চাষ পদ্ধতি	সেচের খরচ বিঘা প্রতি (টাকা)	লাগানোর সময়	পাশ কাঠির সংখ্যা (প্রতি বর্গ মিটারে)	বিঘা প্রতি ফলন (কুইন্টাল)	মোট খরচ বিঘা প্রতি (টাকা)	লাভ বিঘা প্রতি (টাকা)
পায়রা গম	২৪০	কার্তিক ২০	২০০-২২২	২.৬ - ৩.০	৬৩০	১৯৭০
যন্ত্রে বোনা গম	৩৬০	অগ্রহায়ণ ৫	২৮৫-৩১০	২.৯ - ৩.৬	৮৭০	২৬৩০
প্রচলিত পদ্ধতি	৪৮০	অগ্রহায়ণ ১৫	৩৫০-৩৬৫	৪.৪-৪.৬	৯৯০	৩৫১০
বোরো ধান	১০০০	—	—	—	৩৪৭৫	৩০০৫

সূত্র ঃ কৃষি বিধান (B.C.K.V., July-Sept., 2010 সংখ্যা)

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ৭ ❐ শস্যরক্ষা পদ্ধতি

গঠন

৭.১ রাসায়নিক পেস্টিসাইড
৭.২ উদ্ভিদজাত কীটনাশক
৭.৩ সুসংহত শস্য সুরক্ষা
৭.৪ ফসলের রোগপোকা সহনশীল কিছু জাত

পেস্ট কী ?

যে সকল পোকা, ছত্রাক, নেমাটোড, ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, আগাছা, ইঁদুর, পাখি প্রভৃতি ফসলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধন করে, তাদের পেস্ট বলে।

পেস্টিসাইড কী ?

পেষ্ট বা শস্য শত্রুকে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সকল রাসায়নিক বা জৈব পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাদের পেস্টিসাইড বলা হয়। নিয়ন্ত্রণকারী পেস্টের নাম অনুসারে পেস্টিসাইডের নামকরণ করা হয়, যেমন

১। Insecticide	কীটনাশক	পোকা নিয়ন্ত্রণ করে
২। Fungicide	ছত্রাকনাশক	রোগ নিয়ন্ত্রণ করে
৩। Weedicide/Herbicide	আগাছানাশক	
৪। Rodenticide	ইঁদুরনাশক	
৫। Acaricide	মাকড়নাশক	
৬। Nematicide	নেমাটোডনাশক	
৭। Bactericide	ব্যাকটেরিয়ানাশক	ইত্যাদি

পেস্টিসাইডকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

ক) রাসায়নিক পেস্টিসাইড : ইহা দ্রুত কার্যকরী কিন্তু পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং জৈব কৃষিতে ব্যবহৃত হয় না।

খ) জৈব বা জীবাণুঘটিত পেস্টিসাইড : ইহা পরিবেশ বান্ধব।

৭.১ রাসায়নিক পেস্টিসাইড

১। পোকানাশক ঃ কারটাপ, ট্রায়াজোফস, ম্যালাথিয়ন, কুইনালফস ইত্যাদি।

২। ছত্রাকনাশক ঃ হেক্সাকোনাজল, প্রোপিকোনাজল, ক্যাপটান, ম্যানকোজেব ইত্যাদি।

৩। আগাছানাশক ঃ বুটাক্লোর, টি.সি.এ., ২-৪-ডি (2-4-D) ক্লোমাজোল, ইত্যাদি।

৪। মাকড়নাশক ঃ ফেনাজাকুইন, ডাইকোফল, অ্যাবামেক্টিন ইত্যাদি।

৫। ব্যাকটেরিয়ানাশক ঃ স্ট্রেপ্টোমাইসিন, স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন ইত্যাদি।

৬। কৃমিনাশক ঃ কার্বোফুরান, ফিউরাডান

৭) ইঁদুরনাশক ঃ জিঙ্ক ফসফাইড, ফিউমারিন প্রভৃতি

রাসায়নিক কীটনাশক

চাষবাসে শস্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যেমন কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী এবং অন্যান্য আরও বহু কৃষি রসায়ন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেগুলি মূলত ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ

(১) পারদ ঘটিত ঃ মারকিউরিক ক্লোরাইড, মিথোক্সিইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড - সেরেসান, অ্যাগালল, সেরেসান ড্রাই, এমিসান ইত্যাদি;

(২) অরগ্যানো ক্লোরিন (জৈব-ক্লোরিন) জাত ঃ ডি.ডি.টি., বিএইচসি, ডাইএলড্রিন, অলড্রিন, হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি;

(৩) কার্বামেট ঃ কার্বোসালফান, কার্বারিল, অ্যাল্ডিকার্ব, মিথোমিল ইত্যাদি;

(৪) অরগ্যানো ফসফেট বা জৈব ফসফেট ঃ অ্যাসিফেট, ক্লোরপাইরিফস, ডায়াজিনন, ডাইমিথোয়েট, ডাইক্লোরভস, ম্যালাথিয়ন, ফেনিট্রোথিয়ন, ফোরেট ইত্যাদি;

(৫) সিন্থেটিক পাইরিথ্রয়েড ঃ সাইপারমিথ্রিন, ডেল্টামেথ্রিন, ফেনভালেরেট, ইথোফেনপ্রক্স, ল্যাম্ডা-সায়ালোথ্রিন ইত্যাদি;

(৬) নিওনিকোটিনয়েডস ঃ অ্যাসিমাপ্রিড, ইমিডাক্লোপ্রিড, ক্লোথায়ানিডিন, থায়োমেথোক্সাম ইত্যাদি।

● কৃষি জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশকের পরিণতি

দেখা গেছে যে **দানাদার কীটনাশক সরাসরি মাটিতে প্রয়োগ করা হয়** যার অতি অল্প অংশই **ক্ষতিকারক** কীটসহ উপকারী পোকাকেও মেরে ফেলে এবং **বেশির ভাগটাই মাটিতে জলীয়** অংশে মিশে যায়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশকের মাত্র ০.১ শতাংশ যে পোকা মারার জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়েছে তার কাছে পৌঁছেছে এবং বাকি প্রায় সমস্তটাই কৃষি জমিতে বায়ু, জল ও মাটিতে মিশে গেছে। উপকারী পোকার এবং মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবাণুর দেহে প্রবেশ করে তাদের জৈবনিক ক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে ও প্রকৃতিতে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও—

১) কিছু অংশ মাটিতে জলে মিশে ও মাটির কণায় আবদ্ধ হয়ে রয়ে যায়;

২) কিছুটা চুঁইয়ে মাটির তলায় ভূগর্ভস্থ জলে গিয়ে মিশে যায়;

৩) কিছুটা জলের সঙ্গে গড়িয়ে স্থানীয় জলাশয়ে বা নদীনালায় গিয়ে পড়ে;

৪) কিছু অংশ শিকড়ের মাধ্যমে গাছের দেহে প্রবেশ করে;

৫) কিছু অংশ রাসায়নিক ভাবে বা কোনও জীবাণুর মধ্যস্থতায় ভেঙে যায়;

৬) কিছু অংশ উড়ে গিয়ে বাতাসে মিশে যায়।

মাটির উপর কৃষি রসায়নের প্রভাব

বেশ কিছু কীটনাশক মাটিতে বা পরিবেশে দীর্ঘ দিন রয়ে যায় এবং কৃষি পরিবেশের উপর ও তার উৎপাদিকা শক্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কীটনাশকগুলি মূলত মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন অনুজীব ও সাধারণভাবে স্থানীয় প্রাণীকুলের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। মাটিতে কীটনাশকের ব্যবহার না করে এবং জৈব পদার্থ বেশি ব্যবহার করে মাটির উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বাড়ানো যায় এবং ফসলের উৎপাদনও এর ফলে কৃষি রসায়ন ব্যবহার করে সাধারণ চাষের তুলনায় প্রায় এক চতুর্থাংশ বাড়ানো সম্ভব। মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে দেখা গেছে প্রয়োগ করা কীটনাশক তাড়াতাড়ি বিয়োজিত হয়ে যায়।

বায়ু দূষণে কৃষি রসায়নের প্রভাব

জমিতে প্রয়োগ করা কীটনাশক বাতাসে কণা আকারে ভেসে থেকে বা বাতাসে ভাসমান ধূলিকণায় আটকে থেকে তা পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার সমস্ত ধরনের প্রাণীদের দেহে বিষক্রিয়া ঘটায়। কীটনাশক প্রয়োগের সময় বাতাসের গতিবেগ, তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর কীটনাশকের এই ছড়িয়ে পড়া নির্ভর করে। বাতাসের গতিবেগ বেশি হলে, আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে ও পরিবেশে তাপমাত্রা বেশি হলে কীটনাশক বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। স্প্রে করা কীটনাশক বা ধূমায়িতকরণের জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক থেকে কিছু উদ্বায়ী জৈব যৌগ বাতাসে মিশে যায় ও বাতাসে উপস্থিত অন্য কিছু রসায়নের সঙ্গে মিশে বায়ু দূষণকারী পদার্থ ট্রপোস্ফেরিক ওজোন-এর সৃষ্টি করে।

কিছু কীটনাশক ও রোগনাশকের কার্যকারিতা ও সুপারিশ মাত্রা

রাসায়নিক নাম	কার্যকারিতা	বাণিজ্যিক নাম	মাত্রা
দানাদার কীটনাশক			
কার্বোফিউরান ৩ জি	অন্তর্বাহী	ফিউরাডন, কার্বোফিউরান ডায়াফুরান, ফুরাটক্স ইত্যাদি	১২ কেজি/একর
কারটাপ ৪ জি	অন্তর্বাহী	পাদান, ক্রিটাপ, কেলডান ইত্যাদি	১০ কেজি/একর
ফ্রিপ্রোনিল ০.৩ জি	অন্তর্বাহী	রিজেন্ট ইত্যাদি	৭.৫ কেজি/একর
ফোরেট ১০ জি	অন্তর্বাহী	থাইমেট, ফোরাটক্স ধন-১০ জি ইত্যাদি	৪ কেজি/একর
ছড়ানোর গুঁড়ো (ডাস্ট) কীটনাশক ঃ			
ফেনভেলারেট ০.৪% ডি.পি.	স্পর্শ ও উদর	টাটাফেন, ফেনকিল ইত্যাদি	১০ কেজি/একর
কুইনালফস ১.৫% ডি.পি.	স্পর্শ ও উদর	ধানুলাক্স, ইষ্টালাক্স, কিনালাক্স, একালাক্স, অনুফস ইত্যাদি	১০ কেজি/একর
ক্লোরোপাইরিফস ১.৫% ডি. পি.	স্পর্শ ও উদর	র‍্যাডার, ফোর্স ইত্যাদি	১০ কেজি/একর
কার্বারিল ৫% ডি.পি.	স্পর্শ ও উদর	সেভিন, হিউইন ইত্যাদি	১০ কেজি/একর
জলে গোলা কীটনাশক ঃ			
ক্লোরোপাইরিফস ২০% ই. সি	স্পর্শ ও উদর	ডার্সবান, ডারমেট, ধনবান ক্লাসিক, অনুবান ইত্যাদি	২.৫ মিলি/লি.
ফিপ্রোনিল ৫% ই. সি	স্পর্শ ও উদর ও অন্তর্বাহী	রিজেন্ট, আর্জেন্ট ইত্যাদি	১ মিলি/লি.
ট্রায়াজোফস ৪০% ই. সি	স্পর্শ ও উদর	হোষ্টাথিয়ন, ট্রাইফস ইত্যাদি	১ মিলি/লি.
ট্রায়াজোফস ২০% ই. সি	স্পর্শ ও উদর	ট্রেলকা, জানে ইত্যাদি	২ মিলি/লি.
অ্যাসিফেট ৭৫% ডব্লু. পি.	স্পর্শ ও অন্তর্বাহী	স্টারথেন, লুসিড, অ্যাসাটাফ, বিলফেট ইত্যাদি	০.৭৫ মিলি/লি.
ফেনবুকার্ব (বিপিএমসি) ৫০% ই. সি.	স্পর্শ ও উদর	বিপভিন, মার্লিন, নাক ইত্যাদি	১ মিলি/লি.

কার্টাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০% এস. পি.	স্পর্শ ও উদর ও অন্তর্বাহী	পাদান, বীকন, ক্রিটাপ কেলডান ইত্যাদি	০.৭৫ মিলি./লি.
ডাইক্লোরভস্ ৭৫% ই. সি.	স্পর্শ ও উদর	ক্রীভ্যাপ, নুভান, ভেপোনো, সুক্লোর ইত্যাদি	০.৭৫ মিলি./লি.
ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮% এস. এল.	অন্তর্বাহী	কনফিডর, টাটামিডা, মিডিয়া, অ্যাটম, জোস, জাম্বো ইত্যাদি	১ মিলি./৫ লি.
ব্লুপ্রোফেজিন ১৫% এস. সি.	অন্তর্বাহী	অ্যাপ্লড ইত্যাদি	১.৫ মিলি./ লি.
প্রোফেনোফস ৪০% এস. সি. + সাইপারমেথ্রিন ৪% ই. সি.	স্পর্শ ও উদর	রকেট, পারমিট, পলিট্রিন-সি ইত্যাদি ..	১ মিলি./ লি.
ক্লোরোপাইরিফস ৫০% ই. সি. + সাইপারমেথ্রিন ৫% ই. সি.	স্পর্শ ও উদর	নুরেল-ডি, এনাকোন্ডা, নিউরোকোম্বি ইত্যাদি	১.৫ মিলি./ লি.
ইঁদুর নাশক ঃ			
ব্রোমোডাইলন ০.০০৫% আর. বি.	অ্যান্টিকোয়া-গুলেন্ট	র‍্যাটক্স, রোবন ইত্যাদি	২ গ্রাম ওষুধ ও ৯৮ গ্রাম খাদ্য
জিংক ফসফাইড ৮০%	উদরজনিত	কামান্ডো, রাটকিল ইত্যাদি	২ গ্রাম ওষুধ ও ৯৮ গ্রাম খাদ্য
জলে গোলা রোগনাশক/ছত্রাকনাশক ঃ			
কার্বেন্ডাজিম ৫০% ডব্লু. পি.	অর্ন্তবাহী	ব্যাভিষ্টিন, ডেরোসাল, ধানুষ্টিন, বেনগার্ড, অ্যারেষ্ট, কারজিম ইত্যাদি	১ গ্রা./ লি.
ট্রায়ামফস ৪৮% ই.সি.	অর্ন্তবাহী	কিটাজিন, ট্যাগকিট ইত্যাদি	১ লিলি./ লি.
এডিফেনফস ৫০% ই.সি.	অর্ন্তবাহী	হিনোসান, ধানুসান, ক্লিক ইত্যাদি	১ মিলি./ লি.
ভ্যালিডামাইমিন ৩% এল	অর্ন্তবাহী	শিথমার, রাইজোসিন, ভ্যালিডান ইত্যাদি	২ মিলি./ লি.
ট্রাইসাইক্লাজোল ৭৫% ডব্লু.পি.	অর্ন্তবাহী	বিম, ট্রপার, ট্রিম, বান ইত্যাগি	০.৫ গ্রাম/ লি.
হেক্সাকোনাজোল ৫% ই.সি.	অর্ন্তবাহী	কনটাফ, সিতারা, ডেনজন ইত্যাদি	১.৫মিলি/ লি.
প্রোপিকোনাজোল ২৫% ই.সি.	অর্ন্তবাহী	টিল্ট, ধন, রেজাল্ট ইত্যাদি	০.৭৫মিলি/ লি.
আইসোপ্রোথিওলেন ৪০% ই.সি.	অর্ন্তবাহী	ফুজিওয়ান, সাম্বা, উর্জা ইত্যাদি	১মিলি/ লি.
কারপ্রোপামিড ২৭.৮% এস. সি.	অর্ন্তবাহী	উইন, প্রটোগা ইত্যাদি	১মিলি/ ৪লি.
থাইফ্লুজামাইড ২৪% ই.সি.	অর্ন্তবাহী	স্পেনসার ইত্যাদি	১মিলি/ লি.
ইপক্সিকোনাজোল ১২.৫% এস.সি.	অর্ন্তবাহী	ওপাল ইত্যাদি	২মিলি/ লি.
ম্যানকোজেব ৭৫% ডব্লু. পি..	স্পর্শজনিত	ডায়থেন এম-৪৫, ইন্দোফিল এম-৪৫, স্পর্শ, সুজেম ইত্যাদি	২.৫ গ্রা/ লি.

ব্যাকটেরিয়ানাশক (অ্যান্টিবায়োটিক) ঃ

স্ট্রেপটোসাইক্লিন (৯:১) এস. পি.	অর্ন্তবাহী	স্ট্রেপটোসাইক্লিন, কেসাইক্লিন, অনুসিন ইত্যাদি	১ গ্রা./ ১০ লি.
ভ্যালিডামাইসিন ৩% এল	অর্ন্তবাহী	শিথমার, রাইজোসিন ইত্যাদি	২ মিলি./লি.

৭.২ উদ্ভিদজাত কীটনাশক

বর্তমানে রাসায়নিক কীটনাশকের নানারকম ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখে সুসংহত রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় বিভিন্ন **উদ্ভিদজাত কীটনাশক** প্রয়োগে কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। **নিম, তামাক, ধুতরা, চন্দ্রমল্লিকা, করঞ্জা** ইত্যাদি **গাছের নির্যাস থেকে কীটনাশক তৈরি করা হয়।** অনেক দেশি-বিদেশি সংস্থা এদিকে নজর দেওয়ায় রিপেলিন, নিমিন, নিমগোল্ড, নিমশীল্ড ইত্যাদি নানারকম কীটনাশক বাজারে এসেছে এবং কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলি রাসায়নিকভাবে সুস্থিত, আলোক সংবেদনশীল নয়, গুদামজাত করে রাখার উপযোগী, সহজে তৈরি করা যায় এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন ও পরিবেশ অনুকূল কীটনাশক। এছাড়া **থুজা, বাগানবিলাস, জোয়ার** ইত্যাদি গাছের **নির্যাস ছত্রাক রোগের প্রতিষেধক।**

জৈব রোগপোকানাশক শুধু যে পরিবেশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়, এর জন্য খরচও অনেক কম লাগে। কম খরচে অধিক লাভ পাওয়া যায়। লক্ষ্যবস্তু ছাড়া অন্য কারও ক্ষতি করে না। জৈবসার সহ অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলেমিশে কার্যকরী হয়। রাসায়নিক পদার্থের চটজলদি তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা এবং সহজলভ্যতার জন্য মানুষ রাসায়নিক রোগপোকানাশকের দিকে ঝুঁকছে এবং পরিবেশ ও ফসলের বন্ধুপোকার ক্ষতি করছে। যদিও সাম্প্রতিক নানারকম পদক্ষেপ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়ার ফলে ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এ বিষয়ে চাষীদের মধ্যে সচেতনতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এন.পি.ভি., ক্রিপটোলেমাস, ট্রাইকোগ্রামা ইত্যাদি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিঁপড়ে, মাছি, বিউভেরিয়া, লিমুনেরিয়া ছত্রাক, নিউক্লিয়ার পরিহেড্রোসিস ভাইরাস, ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস জীবাণু, গ্রানুলোসিস ভাইরাস ইত্যাদি পরিবেশে সবসময় থাকে ও তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় থাকে। এছাড়া **ব্যাঙ, বক, বিভিন্ন ধরনের পাখি, ক্ষতিকারক পোকা ও ল্যাদা ধরে** খায়। রাসায়নিক **কীটনাশক প্রয়োগ করার** ফলে এই **বিপুল সংখ্যক পরিবেশের বন্ধু পোকামাকড়ের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।** তাই, রোগপোকা নিয়ন্ত্রণে রাসায়নিক প্রয়োগের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে জৈব পদার্থের ওপরে। নিমপাতা, আতাপাতা, নিমবীজ, নিমগাছের ফল, নিমখোল, আতা বীজ, তামাক পাতা ইত্যাদি থেকে ঘরোয়া উপায়ে কম খরচে অধিক কার্যকরী কীটনাশক তৈরি করা যায়।

ঘরোয়া কীটনাশক তৈরি করার পদ্ধতি ঃ

ক) **নিমবীজের দ্রবণ (৫%)**

৫০ গ্রাম খোসা ছাড়ানো বা ৭৫ গ্রাম খোসা-সহ নিমবীজ এমনভাবে গুঁড়ো করতে হবে যাতে তেল বেরিয়ে না যায়। গুঁড়ো মিহি কাপড়ে বেঁধে ১২ ঘন্টা ১ লিটার জলে ডুবিয়ে রেখে নিংড়ে নিতে হবে। এরপর ১ চা চামচ নরম সাবান ও ১ চা চামচ তিল তেল মেশাতে হবে। ৩-৮ মাসের পুরনো নিমবীজ ব্যবহার করা যাবে। মিশ্রণ স্প্রে করার উপযুক্ত সময় হল বিকেলবেলা। প্রখর সূর্যালোকে নিমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

খ) **নিমপাতার নির্যাস (২০%)**

২০০ গ্রাম নিমপাতা ১ লিটার জলে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে, চটকে, ছেঁকে নিতে হবে। এক চামচ নরম সাবান মেশাতে হবে এবং মিশ্রণ বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

গ) **নিমখোলের নির্যাস (২০%)**

২০০ গ্রাম নিমখোল ১ লিটার জলে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে, চটকে, ছেঁকে নিতে হবে। এক চামচ নরম সাবান মেশাতে হবে এবং মিশ্রণ বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

ঘ) **নিমতেলের দ্রবণ (৩%)**

৩০ মিলিলিটার নিমতেল ১ লিটার জলে মিশিয়ে এবং তার সঙ্গে $^{১}/_{২}$ চামচ নরম সাবান মিশিয়ে বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

ঙ) **আতাপাতার নির্যাস (১০%)**

১০০ গ্রাম টাটকা আতাপাতা কুচিয়ে বা বেটে নিয়ে ১ লিটার জলে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং পরে ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে $^{১}/_{২}$ চামচ সাবান মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চ) **আতাবীজের দ্রবণ (১০%)**

১০০ গ্রাম আতাবীজ গুঁড়ো করে একইভাবে দ্রবণ তৈরি করে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় সাবধান হতে হবে যাতে পাতা বা বীজের দ্রবণ চোখে না লাগে।

ছ) **তামাকপাতার নির্যাস (৫%)**

৫০ গ্রাম তামাক পাতা (মতিহারী) ১ লিটার জলে ১২-১৫ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং ১ চামচ নরম সাবান আলাদাভাবে ভিজিয়ে রেখে তামাক পাতার নির্যাস এর সঙ্গে মেশাতে হবে।

এছাড়া ২/৩ দিন রোদে রেখে সক্রিয় করা গোমূত্র, কেরোসিন মেশানো ছাই গুঁড়ো, পাটবীজের নির্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন কীট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। জৈব কীটনাশকের বিশেষত্ব হল, এগুলি পরিবেশের ক্ষতি করে না, বন্ধু পোকামাকড়ের ক্ষতি করে না এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন পোকামাকড়ের ওপর কার্যকরী হয়।

কয়েকটি ফসল, তার উল্লেখযোগ্য রোগপোকা, নিয়ন্ত্রণের উপযোগী ঘরে তৈরি জৈব কীটনাশক ও ব্যবহারের সুপারিশ :

ফসল	**রোগপোকা**	**জৈব উপাদান**	**ব্যবহারের সময়**
ধান	বাদামি শোষক, পাতামোড়া, ভেঁপু, গন্ধী, মাজরা পোকা, ঝলসা রোগ	নিমতেল-৩০ মিলি/লি, জলে, নিমপাতা ১কেজি/ ৫লি জলে, নিমবীজ ৫০০ গ্রাম ১ কেজি/৫লি জলে। নিমখোল ১ কেজি/ ১০লি. জলে বা ১০-২০ কেজি/বিঘা জমিতে।	রোয়ার ১ মাস পর ৭ দিন অন্তর বিকেলে স্প্রে। চারা রোয়ার আগে, শেষ চাষের ৫-৭ দিন পূর্বে জৈবসার হিসাবে।
ধান ও অন্যান্য ফসল সবজি,	শোষক পোকা, শুঁয়োপোকা, মাকড়, থ্রিপস, জেসিড ফলছিদ্রকারী পোকা, পিঁপড়ে,	আতাপাতা ১ কেজি/৫লি. জলে, আতাবীজ ৫০০ গ্রা. ১ কেজি ৫ লিটার জলে,	ফসল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে ১০-১৫ দিন অন্তর স্প্রে

সর্ষে ইত্যাদি	জাবপোকা, শুঁয়োপোকা, পাতাখেকো পোকা	কেরোসিন তেল ২০ মিলি/ ১ লি. জলে ৫ গ্রাম সাবান। সাবান ৫-৮ গ্রাম/লি. জলে, গোমুত্র ১লি./৬ লি. জলে	বীজবোনা বা চারা রোয়ার ১৫ দিন পর থেকে দুপুর রোদে স্প্রে।
	ভাইরাস রোগ ছড়ানোর সাদা মাছি, জাবপোকা	তামাক পাতা ১০০ গ্রা/৫ লি. জলে + ২০ গ্রা সাবান	বীজতলাতে ও মূল জমিতে চারা লেগে যাওয়ার পর ১০-১৫ দিন অন্তর।
ছোলা	শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা	নিমবীজ ১ কেজি/৫ লি. জলে নিমতেল ৫০ মিলি./লি. জলে স্প্রে করার জন্য প্রতি ক্ষেত্রে ৩-৫ গ্রাম নরম সাবান/লি. জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।	ফুল আসার আগে থেকে ১০-১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার বিকেলে স্প্রে।

সুসংহত রোগপোকা নিয়ন্ত্রণে জৈব নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা অপরিসীম। তবুও চাষবাসের পরিকল্পনা করার সময় পরিচ্ছন্ন চাষ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা, সঠিক মাত্রায় সার ও জলসেচ, বীজ ও বীজতলা শোধন, রোগপোকা প্রতিরোধক্ষম উন্নত জাতের চাষ ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও রোগপোকা দেখা দিলে তখন প্রয়োজন হবে জৈব নিয়ন্ত্রকের। বর্তমানে বাজারে বাণিজ্যিকভাবে নানারকম জৈব নিয়ন্ত্রক পাওয়া যাচ্ছে। সঠিক পদ্ধতি মেনে, সঠিক মাত্রায় প্রয়োগে এগুলি থেকেও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব।

বীজশোধন ও শস্যরক্ষার কয়েকটি সুপারিশকৃত আধুনিক পদ্ধতি ঃ

(১) **বিজাস্ত্রুত ঃ** গোবর ৫ কেজি, গোমুত্র ৫ লিটার, বাগানের আনকোরা মাটি ৫০ গ্রাম, সামান্য পরিমাণ গোরুর দুধ, কলিচুন ৫০ গ্রাম এবং জল ১০ লিটার। সব কিছু এক সাথে ভালো করে মিশিয়ে ঐ মিশ্রণ অল্প অল্প করে বীজের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ভালো করে বীজের গায়ে মাখিয়ে নিতে হবে। অনুরূপভাবে, চারার শিকড় ঐ মিশ্রণে ২৫-৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে তুলে নিয়ে জল ঝরিয়ে ছায়াতে শুকোতে হবে এবং জমিতে সরাসরি বপন বা রোপণ করতে হবে।

বিজাস্ত্রুত ছাড়া, গোমুত্র, হলুদগুঁড়ো মেশানো, গোমুত্র, পঞ্চগব্য নির্যাস, দশপর্ণী নির্যাস, জীবাণুসার, ট্রাইকোডার্মা বা সিউডোমোনাস দিয়ে বীজ শোধন করা যাবে।

(২) **দশপর্ণী ঃ** ৫ কেজি নিম পাতা, ২ কেজি নিশিন্দা পাতা, ২ কেজি ঈশ্বরীমূল পাতা, ২ কেজি পেঁপে পাতা, ২ কেজি গুলঞ্চ পাতা, ২ কেজি আতা পাতা, ২ কেজি করঞ্জা পাতা, ২ কেজি রেড়ি পাতা, ২ কেজি করবী পাতা, ২ কেজি মাদার পাতা, ২ কেজি কাঁচা লঙ্কা, ২৫০ গ্রাম রসুন, ৩০ কেজি গোবর থেঁতো করে জলে মিশিয়ে ১০ দিন মুখ ঢাকা ড্রামে পচানো হয়। প্রতিদিন ৩ বার করে নেড়ে ঘেঁটে দেওয়া হয়। তারপর ছেঁকে নিয়ে মিশ্রণের আয়তন বাড়িয়ে ২০০ লিটার করে এক একর জমির ফসলে স্প্রে করা হয়। এই মিশ্রণের নির্যাস ৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

(৩) **আগ্নেয়াস্ত্র ঃ** ১ কেজি বেড়া কলমি পাতা, ৫০০ গ্রাম ঝাল কাঁচা লঙ্কা, ৫০০ গ্রাম রসুন, ৫ কেজি নিম পাতা ও ২০ লিটার গোমুত্র একসঙ্গে মিশিয়ে কিছু সময় অন্তর অন্তর ৫ বার ফুটিয়ে অর্ধেক পরিমাণ করা হয়। তারপর ছিবড়ে নিংড়ে ফেলে দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। ২-৩ লিটার এই নির্যাস ১০০ লিটার জলে গুলে এক একর ফসল ক্ষেতে পাতামোড়া পোকা, মাজরা পোকা, শুঁটি ও ফলছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৪) **নিমাস্ত্র ঃ** ৫ কেজি নিম পাতা থেঁতো, ২ লিটার গোবর, ৫ লিটার গোমুত্র একসঙ্গে মিশিয়ে মাঝে মধ্যে

নেড়ে ২৪ ঘন্টা আবদ্ধ পাত্রে পচানো হয়। তারপর মিশ্রণ থেকে ছিবড়োগুলি নিংড়ে ফেলে আরও জল মিশিয়ে ১০০ লিটার করা হয়। এক একর জমির 'দয়ে পোকা' ও 'শোষক পোকা' নিয়ন্ত্রণে ঐ মিশ্রণ স্প্রে করা হয়।

(৫) **ব্রহ্মাস্ত্র ঃ** ৩ কেজি নিম পাতা, ১০ লিটার গোমুত্র, ২ কেজি আতা পাতা, ২ কেজি পেঁপে পাতা, ২ কেজি ডালিম পাতা ও ২ কেজি পেয়ারা পাতা থেঁতো করে এক সঙ্গে মেশানো হয়। মিশ্রণটিকে কিছু সময় অন্তর অন্তর মোট ৫ বার ফুটিয়ে আয়তন অর্ধেক করা হয়। ২৪ ঘন্টা ধরে এই মিশ্রণ রেখে দিয়ে ছিবড়ে নিংড়ে ফেলে ছেঁকে নেওয়া হয়। এই নির্যাস ২-২.৫ লিটার পরিমাণ নিয়ে ১০০ লিটার জলে গুলে এক একর জমিতে 'শোষক পোকা' এবং 'ফল ও গুঁটি ছিদ্রকারী পোকা' নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ব্রহ্মাস্ত্র নির্যাস ৬ মাস শিশিতে ভরে রেখে দেওয়া যায়।

নিমজাত কীটনাশক

নিমগাছের বীজ, পাতা, ফল, ছাল প্রভৃতির কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক গুণ আছে। এদের মধ্যে নিমবীজ অধিক কার্যকরী। নিমের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন লিমোনয়েডগুলির জন্যই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই কীটনাশকের কাজ করে। এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় ৩৪টি লিমোনয়েডের মধ্যে এ্যাজাডিরেকটিন অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এ্যাজাডিরেকটিন

ধর্ম ঃ এটা নিম বীজের মধ্যে অবস্থিত একটি **লিমোনয়েড যৌগ**। এর সাতটি আইসোমার (Isomers) আছে। সেগুলি হলো AZA থেকে AZG। এদের মধ্যে AZA আইসোমারটির পরিমাণ ও কীটনাশক গুণ বেশি।

বিষাক্ততা ঃ এটা পরভোজী ও পরজীবী বন্ধুপোকাদের পক্ষে নিরাপদ এবং পরিবেশের বন্ধু। এর কার্যকারিতা সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মি, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও পি. এইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর স্থায়িত্ব ৫-৭ দিন। সুতরাং ৭-১০ দিন অন্তর ওষুধটি স্প্রে করা প্রয়োজন।

কার্যকারিতা ঃ স্পর্শজনিত ও অন্তর্বাহী কীটনাশক। অ্যাজাডাইরেকটিনের বহুমুখী কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। রিপেল্যান্ট অর্থাৎ পোকাকে বিতাড়িত করে। পোকার আস্বাদ অঙ্গ ও অনাস্বাদ অঙ্গকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে পোকা অনভিপ্রেত স্বাদ ও গন্ধ পায় ফলে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এইভাবে অ্যান্টিফিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। পোকার ডিম পাড়ার হার ও ডিম ফোটার হার কমিয়ে দেয়। আবার ডিমের আয়ু ও লার্ভা দশার সময় বাড়িয়ে দেয়। লার্ভার খোলস ত্যাগ দেরিতে হয় এবং ঐ পোকা বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। এছাড়া পোকার আয়ু ও ওড়ার ক্ষমতা এবং যৌন ফেরোমোনের প্রতি আকর্ষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং পুরুষত্ব হারায়। পোকার হরমোনচালিত সিস্টেম, কার্যকারিতায় বিঘ্ন ঘটে। সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে নিমযৌগকে রক্ষা করতে বিকালের দিকে স্প্রে করা উচিত। নিমজাত যৌগের বিরুদ্ধে সহজে পোকার প্রতিরোধশক্তি গড়ে ওঠে না। আবার নিমজাত যৌগ বি. টি.-এর সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে দীর্গস্থায়ী ফল পাওয়া যায়। ফসল খেতের পোকা ছাড়া শস্য গুদামের পোকা, গৃহস্থালির পোকামাকড়, গবাদিপশুর বহিস্ত্বকের কীট, পুকুরে মাছের কীটশত্রু প্রভৃতির বিরুদ্ধে কার্যকরী।

ব্যবহার ঃ পোকা—জ্যাসিড, জাবপোকা, সাদামাছি, নালিপোকা, দয়ে পোকা, সাইলা, থ্রিপস, আঁশপোকা, কাটুইপোকা, তুলোর বোলওয়ার্ম, বাদামি শোষক পোকা, পাতামোড়া পোকা, বাঁধাকপির মাথাছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি।

ফসল ঃ ধান, গম, ভুট্টা, ডালশস্য তৈলবীজ, সবজি, ফলগাছ, তামাক, তুলো, ফুল ইত্যাদি।

মাত্রা ঃ ২-৫ গ্রাম এ. আই./হে.। স্প্রেয়িং দ্রবণ তৈরির জন্য প্রতি লিটার জলে ০.০৩% ই. সি. (৫ মিলি), ০.১৫% ই. সি. (৫ মিলি), ১% ই. সি. (৩ মিলি), ৫% ই. সি. (১ মিলি), মেশানো হয়।

বাণিজ্যিক নাম ঃ ০.০৩% ই. সি—নিমারিন (বায়োটেক), ইউনিম (বায়ার), মাল্টিনিম (মাল্টিপ্লেক্স), পেস্টোনিম (অমিত), নিমবেসিডিন (টি. ট্যান্স)।

১% ই. সি.—ইকোনিম প্লাস (মার্গো), নেমাজোল টি/এস (ই. প্যারি), ব্রকেড (ইসাগ্রো), নিমারিন (বায়োটেক)।

৫% ই. সি. —নেমাজোর-এফ (ই. প্যারি), নিমারিন (বায়োটেক)।

ইউরিয়াতে মেশানোর জন্য—নিমিন (গোদরেজ), নিমেক্স (মার্গো)।

নিমজাত অন্যান্য যৌগ

নিম তেল ৩% দ্রবণ ঃ এই দ্রবণ হেক্টর প্রতি ২.৫-৫ লিটার আঠালো পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করলে বিভিন্ন ফসলের পোকা নিয়ন্ত্রণ হয়। তুলোর জ্যাসিড ও থ্রিপস, ডালশস্য, সূর্যমুখী, কুসুম, তুলো ও তামাকের কীড়া, বেগুন, ঢ্যাঁড়স, বরবটি, কুমড়োজাতীয় ফসল, তিল ও চীনাবাদামের নালিপোকা, পানের আঁশপোকা, লাউ-এর হলদে মোজাইক রোগ নিয়ন্ত্রণ করে।

নিম বীজের ৫% নির্যাস ঃ N.KAE (Neem Kerml Aqua Extract) : প্রতি লিটার জলে ৫ মিলি হারে এই নির্যাস আঠালো পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করলে উচ্ছে, বেগুন, কুমড়োর লালপোকা, চীনাবাদামের নালিপোকা নিয়ন্ত্রণ হয়।

নিম খোল ঃ হেক্টর প্রতি ২৫০ কেজি নিম খোল জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে চীনাবাদামের গোড়াপচা রোগ অনেক কমানো যায়। আবার হেক্টর প্রতি ১০০০ কেজি প্রয়োগ করলে হলুদের নেমাটোড সমস্যা দূর করা যায়। ১ কেজি নিম খোল ২০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে চীনাবাদাম, টম্যাটো ও ধানের নালিপোকা, তামাকের কীড়া নিয়ন্ত্রণ হয় এবং লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ কম হয়। নিম খোল মাটিতে প্রয়োগ করলে ফসলের নেমাটোড ও পোকা সমস্যা সাধারণভাবে কম হয়।

নিম তেল ও রসুনের মিশ্রণ ঃ ১ লিটার তেল ও ৬০ গ্রাম সাধারণ সাবান $\frac{1}{2}$ লিটার জলে গোলা হয়। আরও ২০ লিটার জল মিশিয়ে দ্রবণটি লঘু করা হয়। তারপর ৪০০ গ্রাম রসুন ভালোভাবে থেঁতো করে ওই দ্রবণে মেশানো হয়। এই মিশ্রণ স্প্রে করলে কুমড়োজাতীয় ফসলের জ্যাসিড, করলা ও চিচিঙ্গার লালপোকার নিয়ন্ত্রণ হয়।

মিনার্ক ঃ নিমজাত যৌগ, অ্যান্টিফিড্যান্ট, রিপেল্যান্ট এবং নেমাটোডনাশক। ১ কেজি মিনার্ক ১০ লিটার গরম জলের সঙ্গে মেশানো হয় এবং তারপর আরও জল মিশিয়ে মোট ১০০০ লিটার দ্রবণ করা হয়। ঐ দ্রবণ স্প্রে করলে সাদামাছি, আঁশপোকা, দয়েপোকা, নালিপোকা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ হয়। ধান, চীনাবাদাম, লঙ্কা, টমাটো, আখ, আঙুর, তুলো ও বাগিচা ফসলে ব্যবহার করা হয়।

নিম্যাক্স ঃ নিমজাত যৌগ। ১ কেজি নিম্যাক্স ৫-৮ লিটার জলে ভিজিয়ে ৬-৮ ঘন্টা রাখা হয়। তারপর ভাল করে গুলে ছেঁকে নেওয়া হয়। উপযুক্ত পরিমাণ জলের সঙ্গে ঐ দ্রবণ মিশিয়ে ১ হেক্টরে স্প্রে করা হয়। জাবপোকা, জ্যাসিড, সাদামাছি, নালিপোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা, গন্ধীপোকা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ হয়। ধান, ডালশস্য, তৈলবীজ, সবজি, তুলো প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়।

ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনশিস (বি.টি) : এটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত জৈব কীটনাশক।

কার্যকারিতা ঃ ইহা পাকস্থলীজনিত কীটনাশক। বি. টি প্রযুক্ত উদ্ভিদের অংশ খাদ্যের মাধ্যমে পোকার লার্ভার পাকস্থলীতে যায়। পোকার অন্ত্রের মাঝ বরাবর অংশে ইহা উৎসেচকের সাহায্যে বিষাক্ত ডেল্টা-এন্ডোটক্সিন উৎপন্ন

করে। বিষাক্ত টক্সিনের ক্রিয়ায় অন্ত্রের এপিথেলিয়াম কোষ আক্রান্ত হয় এবং অন্ত্র ফুটো হয়ে যায়। পোকা অসাড় হয়ে পড়ে। বি. টি বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি হল প্রথমে পোকার খাওয়া বন্ধ হয়, তারপর অনাহার চলে ও পক্ষাঘাত ঘটে। বি. টি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে পোকার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। স্প্রে করার ২-৩ দিনের মধ্যে পোকা মারা যায়। পোকার ডিম দেখলে কিংবা লার্ভার প্রাথমিক দশায় প্রয়োগ করা উচিত। বি.টি পোকার চামড়া ভেদ করতে পারে না। বি.টি.-র **কার্যকারিতা পাওয়ার জন্য খাদ্যের মাধ্যমে পাকস্থলীতে যেতে হবে**। সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে বি.টি.-র কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য সন্ধ্যর দিকে প্রয়োগ করা উচিত। কম তাপমাত্রায় এবং প্রয়োগের পরে জলসেচ দিলে বি.টি.-র কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সঠিক পোকার জন্য সঠিক বি.টি স্ট্রেন ব্যবহার করা উচিত। কীট দমনে ব্যবহৃত বি.টি-র কয়েকটি স্ট্রেন হল (১) বি.টি var কার্সটাকি (২) বি.টি var. কার্সটাকি সেরোটাইপ H-3a, H-3b Strain Z-52 প্রভৃতি। অন্যদিকে বি.টি.-র ডেল্টা এন্ডোটক্সিন-এর জন্য কার্যকরী জিন সংস্থাপিত করে তুলো, তামাক, টম্যাটো, বরবটি প্রভৃতির ট্রান্সজনিক উদ্ভিদ তৈরি করা হয়েছে। ঐ ট্রান্সজেনিক গাছের মধ্যে ডেল্টা-এন্ডোটক্সিন উৎপন্ন হয়। ফলে ঐ গাছে আক্রমণ করতে আসা লেপিডপ্টেরা বর্গের কীট টক্সিনের প্রভাবে মারা পড়ে।

ব্যবহার ঃ পোকা—ছোলার শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা, তামাকের কীড়া, হীরক পিঠমথ, বাঁধাকপির প্রজাপতি, ডাঁটা ও ফলছিদ্রকারী পোকা, কাটুইপোকা, ঝাঁকবাঁধা লেদা, সব ধরনের বোলওয়ার্ম, জিপসি মথ, তামাকের শিংযুক্ত পোকা।

ফসল ঃ টম্যাটো, বেগুন, বাঁধাকপি, আলু ও অন্যান্য সবজি, সর্ষে, মটরশুঁটি, ছোলা, তরমুজ, কলা, কমলা, আঙুর, মরিচ, কফি, তামাক, তুলো, ফুল ও পাতাবাহার।

মাত্রা ঃ ১-২ কেজি ফর্মুলেশান ৫০০-৭৫০ লিটার জলে হেক্টর প্রতি প্রয়োগ; স্প্রে ১-১.৫ গ্রাম/মিলি প্রতি লিটার জলে।

বাণিজ্যিক নাম ঃ বি.টি. *var.* কার্সটাকি—বায়োঅ্যাস্প ও বায়োলেপ (বায়োটেক), বায়োবিট (র‍্যালিস), ফাইটার (এগ্রোনোভো), ডাইপোল (অমিত), প্যান্থার-বিটি (লিবিগ)।

বি.টি. var. ইসরালেনসিস—হিল-বিটি আই (হিল), ব্যাকটিসাইড (বায়োটেক), বায়োডার্ট (অজয়)।

গ্রানুলোসিস ভাইরাস

কীটনাশক ঃ এর ভাইরাস দণ্ড বা ভিরিয়ন ঘিরে প্রোটিনযুক্ত পরিহেড্রাল ইনক্লুসান বডি থাকে। এই ভাইরাস বিভিন্ন পোকাতে রোগ সৃষ্টি করে মেরে ফেলে। বাঁধাকপির কীড়া, মিল মথ, কডলিং মথ, কুঁড়িছিদ্রকারী পোকা ও কাটুইপোকা দমনে গ্রানুলোসিস ভাইরাস ব্যবহার করা হয়। এগ্রোভির (কাটুইপোকার জন্য), বায়োরক্ষা (স্টান্স) বাণিজ্যিক নামে গ্রানুলোসিস ভাইরাস বাজারে পাওয়া যায়।

বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা *(Beauveria bassiana)*

কীটনাশক : এই ছত্রাক পোকার কীড়ার মুখ ও শরীরের নরম অংশ দিয়ে শরীরের মধ্যে ঢোকে। ছত্রাকের স্পোর অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য বেশিদিন আর্দ্র আবহাওয়ায় থাকার প্রয়োজন হয়। ছত্রাক আক্রান্ত কীড়ার দেহের নরম অংশ থেকে জলীয় দ্রব্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে। তারপর পোকার শরীরের বাইরে এসে সাদা রঙের ছত্রাকে পোকাকে ঢেকে ফেলে। পোকা এই ছত্রাক খাদ্যের সঙ্গে না খেলেও পোকার শরীরে ঢুকে যায়। ছত্রাক দ্বারা উৎপাদিত বিউভার্সিন প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থের ক্রিয়ায় পোকার বিভিন্ন বিপাকীয় উৎসেচকের কাজ ব্যাহত হতে শুরু করে। ছত্রাক আক্রান্ত কীড়া প্রথমে চুপচাপ হয়ে যায় এবং ৪-৫ দিনের মধ্যে মারা পড়ে।

ছত্রাক প্রয়োগের পর প্রথম দিকে ধীরে ধীরে কাজ করে এবং প্রয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে ছত্রাকের কলোনি তৈরি হয়ে গেলে কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এই ছত্রাক লেপিডপ্টেরা, কোলিওপ্টেরা, হেমিপ্টেরা ও হোমোপ্টেরা বর্গের পোকার বিরুদ্ধে কার্যকরী। ধানের মাজরা, পাতামোড়া, শ্যামা ও বাদামি শোষক পোকা, চীনাবাদামের সাদা গ্রাব, আখের পাইরিলা, চায়ের মশা, নারকেলের গণ্ডারে পোকার বাচ্চা, কলা, পেঁপে ও আনারসের গুবরেপোকা প্রভৃতি এই ছত্রাকের দ্বারা দমন হয়। রেশম মথের পক্ষে ক্ষতিকারক হওয়ায় রেশম চাষ এলাকায় সতর্কভাবে ব্যবহার করা হয়। ১ কেজি ছত্রাক ফর্মুলেশান ২ লিটার জলে ভালভাবে মেশানো হয়। তারপর মসলিন কাপড়ে ছেঁকে প্রয়োজনীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১ একর জমির ফসলে প্রয়োগ করা হয়। বায়োরিন (বায়োটেক), বায়োপাওয়ার (স্টান্স), লার্ভোসেল (এক্সেল), প্যান্থার-বিবি (লিবিগ) প্রভৃতি নামে বাজারে পাওয়া যায়।

মিটারহিজিয়াম অ্যানিসোপ্লিই

কীটনাশক : এই ছত্রাক পোকার ওপর পড়ার পর প্রয়োজনীয় আর্দ্র আবহাওয়া পেলে অঙ্কুরিত হয়। পোকার কিউটিকল ভেদ করে বা গায়ের ছিদ্রপথে ছত্রাক ভিতরে ঢোকে। পোকার দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বংশবৃদ্ধি করে। ছত্রাকটি ডেসট্রাক্সিন জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে। ছত্রাকগুলি পোকার শরীরের বিপাকীয় উৎসেচকের কাজ বন্ধ করে দেয়। ফলে পোকার বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং পোকা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মারা যাওয়ার সময় পোকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন গাঁট থেকে সাদা ছত্রাক বাইরে বার হয়ে আসে। আলু, চা, আখ প্রভৃতি ফসলের সাদা গ্রাব, উঁইপোকা, জাবপোকা, দয়েপোকা, গন্ডারে পোকা, কাটুইপোকা নিয়ন্ত্রণে এই ছত্রাক কার্যকরী। কোলিওপ্টেরা, হেমিপ্টেরা, আইসোপ্টেরা, লেপিডপ্টেরা প্রভৃতি বর্গের পোকার বিরুদ্ধে কার্যকরী। ৫০০ গ্রাম ছত্রাক ফর্মুলেশান (১.১৫% ডব্লু. পি.) ৫০ কেজি জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে ১ একর জমির ফসলের গোড়ায় মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। এটি কীটনাশকের সঙ্গে মিশ্রণযোগ্য হলেও ছত্রাকনাশকের সঙ্গে মেশানো যাবে না। **বায়োম্যাজিক** (স্টান্স), **বায়োমেট** (বায়োটেক), **মেটাগার্ড** (অজয়)।

ভার্টিসিলিয়াম লেকানি

এই ছত্রাকটি রসচোষক পোকার বিরুদ্ধে কার্যকরী। ছত্রাক অঙ্কুরিত হয়ে পোকার চামড়া ভেদ করে বা পোকার গায়ে থাকা ছিদ্রপথে ভিতরে ঢোকে। পোকার দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বংশবৃদ্ধি করে। পাশাপাশি ছত্রাকগুলি ডিপিকোলিনিক অ্যাসিডজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত করে পোকার বিভিন্ন বিপাকীয় উৎসেচকের কাজ ব্যাহত করতে শুরু করে। পোকা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সবজি, তৈলবীজ, তুলো, তামাক, চা প্রভৃতি ফসলে জাবপোকা, সাদামাছি, থ্রিপস, লালমাকড়, আঁশপোকা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োগ করা হয়। হেমিপ্টেরা, আইসোপ্টেনারা বর্গের পোকা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কার্যকরী। ১ কেজি ছত্রাক ফর্মুলেশান (১.১৫% ডব্লু.পি.) ২ লিটার জলে মেশানো হয়। তারপর মসলিন কাপড়ে ছেঁকে ছত্রাকের জলীয় মিশ্রণ প্রয়োজনীয় জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১ একর জমির ফসলে প্রয়োগ করা হয়। বায়োলিন (বায়োটেক), ভার্টিসেল (এক্সেল) নামে ছত্রাকটি বাজারে পাওয়া যায়।

নোমুরিয়া রিলেই

কীটনাশক : ছত্রাকটি কীটনাশক হিসেব ব্যবহৃত হয়। ছত্রাকের স্পোর হালকা সবুজ রঙের পোকার দেহের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে পোকাকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলে। প্রধানত লেপিডপ্টেরা বর্গের পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী। সবজি, ধান, তুলো, তৈলবীজ, ফুল, পাতাবাহারের কাটুইপোকা, শুঁটিছিদ্রকারী পোকা, পাতামোড়া পোকা, পাতা খাওয়া পোকা, ফল ছিদ্রকারী পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী। প্রতি লিটার জলে ১-২ গ্রাম ছত্রাক

ফর্মুলেশান গুলে বিকালের দিকে ফসলে স্প্রে করা হয়। অন্য রাসায়নিক ছত্রাকনাশকের সঙ্গে মেশানো যাবে না।

হিরসুটেলা থম্পসোনি

কীটনাশক : ছত্রাকটি কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছত্রাকটি পোকার দেহের ভিতরের টিসু খেয়ে ফেলে এবং পরে সুতোর আকারে পোকার দেহের বাইরে ছত্রাক বার হয়ে আসে। ছত্রাক নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থের ক্রিয়ায় পোকা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সবজি, তুলো, তৈলবীজ, ফুল, পাতাবাহার প্রভৃতির সাদামাছি, জ্যাসিড, লালমাকড় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয়। প্রতি লিটার জলে ২-৩ গ্রাম ছত্রাক ফর্মুলেশান গুলে ফসলে বিকালের দিকে স্প্রে করা হয়।

পিসিলোমাইসেস ফিউমোসোরেসাস

মাকড় নাশক

ছত্রাকটি বিভিন্ন ধরনের মাকড় দমনে ব্যবহৃত হয়। অঙ্কুরিত ছত্রাক পোকার কিউটিকল ভেদ করে ভেতরে ঢোকে। পোকার দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বংশবৃদ্ধি করে। ছত্রাক নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ পোকার নানা বিপাকীয় উৎসেচকের কাজে বাধা দিতে শুরু করে। মাকড়ের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ পঙ্গু হতে শুরু করে। মাকড় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সবজি, তুলো, চা, ফুল, পাতাবাহার প্রভৃতির লাল মাকড়, হলুদ মাকড়, বেগুনি মাকড়, গোলাপী মাকড় নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। ছত্রাকের ১ কেজি ফর্মুলেশান (০.৫% ডব্লু. পি.) ৫ লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে মসলিন কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। ওই জলীয় মিশ্রণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জল মিশিয়ে ১ একর জমির ফসলে স্প্রে করা হয়। এটা ছত্রাকনাশকের সঙ্গে মেশানো যাবে না। মাইকোমাইট (মাল্টিপ্লেক্স), বর্ধন (পিক) নামে ছত্রাকটি বাজারে পাওয়া যায়।

পিসিলোমাইসেস লিলাসিনাস : নেমাটোডনাশক

ছত্রাকটি পরজীবী মেলওডিগাইনি প্রজাতি নেমাটোড নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। ছত্রাকটি নেমাটোডের মধ্যে ঢুকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং নেমাটোডকে পঙ্গু করে মেরে ফেলে। নেমাটোডের ডিম, লার্ভা ও সবেমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত দশা এই ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। সবজি, তৈলবীজ, চা, ফুল, পাতাবাহারে নেমাটোড নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। ১ কেজি ছত্রাকের ফর্মুলেশান (০.৫% ডব্লু.পি) ৬০-৮০ কেজি জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে ফসলের গোড়ায় মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। ছত্রাকটি কীটনাশকের সঙ্গে মেশানো গেলেও ছত্রাকনাশকের সঙ্গে মেশানো যাবে না। নিয়ন্ত্রণ (মাল্টিপ্লেক্স), প্যান্থার-পি এল (লিবিগ), বায়োনেমাটন (স্ট্যান্স) নামে বাজারে পাওয়া যায়।

গ্রীন সায়েন্স কমান্ডো

কয়েকটি প্রজাতির নেমাটোড কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে গ্রিন কম্যান্ডো *(Steirnername* spp.) এবং সয়েল কমান্ডো (*Rabhdities* spp.) নামের নেমাটোড দুটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হয়ে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিষাক্ততা : মানুষ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পশু, পাখি, পরাগসংযোগী কীট, পরভোজী ও পরজীবী বন্ধুপোকাদের পক্ষে নিরাপদ।

কার্যকারিতা : কীটনাশক হিসেবে কার্যকরী। নেমাটোড দ্রবণ ফসলে স্প্রে করলে, এই নেমাটোড পোকার কীড়া ও গ্রাবের শরীরের স্বাভাবিক ছিদ্রপথে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই নেমাটোড একটি মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং নেমাটোডটি ঐ ব্যাকটেরিয়ার বাহক হিসেবে কাজ করে। পোকার শরীরের

মধ্যে নেমাটোড থেকে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং পোকাকে মেরে ফেলে। নেমাটোড মৃত পোকার মধ্যকার অংশ খেয়ে বেঁচে থাকে এবং ব্যাকটেরিয়া নেমাটোডের অন্ত্রে সঞ্চিত হতে থাকে। একসময় চাপে মৃত পোকা ফেটে যায় এবং নেমাটোড ছড়িয়ে পড়ে নতুন পোকা আক্রমণ করে। উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বেঁচে থাকতে পারে বলে আপেলের কলডিং মথ দমনে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার ঃ পোকা—ধানের মাজরা, সবজির পাতাখেকো পোকা, তুলোর বিভিন্ন বোলওয়ার্ম, তামাকের কীড়া, কডলিং মথ, পাতামোড়া পোকা, শিকড়ের গ্রাব ইত্যাদি।

ফসল ঃ ধান, চীনাবাদাম, ডালশস্য, লঙ্কা, টম্যাটো, ঢ্যাঁড়স ও অন্য সবজি, তুলো, তামাক, আপেল ইত্যাদি।

নথিফুক্ত ফর্মুলেশান ঃ জলীয় দ্রবণ।

মাত্রা ঃ হেক্টর প্রতি ১০টি পাউচ। অ্যালুমিনিয়াম পাউচ বা ফয়েলের মধ্যে স্পঞ্জের সঙ্গে নেমাটোড থাকে। একটি পাউচের ফয়েল ছিঁড়ে স্পঞ্জ ৩-৫ লিটার জলে ভেজানো হয়। ২-৩ মিনিট পরে স্পঞ্জ নিংড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর প্রয়োজনীয় জল মিশিয়ে স্প্রে করা যায়। পোকার আক্রমণ শুরু হলে গ্রিন কমান্ডো নেমাটোড পাতায় স্প্রে করা হয় ৩-৫ দিন অন্তর ২-৩ বার, প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর পোকা মারা যায়। সয়েল কমান্ডো নেমাটোড গাছের শিকড় অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয় এবং প্রয়োগের পর মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা বাঞ্ছনীয়। এই দ্রবণ অনেক কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করা যায়।

বাণিজ্যিক নাম ঃ গ্রিন কমান্ডো (ইকোম্যাক্স), সয়েল কমান্ডো (ইকোম্যাক্স)।

গ্রিন লেস উইংস: ভুট্টাক্ষেতে সহজলভ্য একপ্রকার পরভোজী পোকা। সেই পোকা **ক্রাইসোপার্লা কার্নিয়া** বাণিজ্যিকভাবে পোকা দমনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ পোকাটি সুন্দর হাল্কা সবুজ বর্ণের এবং ডানা দু'টি জালের মতো। পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতা ও অন্য জায়গায় ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিম যেন একটা করে লাঠির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। ডিম ফুটে যে কীড়া বার হয়, তাদের মুখে কাস্তে আকৃতির চোয়াল আছে। এই অঙ্গের জন্য তারা সহজে পোকার ডিম ও অল্পবয়সী কীড়া খেয়ে ফেলতে পারে। সাদামাছি, জাবপোকা, থ্রিপস, আঁশপোকা, দয়েপোকার সকল দশা এবং বোলওয়ার্ম ও অন্যান্য লেপিডপ্টেরা পোকার ডিম ও অল্পবয়সী কীড়া খেয়ে ফেলে। গ্রিন লেস উইং-এর একটা কীড়া ৮-১০ দিনের জীবদ্দশায় ৫০০টি জাবপোকা কিংবা ৫০০টি থ্রিপস বা ৮০০-১০০০টি ডিম খেয়ে ফেলতে পারে। বায়োটেক (বায়োপার্লা), পিসিআই ও অন্যান্য কোম্পানি এই পোকার ডিম ও কীড়া বাজারে বিক্রি করছে। প্রতিটি শিশিতে ২০০০ বা ৫০০০ ডিম বা কীড়া থাকে। হেক্টর প্রতি ৫০০০-১০০০০ ডিম বা কীড়া ছাড়া হয়। শত্রু পোকার ডিম পাড়ার সময় ক্রাইসোপার্লা মাঠে ছাড়লে বেশি কার্যকারিতা পাওয়া যায়। সবজি, চীনাবাদাম, ডালশস্য, তুলো, ফুল, পাতাবাহার ও অন্য ফসলে ব্যবহার করা হয়।

লেডি বার্ড বিটল : কিছু জাতের লেডি বার্ড বিটলের সহজাত খাদ্য হল আঁশপোকা ও দয়েপোকা। এই সকল লেডি বার্ড বিটলের পূর্ণাঙ্গ ও বাচ্চা পোকা খাদ্য হিসেবে দয়েপোকা ও আঁশপোকা খেয়ে ফেলে। পরীক্ষাগারে সঠিক প্রজাতির লেডি বার্ড বিটল তৈরি করে মাঠে ছাড়া হয়। দয়েপোকা দমনের জন্য লেডি বার্ড বিটল তৈরি করে মাঠে ছাড়া হয়। দয়েপোকা দমনের জন্য লেডি বার্ড বিটল হল ক্রিপ্টোলেমাস মোনট্রৌজিরি, স্কিমনাস ককিভোরা, নেফাস প্রজাতি। অন্যদিকে আঁশপোকা দমনের জন্য লেডি বার্ড বিটল হল চিটলোকোরাস নাইগ্রিটাস ও ফ্যারোস্কিমনাস হর্নি। হেক্টর প্রতি ১৫০০-২৫০০ বিটল ছাড়া হয়। পেয়ারা, লেবু, আঙুর, কফি, পাতাবাহার ও অন্য ফসলে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়। পিসিআই, বায়োটেক ও অন্য কোম্পানি এই সকল বিটল তৈরি করছে।

ট্রাইকোগ্রামা : ট্রাইকোগ্রামা খুবই ছোট এক প্রকারের বোলতা। লেপিডপ্টেরা জাতীয় পোকার ডিমের মধ্যে এই বোলতা ডিম পেড়ে যায়। ফলে লেপিডপ্টেরা জাতীয় পোকার ডিম ফুটে লেপিডপ্টেরা জাতীয় পোকা বার হয় না। বার হয় এই বোলতার বাচ্চা। লেপিডপ্টেরা জাতীয় পোকার ডিম ধ্বংস করার এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ট্রাইকোগ্রামাকে পোকা দমনের কাজে ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষাগারে লেপিডপ্টেরা জাতীয় পোকার ডিম তৈরি করে, তার মধ্যে এই বোলতার ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই ডিমকে প্যারাসিটাইজড ডিম বলে অর্থাৎ লেপিডপ্টেরা জাতীয় পোকার ডিমের মধ্যে বোলতার ডিম আছে। এই প্যারাসিটাইজড ডিম শক্ত কাগজের ওপর আঠা দিয়ে লাগানো অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ঐ ডিমযুক্ত কাগজ দেখতে শিরীষ কাগজের মতো। ডিমযুক্ত কাগজকে **ট্রাইকোকার্ড** বলা হয়। ডিমযুক্ত কাগজকে টুকরো টুকরো করে কেটে স্ট্যাপলার দিয়ে খেতে ফসলের পাতার পিছনের দিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সূর্যালোক, বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে ডিমকে বাঁচাতে পাতার পিছনদিকে লাগানো হয়। ঐ ডিম ফুটে যে বোলতা বার হবে, তা মাঠে থাকা লেপিডপ্টেরা পোকার ডিমের মধ্যে ডিম পেড়ে নষ্ট করে দেবে। ডিম প্যারাসিটাইজড হবার ৭-১০ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বোলতা বার হয়। ল্যাবরেটরিতে প্যারাসিটাইজড ডিম রেফ্রিজারেটারে অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। এক একটি ট্রাইকোকার্ডে (সাইজ ১" × ৬") প্রায় ২০,০০০ প্যারাসিটাইজড ডিম থাকে। হেক্টর প্রতি ৩-৫টি ট্রাইকোকার্ডের প্রয়োজন হয়। একবার প্রয়োগের ১৫ দিন পর আবার প্রয়োগ করতে হয়। বায়োগ্রামা (বায়োটেক) ও ট্রাইকোকার্ড (পিসিআই) নামে এই বোলতার ডিমযুক্ত কার্ড বাজারে পাওয়া যায়। ভারতে ট্রাইকোগ্রামার বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়।

	প্রজাতি	**আক্রান্ত শত্রুপোকা**
১।	ট্রাইকোগ্রামা চিলোনিস [নামে পাওয়া যায়।]	তুলোর বোলওয়ার্ম, টম্যাটোর ফলছিদ্রকারী পোকা, ভুট্টার মাজরা পোকা, আখ ছিদ্রকারী পোকা, লেবুর পাতাখেকো পোকা, বেগুন, ঢ্যাঁড়স, জবা বা হলিহকের ফলছিদ্রকারী পোকা।
২।	**টি. জ্যাপোনিকাম**	ধানের মাজরা পোকা, আখের ডগাছিদ্রকারী পোকা।
৩।	**টি. ব্র্যাসিলেনসিস**	তুলোর বোলওয়ার্ম, টমাটোর ফলছিদ্রকারী ও ছোলার শুঁটিছিদ্রকারী পোকা।
৪।	**টি. অ্যাচিই**	তুলো, ঢ্যাঁড়স, হলিহক ও অন্যান্য মালভেসি গোত্র-ভুক্ত ফসলের গোলাপি ও ছোপযুক্ত বোলওয়ার্ম।
৫।	**টি. অক্সিগাম**	ভুট্টার মাজরা পোকা।

ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি *(Trichoderma viride)* : এটা গাছের রোগ নিয়ন্ত্রণকারী একটি ছত্রাক।

বিষাক্ততা ঃ মানুষ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী, পশু, পাখি, পরাগসংযোগী কীট, পরজীবী ও পরভোজী বন্ধুপোকাদের পক্ষে নিরাপদ।

কার্যকারিতা ঃ জৈব ছত্রাকনাশক। প্রয়োগ করা ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং এনজাইম, সেলুলোজ, গ্লুকোনেজ, প্রভৃতি নিঃসরণ করে। সেইসঙ্গে কিছু বিষাক্ত পদার্থ যেমন ট্রাইকোডারমিন নিঃসৃত করে। এই বিষাক্ত পদার্থগুলি রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর কোষপ্রাচীর গলিয়ে দিলে ভিতরের প্রোটোপ্লাজম বাইরে আসে, যা ট্রাইকোডার্মা

খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ট্রাইকোডারমিন বেশিরভাগ রোগ জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে মেরে ফেলে। এনজাইম ও অন্যান্য নিঃসৃত পদার্থগুলি বীজের অঙ্কুরোদগম ও গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। গাছে তাড়াতাড়ি ফুল আসতে সাহায্য করে। ট্রাইকোডার্মা দিয়ে বীজশোধন করলে আর রাসায়নিক ছত্রাকনাশক প্রয়োজন হবে না। ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ছাড়া ট্রাইকোর্ডামা হরজিয়ানাম একই কাজে ব্যবহার করা হয়। অনেক ফর্মুলেশানে দুটি প্রজাতির ছত্রাকের মিশ্রণ উপস্থিত থাকে।

ব্যবহার ঃ রোগ—শিকড়পচা, কাণ্ডপচা, পাতায় দাগ ধরা, টিক্কা, উইল্ট, ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলডিউ, চারাঢলা ইত্যাদি।

ফসল ঃ গম, ডালশস্য, তৈলবীজ, হলুদ, আদা, মরিচ, কলা, আখ, পান, কফি, চা ইত্যাদি।

মাত্রা ঃ বীজ শোধন—৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য কিংবা ১০% জেলিশোধন।

শিকড় শোধন—১০% দ্রবণে ১ ঘন্টা শিকড় ভেজানো। মাটিতে প্রয়োগ—২.৫ কেজি ফর্মুলেশান ৫০ কেজি জৈবসারেরর সঙ্গে মিশিয়ে ৩-১০ দিন ছায়ায় রেখে হেক্টর প্রতি প্রয়োগ। পাতার প্রয়োগ—২.৫ কেজি ফর্মুলেশান ২০০-৫০০ লিটার জলে গুলে হেক্টর প্রতি প্রয়োগ।

বাণিজ্যিক নাম ঃ প্যান্থার টি ভি (লিবিগস), ইকোফিট (বায়ার), ট্রাইকোস্টার (ট্রাসকো), কার্ড (অমিত)।

সিউডোমোনাস ফ্লু ও রেসেন্স : ইহা একটি রোগ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাকটিরিয়া।

ইহা উদ্ভিদের ভাসকুলার সিস্টেমে ঢুকে পড়ে এবং অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন করে। অ্যান্টিবায়োটিকগুলি ছত্রাকের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। ছত্রাকের স্পোরের অঙ্কুরোদ্গমে বাধা দেয় এবং গাছের মধ্যে ছত্রাকের বাসা বাঁধতে দেয় না। পাশাপাশি এই ব্যাকটেরিয়া সিউডোফোর নামের চিলেটিং এজেন্ট তৈরি করে বিভিন্ন ছত্রাকের খাওয়া কমিয়ে দিয়ে মেরে ফেলে। ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত বিষ বিভিন্ন ছত্রাকের কোষ-আবরণী দ্রবীভূত করে দিয়ে ঐ ছত্রাককে ধ্বংস করে। এছাড়া এই ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত জিব্বারেলিন ও অন্য উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ফসলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের শিকড় অঞ্চলে বসবাস করে এবং উদ্ভিদের শিকড় নিঃসৃত পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকে। শিকড় অঞ্চলে এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে কোন ছত্রাক বা নেমাটোড শিকড় দিয়ে উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

ব্যবহার ঃ ধানের ঝলসা, বাদামিদাগ, খোলাপচা, খোলার দাগ, ব্যাকটেরিয়া ধ্বসা, শিকড়ের নেমাটোড, কলার পানামা উইল্ট ও সিগাটোগা, লঙ্কা, টমাটো ও অন্য সবজির ঢলেপড়া, ডালশস্য, পান ও সর্ষের গোড়াপচা, শিকড়পচা ও উইল্ট, চীনাবাদামের কাণ্ডপচা ইত্যাদি।

মাত্রা ঃ মাটিতে প্রয়োগ—২.৫ কেজি ব্যাকটেরিয়া কালচার ৫০ কেজি শুকনো বালির সঙ্গে মিশিয়ে এক হেক্টরে প্রয়োগ।

বীজ শোধন ঃ প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ১০ গ্রাম কালচার মেশানো।

শিকড় শোধন ঃ ০.৫-১% দ্রবণে ১ঘন্টা শিকড় ডোবানো।

পাতায় স্প্রে ঃ ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে।

ব্যাণিজ্যিক নাম ঃ রক্ষক (অমিত), বায়োশীল্ড (অনু), সুরক্ষা (ইন্টার), সুরক্ষা প্লাস (হিমগিরি) সিউডোমোনাস (লোকনাথ), বায়োমোনাস (বায়োটেক), প্যান্থার পি-এফ (লিবিগ), স্প্রিং বায়ো (গ্রিনটেক), বায়োকিউব বি (টি স্ট্যান্স), আর্মি (এগ্রোনোভো), সিউডোসেল (এক্সল), স্পর্শ (মাল্টিচপ্লেক্স), নেমা টু (কৃষি রসা.), লুমিনোস (সোলাস)।

ব্যাসিলাস সাবটিলিস (Bacillus subtilis)

রোগ নিয়ন্ত্রণে এই ব্যাকটিরিয়ার এ-১৩ স্ট্রেনটি কার্যকরী। বীজ শোধন (৪ গ্রাম/কেজি বীজ) ও চারা শোধন (২০ গ্রাম/লিটার জল, ৩০ মিনিট) করা হয়। চায়ের কালো পচা রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। গাছের বৃদ্ধিও ঘটায়।

অ্যাসপারজিলাশ নাইজার : বীজ ও মাটিবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এই ছত্রাকের এ এন-২৭ (AN-27) স্ট্রেনটি বিশেষভাবে কার্যকরী। প্রতি কেজি বীজের সাথে ১০ গ্রাম হারে প্রয়োগে করতে হয়।

এন. পি. ভি

রাসায়নিক নাম ঃ নিউক্লিয়ার পলি হেড্রোসিস ভাইরাস।

ধর্মঃ জৈব কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত ভাইরাস। প্রকৃতিতে বিদ্যমান আছে। এই এন. পি.ভি এবং গ্রানুলোসিস ভাইরাস কীট দমনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

বিষাক্ততা ঃ মৌমাছি, মাছ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পরভোজী ও পরজীবী বন্ধুপোকাদের পক্ষে নিরাপদ।

কার্যকারিতা ঃ পাকস্থলীজনিত কীটনাশক। কীড়ার খাদ্যের মাধ্যমে পাকস্থলীতে যায়। তারপর অন্ত্রের মধ্যে ক্ষারীয় জারক রস ও প্রোটিওলাইটিক উৎসেচকের সাহায্যে ভাইরাসের পলিহেড্রাল আবরণী দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং ভিরিয়ন মুক্ত হয়ে যায়। মধ্যঅন্ত্রে (Midgut) প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটে। তারপর শরীরের অন্য কলাগুলিকে আক্রমণ করে। স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃস্রাবি গ্রন্থি আক্রান্ত হয়। ভাইরাস সংক্রমণের ৫-৭ দিনের মধ্যে কীড়া মন্থর হয়ে পড়ে, এবং পোকা নড়াচড়া বন্ধ করে দেয়। চামড়া ফেটে গিয়ে ভিতরেরর তরল অংশ বার হয়ে আসে। মরার পরে কীড়াগুলি শুকিয়ে গাঢ় বাদামি রঙের হয়ে যায়। ফসল ক্ষেতে পোকার ডিম দেখা গেলে কিংবা কীড়ার প্রাথমিক দশায় প্রয়োগ করা উচিত। বয়স্ক কীড়ার প্রতিরোধশক্তি বেশি এবং মরার জন্য বেশি সংখ্যক ভাইরাসের আক্রমণ দরকার। সে জন্য বয়স্ক কীড়া মারার জন্য রাসায়নিক কীটনাশকের সঙ্গে এই ভাইরাস মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই ভাইরাসের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। ভাইরাস মিশ্রিত পাতা কীড়াকে খাওয়ানো হয়। তারপর ঐ কীড়াকে থেঁতো করে কীটনাশক তৈরি করা হয়। এটা প্রধানত লেপিডপ্টেরা বর্গের পোকাতে ভাইরাস রোগ সৃষ্টি করে মেরে ফেলে। তবে কিছু ডিপ্টেরা ও হাইমেনোপ্টেরা বর্গের পোকা দমন করতে পারে।

ব্যবহার ঃ পোকা—আমেরিকান বোলওয়ার্ম, তামাকের কীড়া, লাল শুঁয়োপোকা, কাটুইপোকা (Army Worm)।

ফসল—তুলো, তামাক, ডালশস্য (ছোলা), তৈলবীজ (চীনাবাদাম), সবজি (টম্যাটো, ঢ্যাঁড়স)।

মাত্রা ঃ ২৫০-৫০০ এল. ই. (২৫০-৫০০টি লার্ভার নিষ্কাশন) তরল ফর্মুলেশান ৩৫০-৪০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট পোকার জন্য নির্দিষ্ট দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে।

৭.৩ সুসংহত শস্য সুরক্ষা

নগরায়ণের সাথে সাথে কৃষিজমি কমছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগাতে পরিকল্পনা মাফিক চাষবাস করা উচিত। মাটির স্বাস্থ্য বজায় রেখে পরিবেশ বান্ধব হতে গেলে সুস্থিত কৃষির প্রয়োজন। সুসংহত উপায়ে ফসলের রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ সুস্থিত কৃষির একটি প্রধান অঙ্গ। এজন্য সুসংহত উপায়ে ফসলের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ (Integrated Pest Management-IPM) এখন খুবই জরুরি।

আই. পি. এম. কী ?

আই পি এম হল এমন এক পদ্ধতি যার সাহায্যে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের সকল প্রকার ব্যবস্থার সার্বিক ও সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে ক্ষতিকারক রোগ, পোকা ও অন্যান্য শস্য শত্রুর সংখ্যা ও পরিমাণ ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতিকর সীমার নীচে রাখা হয়।

ফসল চাষ করলে রোগপোকা আসবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা বা পরিমাণ একটি সীমার বেশি বাড়তে না দিলে ফসলের ফলনে কোনো প্রভাব পড়ে না।

সুসংহত রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ নিম্নরূপ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়—

(১) পরিচর্যামূলক নিয়ন্ত্রণ

(২) যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

(৩) জৈবিক নিয়ন্ত্রণ

(৪) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

(১) পরিচর্যামূলক নিয়ন্ত্রণ ঃ ফসলের রোগপোকা ও আগাছা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিচর্যাগত নিয়ন্ত্রণ। যাতে ফসলে রোগ, পোকা ও অন্যান্য শস্য শত্রু আক্রমণ না হয় বা খুব কম হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতি চরম সীমার নীচে থাকে। এজন্য চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কতগুলি কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। এগুলি হল—

(ক) এলাকার উপযোগী, রোগপোকা সহনশীল ও উচ্চফলনশীল জাতের সংশিত বীজ ব্যবহার করা;

(খ) একই ফসল বারবার চাষ না করা, শস্য পর্যায়ের প্রবর্তন;

(গ) ফসল কাটার পর চাষ, গ্রীষ্মকালীন চাষ, আল ছাঁটা এবং ফসলের গোড়া নষ্ট করা;

(ঘ) বীজ শোধন করে লাগানো ও বীজতলায় চারা অবশ্যই শোধন করা। প্রয়োজনে চারার শিকড় শোধন করা;

(ঙ) জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার দেওয়া;

(চ) প্রয়োজন হলে অণুখাদ্য সার স্প্রে করা;

(ছ) সঠিক সময়ে, সঠিক বয়সে, সঠিক মাত্রায়, দূরত্বে ও সারিতে সুস্থ ও সবল চারা বা বীজ লাগানো;

(জ) সঠিক সময়ে সেচ প্রয়োগ, প্রয়োজনের বেশি জল না দেওয়া;

(ঝ) জমি ও আল সর্বদা আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার রাখা;

(ঞ) সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন জমিতে নেমে কোনাকুনি ভাবে গিয়ে গাছ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা। দেখতে হবে রোগপোকা বা বন্ধুপোকা কতগুলো আছে এবং কী কী ক্ষতি করছে। সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ট) প্রয়োজনে ফাঁদ ফসল বা সাথি ফসল ব্যবহার করা।

(২) যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

(ক) হাত দিয়ে ডিমের বা পোকার গাদা গাছ থেকে তুলে ফেলা বা আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করা।

(খ) সন্ধ্যাবেলা যৌথভাবে আলোক ফাঁদ বা আগুন জ্বালিয়ে পোকাধরা বা পুড়িয়ে মারা।

(ঘ) ফসল ও পোকার মধ্যে জাল বা অন্য কিছু দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করা।

(ঘ) ইঁদুর বা লেদা পোকার আক্রমণ হলে জমিতে গাছের ডাল বা বাঁশ পোঁতা।

(ঙ) শস্য দানার আর্দ্রতা রোদে শুকিয়ে সুপারিশকৃত মাত্রায় নামিয়ে গোলাজাত করা।

(৩) জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

প্রকৃতিতে বেশ কিছু কীটপতঙ্গ বা প্রাণী আছে যারা আমাদের ফসলের ক্ষতিকারক শত্রু পোকাদের (শাকাহারি) আক্রমণ করে তাদের সরাসরি মেরে ফেলে (পরভোজী) বা তাদের দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে মেরে ফেলে (পরজীবী)। এরা সকলেই মাংসাশী পোকা। এদেরই আমরা বন্ধু পোকা বলি। ফসলের বিভিন্ন বন্ধুপোকারা হল পরভোজী, পরজীবী ও বিভিন্ন মিত্র জীবাণু। এরাই নিঃশব্দে আমাদের ফসলকে শত্রু পোকার হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। প্রকৃতিতে যেমন শত্রুপোকা আছে তেমনই বন্ধুপোকাও আছে। অথচ আমরা অযথা আশঙ্কার ভিত্তিতে নির্বিচারে কীটনাশক প্রয়োগ করে এইসব বন্ধুপোকাদের ধ্বংস করে ফেলি। ফলে খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙে গিয়ে শত্রুপোকার আক্রমণ বেড়ে যায়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। সেইজন্য বন্ধুপোকার সংরক্ষণ প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। এমন কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ যা বন্ধুপোকার ক্ষতি করে না বা কম ক্ষতি করে। সেইজন্য জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ যা বন্ধুপোকার ক্ষতি করে না বা কম ক্ষতি করে। জৈব কীটনাশক যেমন নিমজাত (অ্যাজাডাইরেকটিন) বা জীবাণুজাত কীটনাশক, যেমন বি.টি., এন. পি. ভি., বিউভেরিয়া ইত্যাদি, জৈব ছত্রাকনাশক, যেমন ট্রাইকোডারমা, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স) বা 'সবুজ' শ্রেণীভুক্ত কীটনাশক ব্যবহার করলে ক্ষতি কম হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পাখি, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি আমাদের উপকার করে। জমিতে যথেষ্ট সংখ্যায় বন্ধুপোকা থাকলে শত্রু পোকারা বেশি বাড়তে পারে না। অনিষ্টকারী পোকা ও মিত্রপোকার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য আছে। বিচার বিবেচনাহীনভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করা উচিৎ নয়। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানি বাজারে বিক্রির জন্য নানা জৈব পেস্টিসাইড নিয়ে এসেছে এবং সুলভেই পাওয়া যাচ্ছে ও ব্যবহার হচ্ছে।

এছাড়াও বাজারে প্রাপ্ত ইনসেক্ট গ্রোথ রেগুলেটর (IGR) ও ফেরোমোন ফাঁদ, আঠা ফাঁদ ইত্যাদির সাহায্যেও বিভিন্ন কীট শত্রু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে, অথচ পরিবেশ দূষণও ঘটছে না।

(৪) রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

এটা হল শস্যরক্ষার শেষ অস্ত্র, অন্য ব্যবস্থাগুলির পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রয়োজন ছাড়া যেন কখনোই রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা না হয় এবং তা যেন পরিবেশের পক্ষে কম ক্ষতিকর হয়। ফসলে শত্রুপোকা ও বন্ধুপোকার অনুপাত এবং ফসলের ক্ষতির অর্থনৈতিক সীমা (ই টি এল) ছাড়াও ফসলের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করে তবেই রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করা উচিৎ। এর জন্য সপ্তাহে অন্তত একদিন জমিতে নেমে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। একই বিষ বারবার ব্যবহার করা যাবে না। এর ফলে পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক বারবার ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন শোষক পোকার ক্ষেত্রে দ্রুত পুনরুত্থান বা রিসার্জেন্স হয়। সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় সঠিক কৃষি বিষ প্রয়োগ করা উচিৎ। সবজির ক্ষেত্রে কম বিপদজনক, সীমিত ক্ষমতা যুক্ত বিষ যেমন নীল ও সবুজ রং এর শ্রেণীভুক্ত বিষ এবং জৈব ও জীবাণু ঘটিত বিষ ব্যবহার করা উচিৎ।

পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ ঃ

উপরোক্ত পন্থাগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য আমাদের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এর মাধ্যমেই আমরা ফসলের ক্ষতির সঠিক হিসাব বা পূর্বাভাস পেতে পারি।

আমরা জানি অর্থনৈতিক ক্ষতিকারক সীমা হচ্ছে ওষুধ প্রয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা নির্দ্ধারণের জন্য জমি পরিদর্শন এবং পোকা ও রোগের পর্যবেক্ষণ একান্তই প্রয়োজন।

সঠিক এবং নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন মরশুমে কোন ফসলের পোকা বা রোগ কত ক্ষতি করছে বা করতে পারে এবং তার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কী কী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি, সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

৭.৪ ফসলের রোগপোকা সহনশীল কিছু জাত

ফসল	রোগ/পোকা	সহনশীল/প্রতিরোধী জাত
ধান	ঝলসা ও ব্যাকটিরিয়া ধসা	আই. আর.-৩৬, আই. আর-৬৪, ক্ষিতীশ, শস্যশ্রী, সুরেশ, কুন্তি, যোগেন, শালিবাহন ইত্যাদি।
	খোলপচা	সবিতা, স্বর্ণ, পঙ্কজ, শালিবাহন, যোগেন, অমূল্য, মন্দিরা, পূর্ণেন্দু ইত্যাদি।
	খোলায় দাগ	আই. আর.-৩৬, সুরেশ, অমূল্য, মন্দিরা, নলিনী, বিপাশা ইত্যাদি।
	টুংরো রোগ	আই.আর-৩৬, সুরেশ, অমূল্য, মন্দিরা, নলিনী, বিপাশা ইত্যাদি।
	মাজরা রোগ	আই. আর-৩৬, শস্যশ্রী, সবিতা, ললাট, যোগেন, মন্দিরা, পূর্ণেন্দু ইত্যাদি।
	ভেঁপু পোকা	আই. আর-৩৬, ললাট, কুন্তি, পূর্ণেন্দু, জিতেন্দ্র, ধরিত্রী, ভুবন ইত্যাদি।
	বাদামি ও সাদাপিঠ	আই.আর-৩৬, ললাট, রসি, প্রকাশ, তারা, ভুবন, বিক্রমাচার্য ইত্যাদি।
	শ্যামা পোকা	আই. আর-৩৬, ললাট, রসি, প্রকাশ, তারা, ভুবন, বিক্রমাচার্য ইত্যাদি।
গম	মরচে রোগ	এইচ.ডি.-২৩৮০, এইচ. বি.-২০৮, ইউ. পি.-১১০৯।
মুগ	হলদে কুটে রোগ	পি.ডি.এম. ৮৪-১৩৯, পি.ডি.এম. ৮৪-১৪৩।
মুসুর	মরচে রোগ	মালিকা, পন্থ এল-২০৯ ও ৪০৬।
খেসারি	ডাউনি মিলডিউ	নির্মল।
মটর	পাউডারি মিলডিউ	কে.পি.এম.আর.-৪৯, ১৫৭ ও ১৪৪-১।
	কুটে রোগ	পারফেকশন, লিটল মারভেল।
ছোলা	ঢলেপড়া	ডব্লু.বি.জি-৩২/৪, বি. জি.-১০৩৫, আই.সি.সি.-১৪২১৬, ১৫১৩৩, ১৫১২৫, ১৫২৩৩।
	ধসা	গৌরব, বি. জি. ২৬১।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ৮ ❐ জৈব কৃষিতে নিমের ব্যবহার

নিমকে বলা হয় কল্প বৃক্ষ, কেউ বলেন 'Wonder Tree'। পাতা থেকে মূল পর্যন্ত ইহার সকল অংশই মানুষের, গৃহপালিত পশুর এবং কৃষিতে উপকারে আসে। নিমের আদি নিবাস ভারতীয় উপমহাদেশে তাই এর বৈজ্ঞানিক নাম **Azadirachta indica**। চির সবুজ নিমগাছ গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং খরা সহনশীল হওয়ায় ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র এমন কি এশিয়া, আফ্রিকায় খরা প্রবণ এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে। শস্য রক্ষায় এর বিশেষ অবদানের জন্য চিন দেশেও এর ব্যাপক প্রসার ঘটছে।

নিম গাছ দ্রুত বাড়ে। ৩ থেকে ৫ বৎসর বয়স থেকে মার্চ/এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে। সাধারণত জুন-জুলাই মাসে ফল পাকে। প্রতি গাছে (আকার অনুযায়ী) ৩০-১০০ কেজি পর্যন্ত ফল ধরে। ৫০ কেজি ফল থেকে ৩০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। ৩০ কেজি বীজ থেকে ৬ লিটার নিম তেল এবং ২৪ কেজি নিম খইল তৈরি হয়, বীজ থেকেই সাধারণত এর বিস্তার হয়। নার্সারীতে পলি প্যাকেটে চারা তৈরি করলে যে কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে চারা বসান যায়।

নিমের ব্যবহার ঃ ঔষধ প্রস্তুতিতে, পরিবেশ সুরক্ষায়, গৃহস্থের বিভিন্ন কাজে, শিল্পে এবং কৃষিতে সর্বত্রই নিমের ব্যবহার; যার জন্য একে কল্প বৃক্ষ বা Wonder tree বলা হয়।

১. চিরাচরিত ব্যবহার

নিম গাছ পরিবেশকে ঠান্ডা রাখে, ডাল ছায়া দেয়। এই জন্য বাড়ীর নিকটে স্কুলের বা কোন সভা গৃহের চারপাশে এবং রাস্তার দুই ধারে নিমগাছ লাগান প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিমগাছের ছায়ায় কৃষকগণ গরুবাছুর, কৃষি যন্ত্রপাতি রাখেন। নিমগাছের ডালপালা জ্বালানি হিসাবে এবং কাঠ আসবাবপত্র এবং কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কারণ নিম কাঠে পোকা ধরে না। হিন্দুরা নিমকে পবিত্র মনে করেন। অনেকে নিমপাতা সহ জল গরম করে বছরের প্রথম দিন স্নান করে, কেহ কেহ কচি নিমপাতা ফুল, গুড় এবং কাঁচা আমের কাথ তৈরি করে খায়—শরীর সুস্থ রাখার জন্য। গ্রামে নিম দাঁতনের ব্যবহারও সর্বজন বিদিত।

বাণিজ্যিক ব্যবহার ঃ সাবান তৈরিতে, মশা নিরোধক ক্রীম, দাঁতের মাজন প্রভৃতি তৈরিতে নিম তেল ব্যবহৃত হয়। নিম গাছের ছাল থেকে ট্যানিন পাওয়া যায় যা ট্যানিং শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

২। **ভেষজ রূপে ব্যবহার ঃ** নিমের ছালের নির্যাস—টনিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা পাইওরিয়া, চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক। কচিপাতা ও ফুলের নির্যাস—আমবাত, লিভারের রোগ, শ্বেতি, ডায়াবিটিস, আলসার, একজিমা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

ফল ঃ কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি প্রস্রাবঘটিত রোগ এবং অর্শ রোগে কার্যকরী।

তেল ঃ আলসার, দাদ, বাত, মধুমেহ, লেপ্রসি প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পশু চিকিৎসায়ও নিম তেল ব্যবহৃত হয়।

কৃষিকার্যে ব্যবহার ঃ কৃষিকার্যে নিমের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম খইল জৈব সার হিসাবে কার্যকরী। এতে ৪ শতাংশ নাইট্রোজেন, ১.৫% ফসফেট এবং প্রায় ১.৩% পটাশিয়াম ও অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্য রয়েছে। ইহা ব্যতীত নিম খইল প্রয়োগে মাটিতে অবস্থিত নিমাটোড, রোগ জীবাণু বা পোকার উপদ্রব ও প্রতিরোধ করে। নিম খইল নাইট্রিফিকেশন প্রতিরোধক হওয়ায় ইহা Neem coated Urea প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয়। Neem coated Urea প্রয়োগে ফসল বহুদিন ধরে নাইট্রোজেনের যোগান পায় ফলে কম নাইট্রোজেন প্রয়োগেও অধিক উৎপাদন হয়।

মরুভূমি এলাকায় নিম গাছ Wind break হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ফলে বাতাসের দ্বারা ক্ষয়ীভবন বন্ধ করা যায় এবং পতিত জমিও কাজে লাগান সম্ভব হয়। ছায়ায় শুকিয়ে নিমপাতা গুদামজাত শস্যে মিশিয়ে রাখলে ঐ শস্য পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রতি বৎসর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ফসল রোগপোকার আক্রমণে নষ্ট হয়। ফসল রক্ষার জন্য রাসায়নিক রোগ পোকা নাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

সবুজ বিপ্লবের সময়ে, উচ্চ ফলনশীল এবং হাইব্রীড ফসলের প্রবর্তনের ফলে রাসায়নিক সার ও রোগপোকা নাশকের ব্যবহার অত্যন্ত বেড়ে যায়।

রাসায়নিক কীটনাশকের উপর এই অতিরিক্ত নির্ভরতা আমাদের পরিবেশকে অত্যন্ত দূষিত করে তুলেছে খাদ্য শৃঙ্খলেও কৃষি বিষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ফলে মানুষের শরীরে বিভিন্ন মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। The world Health Organisation (WHO) এর সমীক্ষায় প্রকাশ যে প্রতি বৎসর কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় প্রচুর লোকের মৃত্যু ঘটে। উপরন্তু কৃষিজাত দ্রব্যে কীটনাশকের উপস্থিতি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে বিদেশে আমাদের এইসকল দ্রব্য যেমন—চা, কফি, ফল, সবজি ইত্যাদি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

রাসায়নিক কীটনাশকের আর একটা অসুবিধা হল যত শক্তিশালী কীটনাশকই হোক কয়েক বছর প্রয়োগের পর কীটপতঙ্গের ওই সকল কীটনাশকের উপর সহনশীলতা গড়ে ওঠে, ফলে নূতন কার্যকরী কীটনাশকের প্রয়োজন হয়। রাসায়নিক কীটনাশকের দূষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এর পরিবর্তে জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

জৈব কীটনাশকের মধ্যে নিম থেকে প্রস্তুত কীটনাশকের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য। নিম শুধু পোকা নয়, রোগ প্রতিরোধেও সক্ষম। আমাদের দেশে নিম গাছের প্রাচুর্যের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। গত ৫০-৬০ বছর ধরে দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা নিমের কীটনাশক গুণ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পাতা, ছাল ফল প্রভৃতি নিমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রায় ১৬০টি জৈব যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৪০টি জৈব-যৌগ (লিমোনয়েডস) যেমন অ্যাজাডিরেকটিন, মেলিয়ানট্রাওল, শ্যালান্নিন, নিম্বিন। নিম্বিডিন প্রভৃতির মধ্যে কীট পতঙ্গ দমনের ক্ষমতা বর্তমান। এইগুলির মধ্যে অ্যাজাডিরেকটিনের কীটদমনের ক্ষমতা সর্বাধিক। কীট শত্রু দমনে নিমতেলের (বিভিন্ন অনুপাতে) ব্যবহার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু এই নিম তেলে সমস্ত রকম কার্যকরী যৌগ বর্তমান না থাকায় সবরকম পোকা দমনে ইহা সক্ষম নয়।

গত ৩০-৪০ বৎসর ধরে নিম বীজ, শাখা, পাতা বা নিমের ছালের নির্যাস দিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত যে এই সকল নির্যাস কীটশত্রুর ওপরে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। বিশেষজ্ঞদের মতে সঠিকভাবে সংগ্রহীত হলে নিম বীজের যৌগগুলি প্রায় ৩০০টি প্রজাতির কীটশত্রু, নেমাটোড এবং মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন রোগ জীবাণু দমন করতে সক্ষম।

সুতরাং নিম বীজের সঠিক মান রক্ষা করতে পারলে নিম বীজের নির্যাস দিয়ে ফসলের অধিকাংশ কীটশত্রুকেই দমন করা সম্ভব।

সঠিক মান রক্ষার প্রয়োজন কেন হয়?

কার্যকরী জৈব যৌগগুলি ভঙ্গুর প্রকৃতির হওয়ায় সহজে এদের গুণমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। যেমন—আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে, উচ্চ তাপমান বা উচ্চ আর্দ্রতার প্রভাবে, সূর্যালোকের প্রভাবে ফল অধিক সময় মাটিতে পড়ে থাকলে অথবা বায়ু নিরুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করলে নিম বীজের গুণমান নষ্ট হয়।

সুতরাং নিমবীজ সংগ্রহ করা, শুকানো এবং সংরক্ষণের সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইউনাইটেড নেশন ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট অরগানাইজেশন (U.N.I.D.O) অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নিম বীজ সংগ্রহ ও পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ এবং বীজের শাঁসের নির্যাস প্রস্তুত করার একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রস্তুত করেছে। যার ফলে এই নির্যাস দিয়ে ফসলের ক্ষতিকর অধিকাংশ কীটশত্রু দমন সম্ভব হচ্ছে।

নিমের নির্যাস কীভাবে কাজ করে ঃ-

নিমের নির্যাস সরাসরি পোকাকে মারে না কিন্তু পরোক্ষভাবে বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এদের কার্যকরিতা খর্ব করে, ফসলের ক্ষতি রোধ করে— যেমন :

১। খাদ্যে অরুচি উৎপাদন করে, ফলে ফসলের ক্ষতি রোধ হয়।

২। স্প্রে করা ফসল কীট পতঙ্গ এড়িয়ে চলে (repellent) ফলে নতুন আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়।

৩। পোকার বৃদ্ধি রুদ্ধ হয় বিশেষ করে moulting বন্ধ হওয়ায় শীঘ্রই উহাদের মৃত্যু হয়।

৪। স্ত্রী পোকার ডিম পাড়া বন্ধ হয় সুতরাং বংশবিস্তার বন্ধ হয়।

৫। বন্ধু পোকার আবির্ভাব ঘটে। খাওয়া বন্ধ হওয়ায় পোকা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মাকড়সা, বন্ধু পোকা বা পাখি প্রভৃতি এদের সহজেই ধ্বংস করে।

নিমজাত কীটনাশকের সুবিধাগুলি হল :

১। ক্ষতিকারক পোকা দমন করলেও বন্ধু পোকা, মাকড়সা, মৌমাছি প্রভৃতির কোন ক্ষতি সাধন করে না। সুতরাং .. বন্ধু পোকার পুনরাগমন ঘটে।

২। মানুষ, পশু-পক্ষী বা পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। সুতরাং ইহাকে পরিবেশ বান্ধব বলা চলে।

৩। নিমের নির্যাসে বহুসংখ্যক "লিমোনয়েডস" থাকায় ইহার বিরুদ্ধে (resistance) প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার সম্ভাবনা নেই।

৪। ইহা ফসলের বিভিন্ন রোগ এবং নেমাটোড দমনে সক্ষম।

৫। নিমের নির্যাস প্রয়োগে সবজি জাতীয় ফসলের স্থায়িত্বকাল বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি ফলন পাওয়া যায়।

নিমবীজ সংগ্রহ প্রণালী :

১। নিমফল সংগ্রহঃ জুন-জুলাই মাসে নিম বীজ পাকা শুরু হলে নিম গাছের নীচে ত্রিপল বা পলিথিন বিছিয়ে নাড়া দিয়ে ফল পাড়তে হয়। অন্যথায় নিম গাছের নীচের জায়গা পরিষ্কার করে ঝড়া ফল ১ ঘন্টা অন্তর ঝাঁটা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে **নিম বীজ যেন ১ ঘন্টার বেশি মাটির সংস্পর্শে না থাকে**।

২। খোসা ছাঁড়ানো : প্রতিদিনের সংগ্রহীত বীজ বালতি বা ঝুড়িতে নিয়ে অথবা চটের বস্তার ওপরে ঘসে খোসা বাদ দিয়ে সংগৃহীত বীজ জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৩। বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ : খোসা ছাড়ানো পরিষ্কার বীজ সিমেন্টের মেঝে অথবা পলিথিনের ওপর বিছিয়ে "ছায়ায়" শুকাতে হবে। **মাটিতে ছড়িয়ে অথবা রৌদ্রে শুকানো চলবে না**। ৫-৬ দিন ধরে শুকাতে হবে। শুকানো বীজে শতকরা ১১ ভাগের বেশি আর্দ্রতা থাকলে বীজের স্থায়িত্ব কমে যাবে।

শুকনো বীজ ঝুড়ি বা চটের ব্যাগে, সূর্যালোক থেকে দুরে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। নিম বীজ বায়ু নিরুদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করা চলবে না।

নিমবীজ থেকে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী (Neem-Seed kerneil Aqueous extract) :

ফসলের প্রয়োগের পূর্বে সঠিক ভাবে সংগৃহীত বীজ নিয়ে প্রথমে খোসা ছাড়াতে হবে। পরে উহাকে এমনভাবে গুঁড়ো করতে হবে যেন উহা ১৮ মেস ছাকনি দিয়ে ছাঁকা চলে। দুইভাবে গুড়ো করা যায়—

(১) কাঠের তৈরি হামান দিস্তায় প্রথমে ফল ভেঙে খোসা আলাদা করে নিয়ে পরে পুনরায় উক্ত মাপে গুঁড়ো করতে হবে (১৮ মেস)।

(২) "ডিকরটিকেটর" মেশিনের সাহায্যে প্রথমেই খোসা ছাড়িয়ে মিকচার মেশিন দিয়ে গুঁড়ো করা যায়।

নির্যাস তৈরি :

ফসলে প্রয়োগ করার আগের দিন বিকালে প্রতি কেজি নিম বীজ গুঁড়ো ৩ লিটার জলের সাথে মেশাতে হবে। ঐ মিশ্রণে ১০ মিলি Surfactant মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

পরের দিন সকালে ঐ মিশ্রণ পুনরায় ভালোভাবে নাড়িয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে ঐ মিশ্রণ একটি পাত্রে সংগ্রহ করতে হবে। কাপড়ের উপরের গুড়ো পুনরায় ৩ লিটার জলে মিশিয়ে পুনরায় ভালোভাবে নেড়ে আবার ছেঁকে ঐ তরল পূর্বের পাত্রে ঢেলে দিন। এইরূপ অন্তত ৪ বার ছাঁকার পর যতটা নির্যাস বের হল সেটার সাথে আরো জল মিশিয়ে মোট ২০ লিটার নির্যাস তৈরি করতে হবে। এটি ভালভাবে নাড়িয়ে দিলে স্প্রে করার উপযোগী নির্যাস তৈরি হবে।

ওষুধ প্রয়োগ :

নির্যাস তৈরি হলে পোকায় আক্রান্ত ফসলে বিকালে রোদের তেজ কমে গেলে স্প্রেয়ার দিয়ে পাতার পিছন দিকে স্প্রে করতে হবে। সাতদিন পরে একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয়বার স্প্রে করা প্রয়োজন। এরপরে পোকার পুনরায় আগমন হলে তখন স্প্রে করতে হবে। না হলে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। নিমের নির্যাস, নিম তেল বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করে ফসলের অধিকাংশ পোকামাকড় দমন সম্ভব। এছাড়াও ফসলের প্রতিরক্ষায় নিম কীভাবে কাজে আসে আলোচনা করা যাক :

নিমপাতা ছায়ায় শুকিয়ে গুঁড়ো করে ধান, গম, ডাল ইত্যাদি সকল শস্য সংরক্ষণ করলে Stored grain pest এর আক্রমণ রোধ করা যায়। নিম বীজ গুঁড়ো এবং নিম তেল সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা চলে। নিমের খইলে অন্যান্য খাদ্যোপাদান ছাড়াও প্রচুর সালফার বর্তমান। নিম খইল জমিতে ব্যবহারে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন পোকা ছাড়াও, নেমাটোড, বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক ঘটিত এবং ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগও প্রতিরোধ করে। ভিণ্ডির মোজাইক ভাইরাস, ধানের RTV ভাইরাস দমনেও নিমের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং কৃষিবিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটা প্রমাণিত যে নিমের তৈরি বিভিন্ন উপচার দিয়ে ফসলের বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব। সুতরাং জৈব কৃষিতে নিমের ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে নিমগাছ সর্বত্রই বর্তমান। সুতরাং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ যদি তাদের বাড়ির চৌহদ্দিতে বা মাঠের ধারে নিম গাছ লাগান (Grow) তবে বাড়ির মহিলারাই সেই গাছ থেকে নিমবীজ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ এবং তার নির্যাস প্রস্তুত করে কৃষকদের সরবরাহ করতে পারবেন, এবং ফসলের রোগপোকা দমন করার জন্য বাড়তি কোন খরচ লাগবে না, পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে।

কৃষিতে নিমের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে নিমের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং উদ্যমী যুবকগণ সঠিক পদ্ধতিতে নিম বীজ সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংস্থাকে সরবরাহ করে আর্থিক দিকে লাভবান হতে পারেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদার হতে পারে।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ৯ ❐ জৈব কৃষির প্রবর্তনে ভারতের জাতীয় কর্মসূচি

জৈব কৃষি ব্যবস্থা ও জৈব চাষ আমাদের দেশের চাষবাসে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। বিদেশ থেকে জৈব কৃষির চিন্তাধারা আমাদের দেশে আমদানি করা হয়নি। ভারতের কৃষকরা তাঁদের চাষবাসকে চিরায়ত করতে জৈব কৃষিকে বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন।

আজকের পৃথিবীতে প্রায় একশোর বেশি দেশে জৈব কৃষি প্রচলিত। এর মধ্যে ভারতও আছে। আমাদের দেশে কৃষিবিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও রূপায়ণের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রয়াসে জৈব কৃষির মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা এবং গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কাজ হচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জৈব চাষের আওতাভুক্ত এলাকা ২ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর। শংসিত বনভূমি ধরে ভারতে জৈব কৃষি এলাকা হল ২৫ লক্ষ হেক্টর। এই এলাকা প্রতিদিনই বাড়ছে। এলাকার ভিত্তিতে ভারতের স্থান সপ্তম।

জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে সুগঠিত করতে ভারত সরকার এর জাতীয় মান নির্ধারণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের অধীনস্থ 'ন্যাশনাল সেন্টার অব অর্গানিক ফার্মিং' এই কাজে সাহায্যকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। জৈব কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারি উদ্যোগগুলির মধ্যে আছে :

(১) জৈব চাষের উপকরণ কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ;

(২) কৃষকরা যাতে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পান, তা সুনিশ্চিত করা;

(৩) শহরাঞ্চলে উপভোক্তা ও উৎপাদকদের সমন্বয় সমিতি গড়ে তোলা;

(৪) জৈব চাষে উৎপাদিত বিষমুক্ত খাদ্যসামগ্রীর গুণাগুণ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা;

(৫) উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ;

(৬) কৃষকদের মধ্যে জৈব চাষের উৎসাহ বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ;

(৭) জৈব চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র প্রদান।

উপরে উল্লেখ করা উদ্যোগগুলি রূপায়ণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্তরে বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে আছে :

(১) পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে কৃষকদের পরিষেবা দেওয়া এবং একই সঙ্গে কৃষকদের মেধা ও স্বয়ম্ভরতা বৃদ্ধি;

(২) কৃষকরা যাতে নিজেরাই জৈব চাষের উপকরণ তৈরি করে বা সংগ্রহ করে নিতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(৩) জৈব চাষের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন;

(৪) শংসাকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(৫) জৈব কৃষির অগ্রগতির জন্য উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রচলন;

(৬) জৈব চাষের উৎপাদনকে বিপণনে সাহায্য করা।

এইসব প্রকল্পের রূপায়ণের ফলে সারা দেশ জুড়ে জৈব চাষের উপকরণ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন হাজার হাজার কৃষক। কয়েকশো মডেল জৈব খামার গড়ে উঠেছে। চিহ্নিত হয়েছে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। সরকারের সঙ্গে জৈব কৃষির উন্নতির প্রয়াসে এগিয়ে এসেছে অনেক বেসরকারী সংস্থাও।

ইতিমধ্যে সরকারি কর্মসূচি অনুযায়ী পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি যেসব কাজ করছে, তার তালিকায় আছে ঃ

(১) কৃষকদের নিয়ে দল গঠন;

(২) কৃষকদের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া;

(৩) নিজস্ব শংসাকরণ পদ্ধতি শুরু করা;

(৪) প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(৫) উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিপণনে কৃষকদের সাহায্য প্রদান।

জৈব কৃষির উন্নতিসাধনে আমাদের জাতীয় প্রকল্পের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন'। এই যৌথ উদ্যোগ ব্যবস্থা নিয়েছে কম খরচে বিকল্প শংসাকরণ এবং কৃষকদের সুনিশ্চিত অংশগ্রহণের।

জৈব কৃষিপণ্য উৎপাদনে আমাদের দেশের আর একটি সুপরিচিত প্রকল্পের নাম, '**ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অরগানিক প্রডাকশন।**' এই প্রকল্পের প্রধান কাজ জৈব কৃষি ও সঠিক গুণমানের জৈব কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া। এই প্রকল্পে শংসাকরণেরও সুবিধা আছে। জাতীয় স্তরে জৈব কৃষির উৎপাদনকে গুণমানের মাত্রা বিচারের পর সঠিক হিসেবে চিহ্নিত করতে 'ইন্ডিয়া অর্গানিক লোগো' বানানো হয়েছে। এই লোগো ছাপা থাকলে বুঝতে হবে, উৎপাদিত ফসল জৈব কৃষির এবং নির্দিষ্ট গুণমানের। জৈব কৃষিপণ্য রপ্তানি করতে হলে এবং দেশীয় বাজারে জনপ্রিয় করতে এই লোগোর বিরাট ভূমিকা থাকবে।

পরিশেষে এ কথাই বলা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে জৈব কৃষির কর্মসূচি জৈব চাষের প্রসারে নিম্নলিখিত প্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়েছে :

(১) জৈব চাষে ফসলের উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করা;

(২) এই উৎপাদনে কৃষকের ঝুঁকি কমানো;

(৩) অধিক দামে জৈব কৃষির উৎপাদন ও বিক্রয় সুনিশ্চিত করা;

(৪) উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য কৃষকের সঙ্গে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ সাধন;

(৫) জৈব কৃষির উপকরণের দাম কমানো;

(৬) শংসাপত্র সহজলভ্য করা।

জৈব কৃষির জাতীয় কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমতা রেখে আমাদের দেশের জৈব কৃষির উৎপাদনের শংসাকরণের কাজ করতে ভারত সরকার ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে '**ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অর্গানিক ফার্মিং**' গড়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে সারা দেশ জুড়েই এই সংস্থার শাখা অফিস খুলছে। ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউট জৈব কৃষির উৎপাদন শংসাকরণের জন্য আমাদের দেশের টি বোর্ড, স্পাইসেস বোর্ড, কোকোনাট ডেভলপমেন্ট বোর্ড, এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভলপমেন্ট অথরিটি এবং ডাইরেক্টরেট অব ক্যাসু অ্যান্ড কোকো-কে নির্বাচিত করেছে।

ভারত সরকার দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে জৈব কৃষির প্রসার ও উন্নয়নকে। সরকারের হয়ে এই কাজে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অর্গানিক ফার্মিং।

জৈব কৃষির মাধ্যমে উৎপন্ন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানিকৃত খাদ্যদ্রব্য এবং জৈব সামগ্রী হল—বাসমতি চাল, ডাল, মধু, চা, শুকনো ফল, সংরক্ষিত খাদ্য, তিল, মশলা, ভেষজ উদ্ভিজ্জ, তুলা, জামাকাপড়, প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি। জৈব তুলা রপ্তানি হয় প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের এবং বাসমতি চাল রপ্তানি হয় প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ১০ ❐ শহর এবং শহরতলিতে জৈব কৃষি এবং উদ্যানজাত ফসল চাষ

গঠন

১০.১ ভূমিকা
১০.২ বিশ্ব পরিস্থিতি
১০.৩ সংজ্ঞা
১০.৪ উপসংহার

১০.১ ভূমিকা

বিগত কয়েক দশক ধরে দ্রুত নগরায়ন এলাকা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (with rapid urbanization) সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটছে। এখন বিশ্বের অর্দ্ধেক মানুষই শহর এবং শহরতলীতে বসবাস করে। এতে মাত্র পৃথিবীর দুই শতাংশ এলাকা অধিকৃত হয়েছে, কিন্তু তারা পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ সম্পদ (resources) ব্যবহার করছে। কিন্তু যে ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় এবং অবনয়ন (depletion & degradation) দ্রুত হারে বাড়ছে তাতে নগরের প্রাকৃতিক সুস্থিরতা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। প্রতি মুহূর্তে বড়ধরনের বাস্তুতন্ত্রের সমস্যাজনিত পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বর্তমানে সারা বিশ্বে একটা উদ্বায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। শহর (Urban) এবং শহরতলির (Peri-Urban) কৃষি তথা উদ্যানজাত ফসল চাষ এবং এদের সুস্থায়ী বিষয়গুলি তাই এখন বাঁচার প্রয়োজনীয়তার মূল এবং জরুরী চাবিকাঠি। কিউবা একসময় এরূপ সংকটকালের সম্মুখীন হয়েছিল, জ্বালানি ও খাদ্যের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছিল। এসব হঠাৎ বিপদ সত্ত্বেও সঠিক যোজনা (planning) এবং পরিকাঠামোর সুস্থিরতায় শহর এবং শহরতলির কৃষি ও উদ্যানজাত ফসল চাষে বিপ্লব ঘটিয়ে বিষাদ কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একই কথা আমাদের ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১০.২ বিশ্ব পরিস্থিতি

বিশ্বের বিভিন্ন শহরাঞ্চল এবং তাদের সংলগ্ন চারপাশের খোলা এলাকায়, পেছনের দিকে এবং পাবলিক ও প্রাইভেট খোলা জায়গায় বিভিন্ন কৃষি ফসল তথা উদ্যানজাত ফসলের চাষবাস ঐতিহাসিকভাবে সাধারণ ঘটনা। তবে ১৯৮০-র দশক থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৯০ দশকের প্রথম দিক থেকে UPUA একটি তাৎপর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পের (UNDP) সহায়তায় বিশ্বব্যাপী এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে এবং ১৯৯৬ সালে "Urban Agriculture, Food, jobs, and sustainable cities" প্রকাশিত হয়। এইভাবে প্রথম "The Urban Agriculture Network" (TUAN) এর ভিত্তিস্থাপন ঘটে।

১৯৯৭ সালে FAO বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছড়িয়ে দেয়। ১৯৯৯ সালে ক্যাথেরিন মারফির এক সমীক্ষায় জানা যায়, প্রায় ১৪ শতাংশ বিশ্বের খাদ্যশস্য শহর এলাকায় উৎপন্ন হয়েছিল। ২০০৬ সালে কিউবার খাদ্যশস্যের ফলন শহরকেন্দ্রিক এলাকা থেকেই ৩ মিলিয়ন টনে

পৌঁছেছিল। এইভাবে জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থাগুলি শহর তথা শহরতলির এলাকায় সুস্থির কৃষি এবং উদ্যানজাত ফসল চাষের উন্নয়ন করে শহরের গরীব লোকেদের খাদ্য সুনিশ্চয়তা গড়ে তোলে।

১০.৩ সংজ্ঞা

● **শহরের এলাকা** (Urban area) বলতে ২০০১ সালের ভারতের জনগণনা অনুযায়ী কোন পৌর এলাকা, কর্পোরেশন, ক্যানটনমেন্ট বোর্ড অথবা শহর এলাকা কমিটির বা অন্যান্য যেকোন জায়গা বোঝায় যাতে রয়েছে—

(১) কমপক্ষে ৫০০০ লোকসংখ্যা;

(২) কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ পুরুষ (কাজের লোক), অকৃষির কাজে যুক্ত।

অথবা প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় কমপক্ষে ৪০০ জন লোকসংখ্যার ঘনত্ব রয়েছে।

● **শহর এবং শহরতলির কৃষি ঃ**

ইউ. এন (UN)-এর ফাও (FAO)-এর সংজ্ঞা মতে শহর এবং শহরতলির কৃষি হ'ল—কৃষি, উদ্যানজাতফসল, মাছচাষ (agriculture) এবং বন। কৃষিবন (Agro-forestry) শহরের বা শহরতলির মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে গবাদি পশু ও পশুখাদ্য (Foodder) এবং দুগ্ধউৎপাদন, বিশেষ করে শহরতলিতে থাকবে।

শহরের কৃষি (Urban agriculture) সাধারণত ছোট ছোট এলাকায়, ফাঁকা জমি, বাগান, বাড়ির পেছনের অংশ, বাড়ির ছাদ (roof), ব্যালকনি বা বারান্দা, গামলা বা টবে ফসল চাষ করা হয়।

শহরতলির কৃষি ইউনিটগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশি ফাঁকা জমি (more open space) বড় আকারে থাকবে, যেখানে উদ্যানজাত ফসলের বেশি ফলন, মাছ চাষ, পোল্ট্রি, ইত্যাদিও করা যাবে। এই দুটি চাষ পদ্ধতি হবে জৈবিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এখানে কোন রাসায়নিক সার, ওষুধ ব্যবহার নয়।

শহর এবং শহরতলির কৃষিতে সুবিধা

(১) এই দুই প্রকার চাষেই খাদ্য সুনিশ্চিয়তা বাড়বে, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং যোগান বাড়বে বিশেষ করে পচনশীল খাদ্য। গরীব শহরবাসীরা তাদের সংসারেরর আয় বাড়াতে সক্ষম হবেন, বাড়তি খাদ্য শস্য বাজারে বিক্রি করে। এতে তাদের সংকটের তীব্রতা কমবে। জলদি জাতের সবজি চাষে তাদের চটজলদি প্রয়োজনীয়তা মিটবে এবং অতিরিক্ত উৎপাদন বাজারে বিক্রি করে আয় বাড়াতে পারবে।

(২) এই জৈবিক চাষবাসে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদিকা শক্তি, কাজের সুযোগ (employment) এবং আনুষঙ্গিক আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, বাগান করা, কম্পোষ্ট সার তৈরি এবং বিভিন্ন কৃষি উপকরণ (inputs) সরবরাহ ও বিক্রয়ে সাশ্রয় বাড়বে। তাদের জৈবিক খাদ্যশস্য বাজারে বেশি দামে বিক্রয় হবে। তাদের উৎপন্ন খাদ্য শস্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ করে দেশ বিদেশের রপ্তানি বাজারে ভাল দামে বিক্রয় হবে।

এতে আংশিক সময়ের কাজ (part time work) এবং মহিলাদের সময়মত কাজ ছাড়া অবসরপ্রাপ্তরাও কাজ করেন।

(৩) এই জৈবিক চাষবাসে খাদ্যশস্যের পুষ্টিমূল্য বাড়ে। এই চাষবাসে যেহেতু কৃত্রিম রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ, তাই খাদ্যবস্তুতে কোন অবশিষ্টাংশ বিষাক্ত পদার্থ থাকে না।

(৪) এই চাষবাস শক্তি বা energy savings, যথা খাদ্যশস্যের প্যাকেজিং, গুদামজাত করা বা storage, রেফ্রিজারেশন এবং পরিবহন খরচ কম লাগবে। ফসল তোলা এবং খাদ্য গ্রহণের মধ্যে সময়ের ফারাক অনেকটা কম হয়, খরচ অনেক নেমে যায়, খাদ্য তাজা অবস্থায় পাওয়া যায়, দূষণ এবং গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমণ মাত্রা খুব কম হয়।

(৫) এই চাষবাসে মাটির খাদ্য উপাদান শহরের জৈব বর্জ্য পদার্থ থেকে কম্পোষ্টের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় এবং পূরণ হয়। এতে বর্তমান পৌর আবর্জনা পরিচর্যার খরচ কম পড়ে এবং মাটি ও জলাশয় মানব স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের পক্ষে অনুকূল থাকে। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র, আর্থিক এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে জৈবিক চাষ উপকারী ভূমিকা পালন করে।

(৬) এই চাষবাসে জৈবিক বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি পায় (enhances biological diversity)। এর ফলে বিভিন্ন জাতের ফলমূল, সবজি, ওষধি গাছ-গাছড়া, বাহারী গাছপালার চাষবাসে জীব বৈচিত্র্যতা সুরক্ষিত থাকে। এতে পশুপাখী এবং অন্যান্য উদ্ভিদকূল ও জীবের বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি পায়।

(৭) শহর এবং শহরতলির বনাঞ্চল কৃষিবন পরিবেশ সুরক্ষার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করে, কিছু খাদ্যশস্য এবং অ-খাদ্যশস্য (non-food) উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বাতাসের দূষণ কমে, মাটি এবং জল সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়। ভূস্তরের জলের পূর্ননবীকরণ (groundwater recharge) হয় এতে পানীয় জল তথা সেচের জল সহজলভ্য হয়। আর্সেনিক বা সেঁকো বিষের সম্ভাবনা কমে।

(৮) এই চাষবাসে গ্রীন হাউস গ্যাস সমূহের (কার্বনডাই অক্সাইড) নির্গমন কমে এবং উষ্ণায়ণ (global warming) মাত্রা কম হয়।

(৯) এতে নগরায়ণের সৌন্দর্য বাড়ে, অণু-জলবায়ু (microclimate) ভাল হয়, পরিবেশ বসবাসের পক্ষে খুব সুগম হয়। বাইরের দর্শকদের কাছে শহরের সৌন্দর্য উপভোগ্য হয়।

(১০) এই চাষবাসে শহরবাসীদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কম্যুনিটির বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মেলামেশা বৃদ্ধি এবং সামাজিক অস্থিরতা কমে। মহিলাদের চাষবাসে আয় বৃদ্ধি হয়, সংসারের সাশ্রয় বাড়ে এবং সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে।

(১১) সুস্থিরতা এবং ভাল পরিবেশে মাছচাষ, (aquaculture) ও অন্যান্য জলজ প্রাণীদের চাষবাস বৃদ্ধি পায়, মশার উৎপাত কমে এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপও নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(১২) প্রাকৃতিক শিক্ষা, পরিবেশ বিষয়ে তথ্যাদির জ্ঞান, প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি এই চাষ পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার ঃ ভারতের শহর এবং শহরতলিতে জৈবিক চাষবাসে মহারাষ্ট্র অন্যান্য রাজ্য থেকে এগিয়ে। পুনে এ বিষয়ে বেশ অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। ১৯৮০-র দশক থেকে এখানে এই চাষপদ্ধতি চলছে। টেরাস পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে সবজির বাগান খুবই সাফল্য লাভ করেছে। মুম্বাই শহরে এই চাষবাস খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কলকাতা শহর এবং শহরতলিতে জৈব পদ্ধতিতে ছাদের বাগান (roof garden), এলাকা-ভিত্তিক কৃষি জলবায়ুতে বিভিন্ন ধরনের সবজি, ফুলচাষ খুবই লাভজনক। কন্টেনার বা টব বা গামলায় টমাটো, বেগুন, বিন, লংকা, ক্যাপসিকাম, লেটুস এবং অন্যান্য পাতাযুক্ত সবজি, মূলা, গাজর, হলুদ, লেবুঘাস, ধনে, মেন্থা, তুলসি, কারিপাতা ইত্যাদির ভাল চাষবাস সম্ভব হচ্ছে।

এছাড়া বিভিন্ন লতানো ফসল যেমন—বিভিন্ন জাতের কুমড়া, লাউ, শসা, বিন, কুঁদরী, পুই ইত্যাদি সবজির চাষ লাভজনক হচ্ছে। বিভিন্ন ফলের মধ্যে নারকেল, আম (আম্রপালি, মল্লিকা, আলফানসো), পেয়ারা, লেবু, কলা, পেঁপে, লিচু, স্ট্রবেরির লাভজনক চাষ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর এবং শহরতলিতে এই চাষ পদ্ধতি আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ ঘটাতে সক্ষম।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ১১ ❐ চুক্তি চাষ

গঠন

১১.১ ভূমিকা
১১.২ চুক্তিবদ্ধ চাষ

১১.১ ভূমিকা

কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থার উদারীকরণ, বিশ্বায়ন ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসার সম্প্রসারণের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি, বিপণন এবং সর্বোপরি খাদ্যে নিরাপত্তার প্রশ্নে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে যে, তারা বর্তমান বাজার অর্থনীতিতে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কৃষিভিত্তিক ব্যবসার সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে, কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগ করছে, যা স্থানীয় ভাবে শ্রমদিবস তৈরি করছে। প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মানোন্নয়নে সাহায্য করছে। এর এক অন্যতম বাস্তব উদাহরণ হল **চুক্তিবদ্ধ চাষ পদ্ধতি**। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে **বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোনভাবে দেশের কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে না। ব্যবসাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তার ফলে কৃষি উন্নয়নে এলাকাভিত্তিক বৈষম্য দেখা যায়।** তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে কৃষকরা পুরোপুরি ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

১১.২ চুক্তিবদ্ধ চাষ

চুক্তিবদ্ধ চাষ কী ?

- এটি হল কৃষক এবং প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা বা বিপণন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমঝোতা পত্র, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আগাম নির্ধারিত দামে সঠিক গুণমান সম্পন্ন কৃষিজাত দ্রব্যগুলি কৃষকদের থেকে ক্রয় করে বাজারজাত করা হয়।
- একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা যা কৃষি প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলোকে পরোক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণে সাহায্য করে, কোনরকম জমি বা কৃষি খামারের মালিকানা ছাড়াই।
- এই ব্যবস্থাপনা কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষক-এর সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে। এটি উভয়পক্ষের মধ্যে একটি ভদ্রজনোচিত চুক্তি।
- এই ব্যবস্থা চাহিদার উপর ভিত্তি করে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।

চুক্তিবদ্ধ চাষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

চুক্তিবদ্ধ চাষ প্রথা ১৮৯৫ সালে **তাইওয়ানে প্রথম শুরু** হয়। জাপান সরকার তাইওয়ানে এর প্রথম প্রয়োগ করে আখ চাষ করে চিনি উৎপাদন ক্ষেত্রে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানি সেন্ট্রাল আমেরিকাতে এই পদ্ধতিতে কলা উৎপাদন শুরু করে। ভারতবর্ষে উপনিবেশবাদের সময়ে বিভিন্ন অর্থকরী ফসল

যেমন চা, কফি, রবার, আফিম ও নীল প্রভৃতি চাষের জন্য এদেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই সমস্ত চাষে শাসককূল ক্ষমতার অপব্যবহার করে দরিদ্র কৃষকদের শোষণ করার ইতিহাস সবার প্রায় জানা। ১৯২০ সালে সমুদ্র উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে আই টি সি (ITC) ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ শুরু করে, যার মধ্যে চুক্তিবদ্ধ চাষের সমস্ত উপকরণ যুক্ত ছিল। এটি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

পরবর্তী সময়ে এই কোম্পানি নীলামে তামাক সংগ্রহ করতে শুরু করে। ষাটের দশকে বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদনে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে। বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা ব্যক্তিগত মালিকানায় জমি বা কৃষি খামারগুলির উপর মূলত নির্ভর করেছে। **দেশলাই শিল্পে অগ্রণী উইমকো** (WIMCO) কাঁচামালের নিয়মিত ও সুষ্ঠু জোগানের জন্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে পপলারের চাষ শুরু করে চুক্তিবদ্ধ চাষের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পপলার বিদেশ থেকে আমদানী করে চাষ করলে চাষীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং তারা উৎপাদিত ফসলে অনেক বেশি আয় করে। ১৯৯০ সালে পেপসিকো পাঞ্জাবে টম্যাটো চাষ শুরু করে। পরবর্তীতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে এই পদ্ধতিতে যুক্ত হয়। ম্যাক্সওয়ার্থ ফুটস অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে, ভিএসটি ন্যাচারাল প্রোডাক্টস লিমিটেড অন্ধ্রপ্রদেশে, ক্যাডব্যারি কর্ণাটকে বিভিন্ন ফসলে চুক্তিবদ্ধ চাষে যুক্ত হয়েছে। প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলি তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সুষ্ঠু জোগানের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষকে বেছে নিয়েছে।

নীচে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে চুক্তিবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ঃ

- **ইন্দোনেশিয়াতে** হাইব্রীড নারকেল
- **থাইল্যান্ডে** আনারস, অ্যাসপ্যারাগাস ও পাম তেল
- **ভারতে** টম্যাটো, আলু ও লঙ্কা
- **দক্ষিণ আফ্রিকা** ও **মরিশাসে** আম
- **মেক্সিকোতে** ফ্রোজেন সব্জি
- **জিম্বাবোয়েতে** তুলো।

ভারতে বেশ কিছু রাজ্যে নির্দিষ্ট কিছু ফসলের উপর চুক্তিবদ্ধ চাষ সফলতা লাভ করেছে, যেমন—

- পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানে **টম্যাটো**
- হরিয়ানাতে **মাশরুম**
- অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে **সূর্যমুখী**
- কর্ণাটকে **ঘেরকিন**
- তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে **ফল এবং সব্জি**।

এছাড়া বেবি কর্ন, লঙ্কা, রসুন, পেঁয়াজ, কয়েকটি বিশেষজাতের কলা, আম, আলু ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন এলাকায় চুক্তি প্রথায় সফলতার সঙ্গে চাষ করা হচ্ছে। কিছু স্থানীয় এবং বহুজাতিক প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা চুক্তিবদ্ধ চাষ পদ্ধতিতে যুক্ত।

চুক্তিবদ্ধ প্রথায় কাজ করার সময় কৃষকেরা ও সংস্থাগুলি বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়। নীচে আলোচনা করা হল উভয়ের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা।

কৃষকদের সুবিধা

(১) ক্ষুদ্র চাষীদের মূল সীমাবদ্ধতা হল স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হওয়া। যৌথ বা মিলিত

সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের সন্ধান দিয়ে এবং পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ দিয়ে চাষীদের এবং প্রক্রিয়াকরণে যুক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বেশি লাভ পৌঁছে দেয়।

(২) ক্ষুদ্র চাষীরা কম সুদে এবং সহজে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় না। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দেয় বা ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

(৩) নতুন প্রযুক্তি সহজেই পেয়ে যায়।

(৪) আর্থিকভাবে দুর্বল চাষীদের চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

(৫) বাজারে কৃষিজাত পণ্যের দাম প্রতিনিয়ত ওঠানামা করে। আগাম আলোচনা দ্বারা নির্ধারিত দাম পেলে বাজারে পণ্যের দাম কমে গেলেও চাষীদের ক্ষতি হয় না।

(৬) সাধারণত এ ধরনের পদ্ধতিতে অনেক শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়। ফলে চাষীরা পরিবারের অন্য সদস্যদের যুক্ত করতে পারেন।

কৃষকদের অসুবিধা

(১) সংস্থাগুলির চাহিদা অনুযায়ী প্রায়শ নতুন ধরনের ফসল চাষ করতে হয়। নতুন এলাকায় নতুন ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট ঝুঁকির হয়ে পড়ে। এই লোকসান বা ক্ষতির সম্ভাবনা ক্ষুদ্র চাষীদের কাছে বড় বোঝা হয়ে যায়। কারণ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মাঠ থেকে ফসল তুলতে না পারলে কোনও টাকা দেয় না।

(২) ফসলের বাজার মূল্য চুক্তিমূল্যের থেকে বেশি হলে চাষীদের ক্ষতিই হয়। কারণ, তারা চুক্তির বাইরে গিয়ে ফসল খোলা বাজারে বেশি মূল্যের লোভে বিক্রয় করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

(৩) অনেক সময় সংস্থার কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চাষীরা সার্বিক গুণমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করেও কর্মচারীদের কবলে পড়ে বিক্রয় করতে পারে না।

(৪) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীরা সুযোগ পায় না। বড় চাষীদের একসাথে বেশি জমি লাভজনক হয় বলে সংস্থাগুলো বড় চাষীদের সাথে চুক্তি করে।

ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির সুবিধা

(১) ব্যবসাভিত্তিক চাষবাসের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাষযোগ্য জমি পেতে ভূমি সংক্রান্ত আইন বাধা হতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র চাষীদের একত্রিত করে তাদের উর্বর জমিকে সুসংহত ও তুলনামূলক ভাবে সহজ উপায়ে ব্যবহার করা যায়।

(২) বিভিন্ন ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে গুণমান সম্পন্ন উৎপাদনের দায়িত্ব দিয়ে কৃষি খামার বা সংস্থাগুলি উৎপাদন এবং বাজারে সময় মতো সরবরাহের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে ফেলে।

(৩) দালালদের অনুপস্থিতি থেকে সংস্থাগুলো বেশি লাভ পেতে পারে।

ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির অসুবিধা ঃ

(১) কত বছরের জন্য এবং কী শর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষ করা হচ্ছে তা নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের এবং রাজ্যের কৃষি জমি সংক্রান্ত আইনের উপর। দীর্ঘ সময়ের চুক্তি সাধারণত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নাকচ হয়ে যায়।

(২) আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে স্থানীয় চাষীরা সহযোগিতা করতে চায় না।

(৩) চাষী ও সংস্থাগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং অব্যবস্থার ফলে চুক্তি অসফল প্রমাণিত হয় বা ভেঙে যায়।

(৪) যদি বাজার মূল্য চুক্তিমূল্যের থেকে বেশি হয়, চাষীরা চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে এসে কৃষি পণ্য বিক্রয় করে দিলে সংস্থাগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়।

(৫) চাষীরা সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা বা সার, কীটনাশক ইত্যাদি নিয়ে চুক্তিমতো নির্দিষ্ট ফসলে সম্পূর্ণ ব্যবহার না করে অন্য ফসলে প্রয়োগ করে, ফলে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হয়।

চুক্তিবদ্ধ চাষকে আরও সুসংহত এবং স্থিতিশীল করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করতে হবে ঃ

(১) আইনগত সুরক্ষা চাষীদের জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট করা উচিৎ, যেমন—

(ক) ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে আইনগত গঠনশৈলী নির্ধারণ,

(খ) দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত স্থানীয় চাষ পদ্ধতিগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখা,

(গ) অভিযোগ জানানোর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।

(২) চুক্তির শর্তগুলি নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর নির্ভর করবে—

- চুক্তির সময়কাল,
- ফসল বাজারজাত করা বা গুণগতমান পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত পদ্ধতি,
- প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান,
- বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ,
- আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ সুবিধা,
- পরিচালন পদ্ধতি,
- দাম নির্ধারণ পদ্ধতি,
- আগাম প্রদানের এবং ফলন বিক্রয়ের পর বাকি প্রাপ্য টাকা প্রদানের পদ্ধতি,
- ফসলের বীমাকরণ,
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্ষতির সম্মুখীন হলে তার খেসারত বা লোকসান এড়াবার ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।

(৩) চাষীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বিশেষ করে সমবায় গড়ে তোলা।

(৪) ফসলের উৎপাদন, সমস্যা এবং বহুজাতিক সংস্থার প্রয়োজনে চাষীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের নিয়মিতভাবে ব্যবস্থা করা।

(৫) রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বাজারজাত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, পরিকল্পিত চুক্তিবদ্ধ চাষ কৃষি উৎপাদন ও বিপণনের মধ্যে সংযোগ এবং উন্নতিবর্ধন করে। এর ফলে ক্ষুদ্র চাষীরা সুযোগ পায় নতুন বাজারের সন্ধান ও শ্রমসম্পদের সদ্ব্যবহারে।

বিশ্বায়নের যুগে কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি, ন্যায্য দামে বাজারীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কিন্তু কৃষি বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লিবিগস এগ্রোকেমের মত প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির উপযোগী জৈবিক এবং পরিবেশবান্ধব উপাচার সরবরাহ করে, কৃষকদের প্রযুক্তিজ্ঞানের উন্নয়ন করে, তাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে, যাতে তারা বর্তমান পরিস্থিতিতেও টিকে থাকতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে চুক্তি চাষ-এর সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। চুক্তি চাষ মূলত কৃষক ও বড় বড় প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থা বা বিপণন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে আগাম নির্ধারিত মূল্যে সঠিক

গুণমান সম্পন্ন কৃষিপণ্যগুলি কৃষকদের দিয়ে উৎপন্ন করিয়ে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। কৃষি খামারের মালিকানা ছাড়াই এরা পরোক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করছে। যেমন, **হাওড়া জেলার ধূলাগড়ে পেপসিকো চুক্তি চাষের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় আলু চাষ করাচ্ছে।**

এই চুক্তি চাষকে সুসংহত এবং স্থিতিশীল করতে হলে দরকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, অভিযোগ জানানোর প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ সরবরাহ, আর্থিক সহায়তা, ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি, ফসলের বীমাকরণ প্রভৃতি।

চুক্তি চাষের আর একটি সমস্যা হচ্ছে, স্থানীয় উপকরণ উৎপাদন সংস্থাগুলির এবং উপকরণ সরবরাহকারীদের স্বাধীনতা এবং সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ হয়। চুক্তিচাষে লিবিগস এ্যাগ্রোকেমের মত **জৈব উপচার উৎপাদনকারীদের সার্বিক সহায়তা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করলে কৃষকগণ আরও উপকৃত হবেন।** দরকার জৈবিক উপায়ে শস্যচাষ। তা নাহলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে মূল্যযুক্ত ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া যাবে না।

চুক্তি চাষে জৈব পদ্ধতিতে শস্য চাষ

জৈব চুক্তি চাষে ভারতে যেসব রাজ্য নির্দিষ্ট কিছু শস্য চাষে সফলতা লাভ করেছে, তা নিম্নরূপ—

- পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান : টম্যাটো, বেবি কর্ন, লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন।
- হরিয়ানা : মাশরুম বা ছত্রাক, পেঁয়াজ।
- অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটক : সূর্যমুখী, মেরিকন, আম, কলা।
- তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ : ফল ও সবজি।
- পশ্চিমবঙ্গ : আলু, আম, কলা।

জৈব উপায়ে চুক্তি চাষের সাফল্য পেতে কৃষকদের যথাযথ সুবিধাজনক ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ ধ্যান দিতে হবে।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ১২ ❐ নিবন্ধীকৃত সংস্থার দ্বারা জৈব চাষের গুণমান নিয়ন্ত্রণ

জৈব কৃষির মূল শর্তই হল আন্তর্জাতিক কোনও সংস্থার দ্বারা শংসাকরণ। যদিও আমাদের রাজ্যে এরকম স্বীকৃত সংস্থা নেই, তথাপি পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শংসাপত্রে প্রদত্ত গুণমান অনুযায়ী বিদেশে পণ্য রপ্তানি হবে। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের অধিক মূল্য পাবে। জৈব চাষি আরো বেশি করে জৈব চাষে উৎসাহিত হবে। এই ধরনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা আশু প্রয়োজন।

জৈব কৃষির প্রামাণ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ধারণ সংস্থাগুলি

জৈব চাষের গুণমান নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব সংস্থা আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আন্তর্জাতিক জৈব কৃষি সংস্থা (IFOAM), কোডেক্স এলিমেনটারিয়াস কমিশন (CODEX), ইউরোপীয় ইউনিয়ন রেগুলেশন (EU Regulation), ডিমেটার ইন্টারন্যাশনাল (Demeter International), জাপান এগ্রি স্ট্যান্ডার্ড (JAS), অ্যাপেডা (APEDA)। এবার এই সংস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যাক। IFOAM : International Federation on Organic Agricultural Movement ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হেড কোয়ার্টার্স জার্মানি। জৈব কৃষি সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয় সংস্থা ও ছাতা হিসাবে কাজ করে। এই সংস্থাই আন্তর্জাতিক স্তরে মানদন্ড নির্ণয় করে। ১৯৯২ সালে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে আন্তর্জাতিক শংসাপত্র প্রদান পরিষেবা (IOAS) চালু করেছে।

CODEX : খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোডেক্স এলিমেনটারিয়াস কমিশন, ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থাটি জৈব উৎপাদনের বেশ কিছু দিক নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

EU Regulation : কাউন্সিল রেগুলেশন নং ২০৯২/৯১ (জুন, ১৯৯১) এর মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নে জৈব মান নির্ধারণের জন্য মোটামুটি একটি সামগ্রিক নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। এই সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়নে জৈব মান নির্ধারণের জন্য দিক নির্দেশিকা দেয়।

Demeter International : ডিমেটার ইন্টারন্যাশনাল আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের ১৯টি আন্তর্জাতিক শংসাকরণ সংস্থার বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক। এই সংস্থা মূলত বায়োডাইনামিক উৎপাদনের দিক নির্দেশিকা দেয়।

JAS : Japan Agricultural Standards। জাপান কৃষি মানদন্ড মূলত জৈব উৎপাদনের একগুচ্ছ দিক নির্দেশিকা।

APEDA : Agricultural & Processed Food Expert Development Agency। মূলত ভারতের কৃষি ও প্রক্রিয়াকরণজাত খাদ্য রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা। এটি জৈব কৃষির প্রামাণ্য নির্ধারণে সাহায্য করে। কোডেক্সের নিয়ম মেনে চলে।

জৈব কৃষির মুখ্য চারটি স্তম্ভ ঃ

(১) জৈব মান (Organic standard)

(২) শংসাকরণ/নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (Certification/Regulatory Mechanism)

(৩) প্রযুক্তি প্যাকেজ (Technology Package)

(৪) বিপণন নেটওয়ার্ক (Market Network)

জৈব কৃষিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরীক্ষা ও শংসাকরণ

সাধারণভাবে নিয়মানুযায়ী জৈব কৃষিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট সংস্থা বা এজেন্সি। পরীক্ষা পদ্ধতিটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কোনও কৃষক তার খামারের উৎপন্ন দ্রব্যের পরীক্ষা করিয়ে শংসাপত্র পাওয়ার জন্য সার্টিফিকেশন এজেন্সির কাছে আবেদন করবেন। ওই এজেন্সি আবেদনকারী কৃষকদের জৈব খামারে ব্যবহৃত বীজ, জল, মাটি, জৈব পদার্থ প্রভৃতি উপকরণ পরীক্ষা করে দেখবে। পরীক্ষা করার পর কৃষককে কী কী করতে হবে তার পরামর্শ দেবে। এইভাবে ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তৃতীয় বছরে বা তারও পরে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলকে 'জৈব ফসল' হিসাবে শংসাপত্র দেবে। আমাদের দেশে বর্তমানে ১২ -১৮ টি সার্টিফিকেশন এজেন্সি আছে। তার মধ্যে আমাদের রাজ্যে কোনও এজেন্সি পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০ টি বেসরকারি সংস্থা সার্ভিস প্রোভাইডার হিসাবে কৃষকদের একত্রিত করে, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, শংসাপত্র পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য করার কাজ শুরু করেছে। এক একটি সংস্থা ১৫০০ জনের মতো কৃষককে নিয়ে দল তৈরি করে তিন বছরের মধ্যে শংসাপত্র দিতে সাহায্য করবে। তবে এই কৃষকদের সকলের জমি গায়ে গায়ে হতে হবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে হবে না।

শংসাপত্র পাওয়ার খরচ অনেক বেশি। হেক্টর প্রতি প্রায় ২০-২৫ হাজার টাকা লাগে। গ্রুপ সার্টিফিকেশন প্রত্যেকের নামে ভাগ হয়ে যাওয়ায় মাথা পিছু খরচ কম পড়ে। আমাদের দেশেই প্রথম গ্রুপ সার্টিফিকেশন চালু হয়। এই গ্রুপ সার্টিফিকেশন আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইজারল্যান্ডে স্বীকৃত হয়েছে।

জৈব শংসাকরণ সংস্থা দু'ধরনের হয়।

(১) ভারতীয় শংসাকরণ সংস্থা

(২) আন্তর্জাতিক শংসাকরণ সংস্থা

ভারতীয় শংসাকরণ সংস্থা (Indian Certification Agencies)

ভারত সরকার, ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড, নিউদিল্লির মাধ্যমে জৈব খাদ্য রপ্তানি করে যদি শংসিত এবং ভারতীয় অ্যাক্রিডেশন এজেন্সি দ্বারা অনুমোদিত হয়। এই ধরনের স্বীকৃত ভারতীয় শংসাকরণ সংস্থা হল—

Tamil Nadu Organic Certification Department—www.tnocd.org

Agricultural and Processed Food Products—www.apeda.com

Export Development Authority (APEDA)

Spice Board—www.indianspices.com

Coffee Board—www.indiacoffee.org

Tea Board—www.teaboard.gov.in

আন্তর্জাতিক শংসাকরণ সংস্থা (International Certification Agencies)

লাটিন আমেরিকা থেকে আমদানি করা জৈব খাদ্য শংসাকরণের গাইড লাইন মেনেই দেশে বিদেশে যায়। ইউনাইটেড স্টেটস এর অরগানিক ফুড প্রোডাকশন অ্যাক্ট, 1990 অনুযায়ী ইউ এস এ বাজারগুলি ভেরিফাই করে, যাতে আন্তর্জাতিক US National Organic Program (NOP) মানদন্ড মেনে চলা যায়।

আন্তর্জাতিক শংসাকরণ সংস্থা সরাসরি USDA কে স্বীকৃতির জন্য আবেদন করবে এবং জাতীয় স্তরে নিয়মের মতোই নিয়মকানুন মেনেই সবকিছু করা হবে। একবার শংসাকরণ ও অ্যাক্রিডেশন হলেই সার্টিফায়েড জৈব খাদ্য হিসাবে আমেরিকাতে রপ্তানি করা যাবে। যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা শংসাকরণের কাজ করে সেগুলি হল—

1. Argencert-আর্জেন্টিনাতে কাজ করে।

2. California Certified Organic Farmers (CCOF)—ক্যালিফোর্ণিয়াতে কাজ করে।

3. International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM)—বিশ্বের সমন্বয়কারী নেটওয়ার্ক।

4. The Ecological Farming Association—বাস্তুতান্ত্রিক কৃষিকে সাহায্য করে।

5. Organic Farming Research Foundation (OFRF)—জৈব খাদ্যের বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক সিদ্ধান্ত কাজ করে।

6. Organic Trade Association—কানাডা ও ইউএসএ-তে কাজ করে।

7. Community Alliance with Family Farmer

8. Institute for Marketecology (IMO)—এটি প্রথম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত সংস্থা।

9. SKAL--SKAL International নেদারল্যান্ডে কাজ করে।

10. ECOCERT INTERNATIONAL—ইউরোপ, জাপান, ইউনাইটেড স্টেটস-এ কাজ করে।

11. DEMETER—নিউজিল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের বায়োডাইনামিক শংসাকরণের সাথে যুক্ত।

জৈব শংসাকরণ হল একটি বিশেষ পদ্ধতির শংসাকরণ, যেখানে জৈব উৎপাদকদের জৈব খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষি সামগ্রী পরীক্ষা ও শংসাকরণ করা হয়। সাধারণত যে কোন খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াই শংসাকরণ করতে গেলে বীজ সরবরাহকারী, কৃষক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকারী, খুচরো ব্যবসায়ী এবং রেস্টুরেন্ট সবই পরীক্ষা করা উচিত।

দেশ থেকে দেশান্তরে এই পদ্ধতির পরিবর্তন কিছুটা থাকে। সাধারণত একটা সাধারণ মান-উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কীকরণ এবং জাহাজে করে নৌপরিবহনের সময় বজায় রাখতে হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করতে হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- প্রাণীজ খাদ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন রূপ মনুষ্য সিউয়েজ স্লাজ ফার্টিলাইজার ব্যবহার চলবে না।
- যে কোন ধরনের কৃত্রিম রাসায়নিক উপকরণ বর্জন, যেমন সার, কৃষিবিষ, অ্যান্টিবায়োটিক, খাদ্য অধিপূরক ইত্যাদি সহ জীন পরিবর্তিত জীব বিকিরণজনিত কৃত্রিম রশ্মি (Irradiatoin) এবং সিউয়েজ স্লাজ।
- বহু বছর ধরে যে সমস্ত জমি (৩ বছর বা তার বেশি) কৃত্রিম রাসায়নিক যুক্ত সেই সব জমি ব্যবহার না করা।
- উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিস্তৃত ও লিখিত রেকর্ড রাখা বা অডিট করা হয়।
- জৈব উৎপাদন ও অজৈব উৎপাদনের মধ্যে পৃথক ব্যবস্থাপনা।
- মাঠে মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ।

কোনও কোনও দেশে সরকার শংসাকরণ পদ্ধতি দেখভাল করে এবং বাণিজ্যিকভাবে শংসাকরণ আইনানুগ বিধিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। শংসিত জৈব উৎপাদকেরা অজৈব উৎপাদকের মতোই কৃষির খাদ্য নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলবে।

জৈব কৃষি আন্দোলনের প্রথম পর্বে এই সব নিয়ন্ত্রণের দরকার না থাকলেও বর্তমানে গুণমান বজায় রাখতে এবং জালিয়াতি রুখতে বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই এই পরীক্ষা ও শংসাকরণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

একটি জৈব খামার শংসাকরণ করাতে গেলে সাধারণ চাষ পদ্ধতির সাথে কৃষককে অবশ্যই কতগুলি নতুন কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এগুলি যথাক্রমে ঃ

(১) জৈব মান সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে কী কী করা উচিত ও কী কী করা উচিত নয়। বিশেষ করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, সংরক্ষণে, পরিবহনে এবং বাজারজাতকরনে (বিক্রির জন্য) কী করা উচিত।

(২) **উৎপাদন পদ্ধতি মেনে চলা।** খামারে চাষের সুবিধা ও পদ্ধতি অবশ্য জৈব মান বজায় রেখে করতে হবে। উৎস ও সরবরাহকারী পরিবর্তনেরও দরকার।

(৩) **নথিভুক্তি** করা দরকার। খামারের ইতিহাস, বর্তমানে পরিকাঠামো, জল ও মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট নথিভুক্ত করা দরকার।

(৪) **পরিকল্পনা** করা জরুরি। বার্ষিক পরিকল্পনা রাখতে হবে বীজ থেকে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত সমস্ত কর্মপদ্ধতির যেখানে থাকবে বীজের উৎস, মাঠে শস্যের অবস্থান, সার প্রয়োগ পদ্ধতি, কৃষি শত্রু নিয়ন্ত্রণের কর্মপদ্ধতি, ফসল চয়ন পদ্ধতি, সংরক্ষণ স্থান ইত্যাদি।

(৫) **পর্যবেক্ষণ** জরুরি। বার্ষিক মাঠ পর্যবেক্ষণ করা দরকার। বাস্তবে মাঠে গিয়ে সমস্ত রেকর্ড, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তুলে আনতে হবে।

(৬) **ফি নির্দিষ্ট হারে দিতে হবে।** সাইজ এবং এজেন্সির উপর নির্ভর করে আমেরিকা ও কানাডাতে $400–$2,000 ফি প্রতিবছরে লাগে।

(৭) **তথ্য সংগ্রহ করে রেকর্ড রাখা** অত্যন্ত জরুরি। লিখিত দৈনন্দিন উৎপাদন এবং বিপণন রেকর্ড অবশ্যই দরকার। এই রেকর্ড পর্যবেক্ষণ কালে পরিদর্শককে দেখাতে হবে।

এছাড়া হঠাৎ করে বা অল্প কয়েক দিনের নোটিশেই মাঠ পর্যবেক্ষণ করা যায়। নির্দিষ্ট পরীক্ষা (মাটি, জল, কলা ইত্যাদি)ও করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমবারে শংসাকরণের ক্ষেত্রে Transition phase-এ (৩ বছর বা তারও বেশি) মাটি পরীক্ষা করা উচিত। মাটিতে কোনও রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি আছে কিনা তার পর্যবেক্ষণ অবশ্যই করতে হবে। এই স্টেজে উৎপাদিত খাদ্য পুরোপুরি জৈব খাদ্য নয়।

কোনও অপারেশন শংসাকরণের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মূল লক্ষ্য হবে উপকরণের মান এবং প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য অবস্থার উপর। পরিবহন সংস্থার গাড়ি, পাত্র সংরক্ষণ সুবিধা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ দরকার। একটা রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রেও এই পর্যবেক্ষণ এবং সরবরাহকারীদের চেকিং দরকার।

ভারতে জৈবখাদ্যের উৎপাদন ও বাণিজ্যের অগ্রগতির নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (Regulatory Mechanism for the Formation and Production of Trade in India)

জৈব কৃষি উৎপাদক ও শংসাকরণ এবং পর্যবেক্ষণ সংস্থার যে সব ধাপ অনুসরণ করা উচিত, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল। এই পদ্ধতি অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত ,যাতে ক্রেতা বিপদগ্রস্থ না হয়, আবার উপযুক্ত জৈব কৃষক কোনও সমস্যায় না পড়েন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধাপগুলি অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত ঃ

(১) **জৈব কৃষক দল গঠন (Formation of organic farmer's group) :** একই ধরনের কৃষক, যাঁরা একই পদ্ধতিতে একই সাথে পাশাপাশি চাষবাস করেন, তাদের সহমতের ভিত্তিতে কৃষক দল গঠন করা দরকার। স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই নির্ভর করবে কতজন চাষী একটি দলে থাকতে পারবেন। এই কৃষক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীই পর্যবেক্ষণ, শংসাকরণ, মনিটরিং এবং সুপারভিশনের কাজ দেখভাল করবে।

(২) **জেলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কৃষক দলের নিবন্ধীকরণ (Registration of farmers' group with district authorities) :** রাজ্য সরকার নির্ধারিত জেলা কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত কৃষক দলের নথিভুক্তি করাবেন। এই বিভাগ অবশ্যই কৃষি বা উদ্যানপালন বিভাগের হতে পারে। নিবন্ধীকরণের জন্য অবশ্যই কৃষক দপ্তরে জানাবেন এবং দপ্তর সাথে সাথে কৃষকদের আবেদন প্রাপ্তি স্বীকার করবেন। এটাই নিবন্ধীকরণের কাজ করবে।

এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারই একটি প্রোফরমা তৈরি করে দেবে, কৃষক দল যার মাধ্যমে আবেদন জমা করবেন। এই প্রোফর্মাতে সদস্যদের নাম, প্লট নম্বর, জমির পরিমাণ, শস্যের নাম ইত্যাদি তথ্য থাকবে। যে সমস্ত আবেদন জমা পড়বে এবং প্রাপ্তি স্বীকার করা হবে, তা মাঝে মাঝে ভারত সরকারের কৃষি ও সমবায় দপ্তরকে জানাতে হবে।

(৩) **ফার্ম বা কৃষকের রেকর্ড নথিভুক্তকরণ (Documentation of individual farms/farmers' records) :** নথিভূক্তকরণ যেহেতু জৈব উৎপাদনের অন্যতম দরকারি কাজ, তাই এই সমস্ত তথ্য অবশ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। শংসাকরণ সংস্থার দেওয়া তথ্য বা নথিপত্র ও ব্যক্তিগত কৃষক ও সমষ্টিগত কৃষক দলকে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে এই সব প্রশিক্ষিত কৃষকদলকেও নথিপত্র রাখার দায়িত্ব অন্যদের শেখানোর কাজে লাগানো যায়, যাতে শংসাকরণ সংস্থার অনুমোদন মেলে। যদি এরূপ কোন কৃষক বা দল না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারি সংস্থা (Service Providers) কে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

(৪) **পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা (Service Providers) :** রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব উদ্যোগেই পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাকে নথিভূক্ত করবে। এগুলি হতে পারে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র (KVKS), রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (SAUS), এগ্রিক্লিনিক, কৃষক দল, আত্মা (ATMA), বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (NAOS), বেসরকারী সংস্থা (Private Entrepreneurs), কেন্দ্রীয় সংস্থা (Central Agencies) ইত্যাদি। ক্ষমতা ও সংস্থার দক্ষতা অনুযায়ী রাজ্য সরকার বিভিন্ন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার নির্বাচন করবে। এটা শুরু করার জন্য SAUS, KVKS, Agri-clinics, ATMA, Central Agencies, NAOS-যারা জৈব উৎপাদনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, তাদেরই পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে নিয়োগ করা হবে। এইসব পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা নথিভূক্তকরণ, উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দৈনন্দিন কৃষিকাজ কৃষকদের দিয়ে করাবে। যেহেতু, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি স্থানীয় সংস্থা, চাষবাসের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল এবং জৈব উপকরণ, প্রযুক্তি ও পরামর্শ কোথায় পাওয়া যাবে খুব ভালই জানবে। ফলে, তারাই কৃষক ও কৃষকদলের সত্যিকারের বন্ধু হিসাবে কাজ করতে পারবে। এইসব পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকার একটা নির্দিষ্ট ফি ঠিক করে দিতে পারে। কোনও কোনও জায়গায় এইসব সার্ভিস প্রোভাইডাররাই উপকরণ সরবরাহকারী হিসাবে কাজ করে তাদের বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য। যাহোক, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা কখনই শংসাকরণ সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে না।

(৫) **শংসাকরণ এবং পর্যবেক্ষণ সংস্থা (Certification and Inspection Agencies) :** যেহেতু উৎপাদন প্রক্রিয়াটিই জৈব কৃষির জন্য শংসিত হয়, উৎপাদন নয়—তাই শংসাকরণ সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শংসাকরণ সংস্থা অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং বেসরকারী সংস্থা হবে। এই সংস্থার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন একটি স্বশাসিত নিবন্ধীকৃত সংস্থার দ্বারা অবশ্যই করা উচিত।

চুক্তিভিত্তিক সার্টিফিকেশন এজেন্সিগুলি তাদের এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। জাতীয় স্তরে জৈব কৃষি মান নির্ধারণের দায় অবশ্যই শংসাকরণ সংস্থার থাকবে। নির্ধারিত জমি অবশ্যই কৃষক ও কৃষকদলের ঠিকঠাক রাখতে হবে। মাঠ বা খামার পরিদর্শনের পর কতদিন ট্রাঞ্জিশনের জন্য লাগবে তাও শংসাকরণ সংস্থা অন্যান্য পরামর্শের সাথে পরিষ্কার বলে দেবে। তারাই প্রয়োজনীয় শংসাপত্র কৃষক বা কৃষকদলকে দেবেন।

রাজ্য সরকার মনে করলে প্রয়োজনীয় শংসাকরণ সংস্থা গঠন করতে পারেন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই। বাণিজ্য মন্ত্রক থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। ভারতে APEDA এই দায়িত্ব পালন করে। শংসাককরণ সংস্থা সমস্ত নিয়ম মেনে অ্যাক্রিডেশন সংস্থাকে জানাবে। এই সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংস্থা শংসাকরণ সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

(৬) **জৈব খামারের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ (Periodic Inspection of Organic farms) :** শংসাকরণ সংস্থা নিজেই কৃষকদের সমস্ত রেকর্ড পরীক্ষা করবে বা তাদের এজেন্ট নিয়োগ করে জৈব মানের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চালাবে। শংসাকরণ সংস্থা মনে করলে মাটি, জল, জৈব উপকরণ, কীটনাশক ইত্যাদি নিজস্ব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করবে, কিংবা স্বীকৃত রসায়নাগারে পরীক্ষা করবে, যাতে 'ট্রাঞ্জিশন পিরিয়ড' এবং 'জাতীয় জৈব কৃষির মানদন্ড' ইত্যাদি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে।

(৭) **জাতীয় স্তরে কৃষির জৈব মান (National Standards of Organic Farming) :** বাণিজ্যমন্ত্রক NPOP (National Programme for Organic Production) কর্মসূচিতে জাতীয় স্তরে জৈব উৎপাদনের মান নির্ধারণ করে থাকে। এই মানদন্ড মোট ৬টি বিষয় নির্ভর। এগুলি হল ঃ

(ক) Conversion : পরিবর্তনের সময়,

(খ) Crop Production : শস্য উৎপাদন,

(গ) Animal Husbandry : পশুপালন,

(ঘ) Food Processing and Handling : খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহন

(ঙ) Labelling (লেবেলিং) : লেবেল লাগান,

(চ) Storage & Transport : সংরক্ষণ ও পরিবহন।

ভারতীয় জৈব কৃষি প্রকল্পের অধীন নথিভুক্ত শংসাকরণ সংস্থাসমূহ

1. IMO Control Pvt. Ltd., no. 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th G Main, H.A.L., 2nd stage, Bengaluru - 560008.
2. Indian Organic Certification Agency (INDOCERT), The Humngham, PO. Aluva, Pin-683105, Cochin, Kerala.
3. Burcau Veritas Certification India Pvt. Ltd., Marwah Centre, 6th Floor, Krishnlal Marwah Marg, Andheri (East), Mumbai-400072.
4. ECOERT SA., Sector-3, S-6/3&4, Gut no. 102, Hindustan Awas Ltd., Warmi-Waluj Road, Nakshatrawadi, Aurangabad-431.
5. National Organic Certification Agency (NOCA), Chhatrapati House, Ground Floor, Near P.N. Gadgil Showroom, Pune-411038, Maharashtra.
6. Lacon Quality Certification Pvt. Ltd., Chenathra, Thiruvalla-689101, Kerala.
7. SGS India Pvt. Ltd., 250 Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon-122015, Haryana.
8. One Cent Asia Agri Certification Pvt. Ltd., Plot No. 8, Pratap Nagar Colony, Tank Road, Jaipur-302017, Rajasthan.
9. Bio-Inspetra, C/o Indian Organic Certification Agency, Thottumugham, Aluva-683105, Cochin, Kerala.
10. International Resourcs for Fair Trade, Soha Udyog, Unit-7, Parsi Panchayat Road, Andheri (East), Mumbai-69.
11. Indian Society for Certification of Organic Products, Rasi Building, 162/163 Pannairaja - Puram, Coimbatore, Tamilnadu-641001.
12. APOF Organic Certification Agency (AOCA), #3, 1st Floor, 9th Cross, 5th Min, Janyamahal Extn., Bengaluru-560046.
13. Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA), 12/11 Vasant Vihar, Dehradun-248006, Uttarakhand.

14. Control Unian Certification, "Summar Ville" 8th Floor, 33rd-14th Road, Junction of Linking Road, Khar (West), Mumbai-400052, Maharashtra.
15. Rajasthan Organic Certification Agency, Jaypur, Rajasthan.
16. Food Certification Agency, Hyderabad.
17. Vedic Organic Certification Agency, Hyderabad.
18. Adcti Certification Pvt. Ltd., Bengaluru, Karnataka.

পশ্চিমবঙ্গে পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলির তালিকা

Sl.	**Name of Service Provider**	**Area of Operation**
1.	SEVA (Society for Equitable Voluntary Action) Atghora VIKAS Kendra.	North 24 Parganas
2.	Karunamoyee Agri Clinic & Service Centre, Amdanga.	North 24 Parganas
3.	Mother Agro-India Clinic Agri-Business Centre, Nachinda.	Purba Midnapur
4.	West Bengal Citizen Forum, Kolkata	South 24 Parganas
5.	Dipan Jubagosti, Khandagosh, Burdwan	Burdwan
6.	Sarada Group of Development Initiative, Jhilimili, Bankura	Bankura & Purulia
7.	Jalpaiguri Vivekananda Education Society Sevak Road, Siliguri.	Jalpaiguri
8.	Tufanganj Farmars Welfare Society. Ward No. 8 Tufanganj.	Coochbehar
9.	Agriculture Management & Rural Institute of Technology, Station Road, Malda.	Malda
10.	Pradan, Jogesh Palli, Bankura.	Bankura & Purulia

জৈব কৃষির উপকরণ সরবরাহকারী সংস্থা

১। **বায়োটেক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড**
দত্ত হাউস, দ্বিতীয় তল, ৯৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১২
ফোন ঃ ২২২৫-২৪১৬/৪৪৭৫
biotech@cal12.vsnl.net.in

২। **টোটাল এগ্রি-কেয়ার কনসার্ন প্রাঃ লিঃ**
১২/৩ এন. এস. রোড, কলকাতা-১
ফোন ঃ ২২২০-৪৫৮৩/২২২০-৪৯৪৮

৩। **কৃষি ভারতী**
৩৫৩ ভারত হাউজিং, শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।
ফোন ঃ (০৩৩) ৩২৯৯-২৮২৫, ৯৪৩৩০৬৪৪০৯, ৯৪৩৩১০৪৭১৭
Krishibharati @gmail.com

৪। **আস্থা বায়োটেক প্রাঃ লিঃ**
১৭৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ, কোলকাতা-১৩৭
ফোন ঃ ৯৮৩০০৩২৪৯৮, ৯৮৩১৮৪০০১৬

৫। **মেসার্স আর. এম. এন্টারপ্রাইজ**
প্রান্তিক, বারাসাত, পোঃ হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা।
ফোন ঃ ৫৫২-৪৬৮৬

৬। **বায়োকন্ট্রোল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ**
পো. ব. নং-৩২২৮
৪৭৯, ডমক্রম, এইচ এম টি লে-আউট,
আর টি নগর, বেঙ্গালুরু
(পেষ্ট কন্ট্রোল (ইন্ডিয়া) লি. এর একটি সংস্থা)
ফোন ঃ ৩৩৩-০১৬৮/৩৪৩-২৮১৫

৭। লিবিগস্ অ্যাগ্রোকেম প্রাঃ লি.
মাকড়দহ, হাওড়া।

পত্র ঃ ২ | একক ঃ ১৩ ❐ বিভিন্ন জৈবসার প্রয়োগে উদ্যানজাত ফসলের চাষবাস

বায়ো হর্টিকালচার ঃ এখন ভারত তথা সারা বিশ্বে জৈব চাষবাস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা তথা পরিকল্পনা বাস্তবে শুরু হয়েছে। তাই আজ মাঠে ফসল চাষের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উদ্যানজাত ফসলের জৈব চাষে সচেতনতা বাড়ছে। এখন '**বায়ো হর্টিকালচার**' বা '**জৈব উদ্যান পালন**' সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে।

ভারতে প্রথম সবুজ বিপ্লবের সময়কাল হচ্ছে ১৯৬৭-১৯৭৮ সাল। এসময় সেচ এলাকায় ধান, গমের চাষে উচ্চফলনশীল জাতের সঙ্গে উচ্চহারে রাসায়নিক সার এবং পেস্টিসাইড ব্যবহার করে ফলন বেড়েছিল। কিন্তু তারপর যথেচ্ছ পরিমাণে রাসায়নিক বা অজৈব সার, পেস্টিসাইডস, আগাছানাশক এবং অন্যান্য কৃষি-রসায়ন দ্রব্যাদি অপরিমিত ব্যবহারে 'হাইটেক' প্রযুক্তি সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে। কৃষিতে উৎপাদন কমেছে, এসেছে বিশাল এক অবসন্নতা।

এখন তাই 'পরিবেশ বান্ধব' পদ্ধতিতে এসেছে সুসংহত কীটপোকা দমন ব্যবস্থাপনা (IPM বা Integrated Pest Management), সুসংহত শস্যচাষ ব্যবস্থাপনা (ICM বা Integrated Crop Management), বিভিন্ন জৈব সার, জীবাণুসার, কেঁচোসার, জৈব পেস্টিসাইডস এবং বিভিন্ন প্রকার জৈব উৎস, সার থেকে কম্পোষ্ট, হাড়গুঁড়া, ফিস মিল বা মাছের গুঁড়ো, পোল্ট্রি লিটার/সার ইত্যাদি। এদের ব্যবহারে উচ্চ গুণমানের রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য থেকে অনেক বেশি লাভ সম্ভব এবং মাটির স্বাস্থ্য ও কৃষি পরিবেশের উন্নতির সম্ভাবনা বেশি।

- **জৈব/প্রাকৃতিক উদ্যান পালন**

জৈব বা প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্যানজাত ফসলের চাষবাস হচ্ছে সত্যিকারের পরিবেশ বান্ধব চাষবাস, যার ফলে এসব ফসলের চাষবাসে একটা স্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ ব্যবহার করে।

এক কথায়, জৈব বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য তথা দূষণমুক্ত পরিবেশ পদ্ধতির মধ্যে উদ্যানজাত ফসলের জৈব এবং সম্প্রসারণ জরুরি। বহুমূল্য রাসায়নিক সার, পেস্টিসাইড এবং অন্যান্য কৃষি রসায়ন ব্যবহার না করে কম খরচে উদ্যান পালনকে লাভজনক করা সম্ভব। এখন সামান্য চাষ দিয়ে বিভিন্ন জৈবসার, জীবাণুসার, প্রাণীজ সার, ইত্যাদি ব্যবহারে এবং যে কোনও উদ্যানজাত ফসলের মাঝের ফাঁকা জমিতে শিম্বিগোত্রীয় ফসলের নিয়মিত চাষ করে মাটির উর্বরতা ঠিক রেখে লাভজনক ফলন পাওয়া সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, জৈব চাষবাসে বিষ মুক্ত উচ্চগুণমানযুক্ত উদ্যানজাত ফসলের (সবজি, ফল, ফুল, বাগিচা ফসল, মশলা, ভেষজ উদ্ভিদ এবং সুগন্ধি গাছগাছড়া, মাশরুম ইত্যাদির) বেশি উৎপাদন বছরের পর বছর ধরে ফলানো সম্ভব।

- **বায়োফুড বা জৈবখাদ্য ঃ** এখন দিন দিন জৈব খাদ্যের চাহিদা সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান। এদের বাজার দামও খুব বেশি। রাসায়নিক চাষের কৃষিপণ্য থেকে বেশি প্রায় ২-৩ গুণ। জৈবসারের চক্রাকারে ব্যবহারে, বিভিন্ন জীবপ্রযুক্তির সাফল্যে এবং শুঁটি জাতীয় ফসলের সাথিফসল চাষে মাটির স্বাস্থ্য বজায় রেখে সুস্থির কৃষি উন্নয়নের পথে যেতে হবে। জৈব চাষবাসে বিভিন্ন জৈবসারের সঙ্গে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী অণুজীবি, রাইজোবিয়াম, অ্যাজাটোব্যাক্টর, অ্যাজোস্পিরিলাম এবং ফসফেট দ্রবণকারি ব্যাকটেরিয়া, সিউডোমোনাস ও ব্যাসিলাস, ছত্রাক,

পেনিসিলিয়াম এবং অ্যাসপারজিলাস ইত্যাদির ব্যবহার করে যা উদ্যানজাত ফসলের ক্ষেত্রে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করলে পরিবেশের উন্নতির সাথে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।

- **উদ্যানজাত ফসলে জৈবচাষের প্রয়োজনীয়তা**

উদ্যানজাত ফসল হচ্ছে ফল, সবজি, কন্দ ফসল (আলু, ক্যাসাভা, মিষ্টিআলু, খামালু, কচু, ট্যাপিওকা ইত্যাদি) ফুল, বাগিচা ফসল (চা, কফি, রবার, পান, ইত্যাদি), মশলাজাতীয় ফসল, ভেষজ এবং সুগন্ধি গাছগাছড়া ইত্যাদি। কৃষিতে এ সমস্ত ফসলের একটা বিশাল ভূমিকা এবং আর্থিক লাভ তথা জাতীয় আয়ের মধ্যে গুঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের দেশের বৈচিত্র্যময় কৃষি-জলবায়ুতে উর্বর জমি তথা প্রাকৃতিক উৎসগুলির প্রাচুর্যে সমস্ত প্রকার উদ্যানজাত ফসলের উন্নত চাষ সম্ভব। নাতিশীতোষ্ণ এবং গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতে ভারত ফল, সবজি, ফুল ইত্যাদি চাষে চিনের পরেই সম্ভবত প্রধান দেশ। কিন্তু সঠিক ফলনে আমরা এখনও অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি।

ভারতে বর্তমানে মাত্র ৭ শতাংশ (প্রায় ১১ মিলিয়ন হেক্টর) জমিতে এই সব উদ্যানজাত ফসলের চাষ হয়। ভারত সারা বিশ্বে ফল চাষে চিনের পর দ্বিতীয় স্থানে। মোট উৎপাদন ৪৩ মিলিয়ন টন। সবজি চাষেও আমরা দ্বিতীয় স্থানে, প্রায় ৭৩ মিলিয়ন টন উৎপাদন, যা বিশ্বের মোট সবজি উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশের বেশি।

ভারতে মূল এবং কন্দজাতীয় ফসলের উৎপাদন ২০ মিলিয়ন টন এবং ১৩৭ মিলিয়ন টন। মানুষের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য, দানাজাতীয় শস্য এবং শিম্বিজাতীয় দানাশস্যের ফসল তৃতীয় স্থানে।

কন্দজাতীয় ফসলকে বলা হয় সূর্যশক্তি থেকে আহৃত সব চাইতে দক্ষ ফসল। এইসব ফসল থেকে খুবই সস্তায় শক্তি আহৃত ফসলের জোগান মেলে, যা গরীব মানুষের খাদ্য জোগানে সাহায্য করে।

ক্যাসাভা থেকে ২৫০× ১০৩ কিলো ক্যালোরি প্রতি হেক্টরে পাওয়া যায়। মিষ্টি আলু থেকে পাওয়া যায় ২৪০× ১০৩ কিলো ক্যালরি/হেক্টার শক্তিযুক্ত খাদ্য। সে তুলনায় ধান বা চাল থেকে ১৭৬ × ১০৩ কিলো ক্যালোরি প্রতি হেক্টর, গম থেকে ১১০ × ১০৩ কিলো ক্যালরি/হেক্টর এবং ভুট্টা থেকে পাওয়া যায় ২০০× ১০৩ কিলো ক্যালোরি/হেক্টর।

কন্দ শস্য এবং মূল্যযুক্ত এসব ফসলের সঠিক উৎপাদন তথা উৎপাদনশীলতা বাড়াবার সুযোগ অনেক। গবেষণা এবং উন্নয়ন বিভাগ জানাচ্ছে, সমস্ত উদ্যানজাত ফসলের জৈব চাষবাসের মাধ্যমে প্রভূত উৎপাদন হার বাড়িয়ে প্রতিটি মানুষের পুষ্টি এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি সম্ভব।

জাতীয় পুষ্টি সংস্থার মতে আমাদের ২৮০ গ্রাম সবজি/জনপ্রতি/প্রতিদিন খাওয়া প্রয়োজন। আমরা সে তুলনায় মাত্র ১৩০ গ্রাম সবজি পাচ্ছি। তাই উৎপাদন আরো বাড়িয়ে স্থিতিশীল পথে এগোতে হবে। এই পথে এগোতে হলে আমাদের যেতে হবে জৈব চাষবাসের দিকে।

এজন্য আমাদের খরাপ্রবণ, বিস্তীর্ণ শুখা এলাকায় এসব উদ্যানজাত সমস্ত ফসলের জৈব চাষ প্রযুক্তিকে সম্প্রসারণ করতে হবে। জৈব চাষের ফলে এসব জৈব খাদ্যের **প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির** সম্প্রসারণ করে রপ্তানি বাণিজ্যে আরো আয় বাড়ানো সম্ভব।

বিভিন্ন ফলচাষ এবং উৎপাদন

- **আম ঃ** ভারতে আম '**ফলের রাজা**' এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ফসল। শুখা এবং খরাপ্রবণ বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় প্রান্তিক জমিতেও ভালভাবে চাষ সম্ভব হচ্ছে। দেশ-বিদেশে ভারতীয় আমের কদর, চাহিদা এবং রপ্তানি বাণিজ্য খুব ভাল। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে এবং পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল হিসাবে সর্বত্র চাহিদা বেশি। ভারতে ২০০৮-০৯ সালে ২৩০৯ হাজার হেক্টর জমিতে ১২,৭৫০ হাজার টন উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদন হার ১২ টন/হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গে আমের এলাকা এবং উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

● **পেয়ারা** ঃ একে **গরীবের আপেল** বলে। এটি খুবই পুষ্টিকর, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি রয়েছে পেয়ারাতে। এছাড়া অনেক উপকারী ওষধি পদার্থ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস থাকার ফলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ উপকারী। ভারতে ২০৪ হাজার হেক্টর জমিতে পেয়ারার চাষ করে ২২৭০ হাজার টন ফলন হয় (২০০৮-০৯)। উৎপাদন হার ৬ টন প্রতি হেক্টর।

● **কলা** ঃ ভারতে মোট ফল উৎপাদনের ১৯ শতাংশ উৎপাদন কলা থেকে আসে।৭.৪৮ লাখ হেক্টর জমিতে কলা চাষ করে ২৬.৯৯ মিলিয়ন টন উৎপাদন হয়। বার্ষিক উৎপাদন হার ৩৫.৯ টন/হেক্টর। মহারাষ্ট্র (৬২.০৩ টন/হে), গুজরাট (৫৪.৭৩ টন/হে.) ও তামিলনাড়ুতে (৫৩.৬ টন/হে.) কলার উৎপাদন হার সব চাইতে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ৪১ হাজার হেক্টর জমিতে কলা চাষ করে ৯৮২.২ হাজার টন কলা উৎপন্ন হয় (২০০৯-১০)।

● **নারকেল** ঃ ২০০৮-০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী সারা ভারতে ১৮৯৪.৫৭ হাজার হেক্টরে উৎপাদন হয়েছিল ১৫৭২৯.৭৫ মিলিয়ন নারকেল (সংখ্যায়) এবং উৎপাদন হার ৮৩০৩ নারকেল/হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গে ২৮.৬০ হাজার হেক্টর জমিতে নারকেল চাষ করে ৩৫৫.৫০ মিলিয়ন নারকেল উৎপাদন হয় এবং উৎপাদন হার ১২,৪৩০ নারকেল/হেক্টর। কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ৯০ শতাংশ উৎপাদন হয়। নারকেল চাষে কেরালা ভারতে প্রথম (এলাকা ৫৩.৭৬ শতাংশ, উৎপাদন ৪৫ শতাংশ), তারপর তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। নারকেলকে বলা হয় 'কল্পবৃক্ষ'। নারকেল সেকটর থেকে দেশে বছরে আয় ৮০০০ কোটি টাকা এবং বিদেশিমুদ্রা আসে ৬৫০ কোটি টাকা। এর থেকে ১৫.২ শতাংশ তেল উৎপন্ন হয়।

● **কাজুবাদাম** ঃ সারা ভারতে ৮৯৩ হাজার হেক্টর জমিতে কাজুবাদামের চাষ করে ৬৯৫ হাজার টন কাজু উৎপাদন হয় এবং উৎপাদন হার ০.৯০ টন/হেক্টর (২০০৮-০৯)। পশ্চিমবঙ্গে ১১হাজার হেক্টর জমিতে ১১ হাজার টন কাজুর উৎপাদন হয় ও উৎপাদন হার ১ টন/হেক্টর। এটি ভারতের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী বাগিচা ফসল। অনুর্বর ও প্রান্তিক জমিতে সাধারণত কাজুর চাষ হয়। তাই ফলন হার খুবই কম। পর্তুগীজরা ভারতে ১৬ শতাব্দীতে মাটি সংরক্ষণ, পতিত জমি উন্নয়ন এবং বনায়নের জন্য কাজুর চাষ প্রবর্তন করে। সুসম সার প্রয়োগ এবং উন্নত জাত ও চাষপ্রযুক্তি দ্বারা কাজুর উৎপাদন ৩-৪ গুণ বাড়ানো সম্ভব।

সারা দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে ফল, সবজি এবং মশলার উৎপাদন হার, এলাকা ও উৎপাদন

ফসল	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ	
	উৎপাদন হার (টন/হেক্টর)	এলাকা (হাজার হেক্টর)	উৎপাদন (1000 টন)
(ক) **ফল** :			
লিচু	৪০	৮.০৫০	৭৪.৯৪৫
কাঁঠাল	১৫	১০.৮৮৯	১৬০.১০০
কলা	৪০	২৭.৬৮৭	৫৪৪.৮৭৩
নারকেল	৪০	২৮৬৪৪ হেক্টর টন	৩৫৫৫.৩১৯
লেবুজাতীয় ফল	৩০	১০.০২৮	৮৭.০৭৩
আম	১০	৭০.০৯৩	৫১৩.৩৩৯
পেঁপে	৫০	৯.৫৫১	২৬৩.৬৫৫
আনারস	৫০	১৩.৩৭৬	৩৭৯.১৫৮
পেয়ারা	৫০	৯.৮৮৫	১৫২.৯৯৪
মোট ফল	—	১৭৪.০০৬	২৩০১.৭০৩

(খ)**সবজি :**			
বেগুন	৬০	১৫২.৯০০ (বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন)	২৭৫৭.৪৪১ (তিন মরসুম)
বাঁধাকপি	৭৫	৭৪.৭১৪	১৯৮২.৬৭৪
ফুলকপি	৪০	৬৫.৬৪৩	১৬৬৬.১৫০
ট্যাঁড়স/ভিন্ডি	২৫	৬৫.৭৭০ (বর্ষা, গ্রীষ্ম,শীত)	৭১৮.৯৩৭ (তিন মরশুম)
পেঁয়াজ	৩৫	১৭.৫০৯	২২১.৬৬৭
মূলা	১২	৩৫.৭৬৪ (গ্রীষ্ম, শীত)	১৯২.২৭২ (গ্রীষ্ম, শীত)
টম্যাটো	৭৫	৪৯.৯৫৯	৮৫৭.১৮২
কচু	১৫	১৫.২৭৮	২২৩.০৩৪
তরমুজ	১০৭	১৬.১০৪	১৮৯.২১৬
(গ) **মশলা ঃ**			
লঙ্কা	১.২১৩	৫৯.৮৫৮ (রবি, ভাদুই)	৭৫.১৩৪ (রবি, ভাদুই)
রসুন	৫.২	২.৬৩২	২২.৮৬৫
আদা	৩৪৯৭ কেজি/হে.	১১.২১৩	৮৩.১৫৫
হলুদ	৪৫০১ কেজি/হে.	১৭.০৪০	৩০.৩১৯
কালোজিরা	৯৮৫ ,,	১.৫৭১	১.৫৪৮
ধনে	৮২৪ ,,	৯.৬৯৩	১০.১৪৬

হর্টিকালচার বা উদ্যানজাত ফসলের উন্নয়ন এবং গুরুত্ব

ভারতে বৈচিত্র্যময় কৃষি জলবায়ুতে মূল্যবান নানাবিধ উদ্যানজাত ফসলের উন্নয়ন এবং গুরুত্ব সমধিক। প্রতি একক এলাকায় কৃষি ফসলের চাষবাস ছাড়া উদ্যানজাত ফসলের উন্নয়নে লাভ বেশি এবং কৃষি কর্মসংস্থানের বিশাল সুযোগ রয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যে হর্টিকালচারের গুরুত্ব সবচাইতে বেশি, বিশেষ করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে। ফুল, ফল, সবজি, মশলা ফসল চাষে বিশাল সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণ বৃদ্ধিতে জলবায়ুর যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তাতে আমাদের কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্যশস্য উৎপাদন পদ্ধতিকে আরো বিজ্ঞানভিত্তিক করে, ঝুঁকিপূর্ণ চাষবাসের উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হবে।

চিনের পর বর্তমানে সারা বিশ্বে ভারত **ফলচাষে** দ্বিতীয় স্থানে (১০ শতাংশ উৎপাদন) ও **সবজি উৎপাদনে** দ্বিতীয় স্থানে (১৫ শতাংশ) রয়েছে। ভারতীয় বিভিন্ন ফলের মধ্যে কলা, আম, সফেদা, পেঁপে, টকলেবু, কমলা লেবু, মোসাম্বী লেবু, পাতি ও কাগজি লেবু; সবজির মধ্যে ফুলকপি, মটরশুঁটি, ভিন্ডি, কুমড়া জাতীয় ফসল; বাগিচা ফসলের (নারকেল, সুপারি, কাজুবাদাম-৪৮ শতাংশ এবং চা-৩৩ শতাংশ) **উৎপাদন** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **মশলা চাষে** ভারতে আদা, হলুদ এবং কালোমরিচ চাষে বিশ্বে বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশ।

বাণিজ্যিক ফুলচাষে ভারতের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। ন্যাশনাল হর্টিকালচার বোর্ডের সাম্প্রতিক তথ্যে প্রকাশ, ২০০৮-০৯ সালে সারা দেশে প্রায় ১,৬৭,০০০ হেক্টর জমিতে ফুলচাষ করে ১০০০ মিলিয়ন টন কুচো ফুল এবং ১,১৩,৬২০ মিলিয়ন (সংখ্যায়) কাটাফুলের উৎপাদন হয়েছে। ভারতের চিরাচরিত ফুল গাঁদা, জুঁই, অ্যাষ্টার, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি এবং আধুনিক বাণিজ্যিক ফুলচাষে জারবেরা, কার্ণেশন, গ্ল্যাডিওলাস, অ্যানথুরিয়াম, অর্কিড প্রভৃতি বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, বাড়ছে রপ্তানি বাণিজ্য।

দেশের ৫০ শতাংশের বেশি ফুল চাষের এলাকাই দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে। এ ছাড়া বাণিজ্যিক ফুলচাষে অগ্রণী রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে **হর্টিকালচার সেক্টরের** অবদান বছরে প্রায় ২৮ শতাংশ জিডিপি (GDP) বা আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, যা উৎপন্ন হয় মাত্র ১৩.০৮ শতাংশ চাষের এলাকা থেকে এবং মোট কৃষিপণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্যানজাত ফসলের পরিমাণ ৩৭ শতাংশ।

ভারতে ১৩ শতাংশ এলাকায় বিভিন্ন মূল্যবান **মশলার চাষ** হয় এবং উৎপাদন সমস্ত উদ্যানজাত ফসলের ২ শতাংশ। ২২টি মশলা ফসলের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে সারা দেশে। ২০০৯-১০ সালে ভারত থেকে রপ্তানি করা বিভিন্ন মশলার পরিমাণ ৫,০২,৭৫০ টন, যার মূল্য ৫৫৬০.৫০ কোটি টাকা (১১৭৩.৭৫ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার)। **সারা বিশ্বে মশলা বাণিজ্যে** ভারত ৪৮ শতাংশ মশলা পাঠায় এবং ৪৪ শতাংশ অর্থ উপার্জন করে। ভারতকে তাই বলা হয় 'সুগন্ধ মসলার দেশ'। মশলার প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসা থেকে ভারতের বাণিজ্যিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে রপ্তানি বাণিজ্য।

উদ্যানজাত ফসলের রপ্তানি চিত্র

১৯৯০ সাল থেকে হর্টিকালচার ফসলের রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালের রপ্তানি করা ১০২ হাজার টন থেকে ২০০৮-০৯ সালে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২৪৪৬ হাজার টন। আর্থিকমূল্যে ১৯৯১ সালের আয় ৩৪৮ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০০৮-০৯ সালে হয়েছে ৩৬৫৯ কোটি টাকা। প্রক্রিয়াকরণ উদ্যানজাতীয় ফসলের পরিমাণ (২০০৮-০৯ সালে) ৭০৮০ হাজার টন, যার বাজার দাম ছিল ২৬২১ কোটি টাকা।

বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের অংশ ৯.৫৭ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্যের মাত্র ১.২৮ শতাংশ। হর্টিকালচার শিল্পের রপ্তানি বাণিজ্যে রয়েছে—**ফলের মধ্যে** আঙুর, বেদানা, আম; **বিভিন্ন তাজা সবজি**, ডিহাইড্রেটেড পেঁয়াজ, আমের মন্ড বা শাঁস (আমসত্ত্ব); মধু এবং পোল্ট্রি ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন ফল এবং সবজি রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশ, ইউনাইটেড কিংডম, সৌদি আরব, নেপাল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে।

ভারত সরকার ২০০৫-০৬ সালে '**জাতীয় হর্টিকালচার মিশন**' স্থাপন করে। 'দি ফরেন ট্রেড পলিসি' ২০০৪-০৯ সাল পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন কৃষিপণ্য রপ্তানির ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে। কৃষি বৈচিত্র্যকরণের ফলে সারা দেশে এখন উদ্যানজাত ফসলের বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত চাষবাস এবং উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে।

প্রধান বাধাসমূহ

ভারতে হর্টিকালচার শিল্পে উৎপাদনশীলতা এবং বাজারীকরণে প্রধান বাধাগুলি (major constraints) এভাবে সাজানো যেতে পারে—

- ফল ও সবজি প্রভৃতি ফসলের উচ্চফলনশীল চারা ও বীজের অভাব।
- সেচের আধুনিক দক্ষ পদ্ধতির ('ড্রিপ' এবং 'ফোয়ারা' পদ্ধতি) ব্যাপক সম্প্রসারণের অভাব।
- ব্যাপক সম্প্রসারণ কর্মসূচির অভাবে কৃষকদের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক চাষবাসে ঘাটতি।
- শস্যরক্ষার দক্ষ প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাবে উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং ফলনের ক্ষতি।
- বাণিজ্যিক চাষে কৃষি ঋণের জোগানে ঘাটতি।
- উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি এবং কৃষি উপকরণ ব্যবহারে অদক্ষতা।

- ফসল তোলার পরবর্তী পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার অভাব।
- রাস্তাঘাট, হিমঘর এবং রেগুলেটেড বাজার ব্যবস্থার পরিকাঠামোর অভাব।
- পরিবহন খরচ বৃদ্ধি।

কৃষি দুর্যোগ এবং ক্ষতি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বাধার মোকাবিলা করে কৃষকদের হর্টিকালচার ফসলের উন্নত চাষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (খরা, বন্যা, অম্ল, ক্ষার এবং নোনা মাটির সমস্যা, ইত্যাদি) সুষ্ঠু মোকাবিলা করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। নতুবা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

শুখা এবং খরাপ্রবণ অঞ্চলে যথাযথ শুখা চাষ পদ্ধতি ও খরা প্রযুক্তি গ্রহন করে উদ্যানজাত ফসলের বিজ্ঞানভিত্তিক বাণিজ্যিক খামার গড়ে তোলা জরুরি। অঞ্চলভিত্তিক হর্টিকালচার ফসলের চাষবাস গড়ে তুলে তাদের প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হতে হবে। এতে উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য তৈরি করে বিদেশের বাজারে প্রচুর লাভ করা সম্ভব।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুল চাষ

মানুষ মাত্রই ফুল ভালোবাসে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির এক অনন্য উপাদান হল ফুল। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল উৎসবে, বিবাহ, জন্মদিন, মৃত্যু, গৃহসজ্জা, মহিলাদের অঙ্গসজ্জা, পূজাপার্বণ ইত্যাদি সকল কাজে ফুল ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরও ফুলের ব্যবহার। তাছাড়া ফুলের নির্যাস থেকে উৎপন্ন হয় তেল, প্রসাধন ও সুগন্ধি দ্রব্য। ওষুধ এবং রঙ প্রস্তুতিতে কাঁচামাল হিসাবে ফুল ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রতীক রূপেও বিভিন্ন ফুল সমাদৃত, যেমন ভারতে পদ্ম, বাংলাদেশে শালুক, ইংল্যান্ড এবং ইরাণে গোলাপ, হল্যান্ডে টিউলিপ, জাপানে চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি।

বর্তমানে শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। দেশবিদেশে ফুলের চাহিদা বেড়েছে। ফুল চাষ তাই এখন প্রচলিত প্রথা ছেড়ে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টরের বেশি জমিতে ফুলের চাষ হয়, এবং ২ লক্ষের বেশি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফুল চাষের সঙ্গে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর (পূর্ব) জেলার পাঁশকুড়া, কোলাঘাট সংলগ্ন এলাকায়, নদীয়া জেলার রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, হাওড়া জেলার বাগনান, উলুবেড়িয়া, দার্জিলিং জেলার কালিম্পং সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে ফুল চাষ হয়। দেশ ও বিদেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পশ্চিমবঙ্গে ফুল চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। অধিক উৎপাদনের জন্য উন্নত বীজ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, ফুল তোলার পর বাছাই (গ্রেডিং), প্যাকিং, হিমায়ণকরণ ও বাজারজাতকরণ করার উপযুক্ত পরিকাঠামো ব্যবস্থা এবং উন্নত প্রশিক্ষণের অত্যন্ত প্রয়োজন। নীচে কয়েকটি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ফুলের উন্নত চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

- **ফুল গাছের শ্রেণীবিভাগ**

ফুল গাছের কান্ডের গঠন, ঋতু, কন্দ ও পাতা, জীবনকাল, বর্ণ, জাত ও দল বিশিষ্টর উপর নির্ভর করে ফুল গাছকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিম্নে ফুলগাছের শ্রেণীবিন্যাসের উপর আলোচনা করা হল।

কান্ডের প্রকৃতি অনুযায়ী ফুলগাছকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন—

বৃক্ষ ঃ পলাশ, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, অশোক, বকুল, কদম ইত্যাদি।

গুল্ম ঃ জবা, গোলাপ, গন্ধরাজ, টগর, হাস্নুহানা, রঙ্গন, ধুতুরা, করবি, কামিনি ইত্যাদি।

বিরুৎ ঃ গাঁদা, ডালিয়া, জিনিয়া, সালভিয়া এস্টার, পিটুনিয়া প্রভৃতি।

জীবনকাল অনুসারে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

একবর্ষজীবী (Annual) : দোপাটি, ডালিয়া, সূর্যমুখী প্রভৃতি।

বহুবর্ষজীবী (Perennial) : টগর, জবা, গোলাপ, চাঁপা, বেল, গন্ধরাজ ইত্যাদি।

মরশুমি বা ঋতুভেদে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

গ্রীষ্মকালীন ঃ জিনিয়া, সূর্যমুখী, স্টারগ্লোরি, মিরাবিলিস, মেক্সিকান সান ফ্লাওয়ার, অ্যামারন্থাস, কসমস ইত্যাদি।

বর্ষাকালীন ঃ দোপাটি, সেলোসিয়া, গাইলার্ডিয়া, গোলাপ, হাইমেনথেরাম ইত্যাদি।

শীতকালীন ঃ ডায়ান্থাস, ক্যালেন্ডুলা, অ্যাস্টার, স্যালভিয়া, পিটুনিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি।

কন্দ ও লতা অনুযায়ী দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

কন্দজ ঃ পদ্ম, শালুক, গ্লাডিওলাস, রজনীগন্ধা, ডালিয়া ইত্যাদি।

লতা ঃ অপরাজিতা, ভেনাস্টা, বুগেনভেলিয়া, এলাম্যানডা, মাধবীলতা, মধুমালতী, মালতী প্রভৃতি।

বর্ণ অনুসারে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

বেগুনি নীল ফুল ঃ অ্যালিসাম, পিটুলিয়া, গ্ল্যাডিওলাস, ফ্লকস্, স্যালভিয়া ইত্যাদি।

হলুদ-কমলা ফুল ঃ গাঁদা, সূর্যমুখী, ক্যালেন্ডুলা, পপি, জিনিয়া, ডালিয়া ইত্যাদি।

লাল ফুল ঃ অ্যামার‍্যান্থাস, অ্যান্টিরিনাম, পপি, কসমিয়া ইত্যাদি।

সাদা ফুল ঃ সুইট এলাইসাম, পপি, দোপাটি, চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস ইত্যাদি।

এছাড়াও জাত অনুসারে দেশি, উন্নত, হাইব্রিড ও দল বিশিষ্ট অনুসারে একদল বহুদলে ভাগ করা যায়।

রজনিগন্ধা চাষ

রজনিগন্ধা একটি কন্দ জাতীয় বহুবর্ষজীবী ফুল। একই জমি থেকে পরপর তিন বছর ধরে রজনিগন্ধা ফুল পাওয়া যায়। এই ফুলের গহনার চাহিদা অপরিসীম। তাছাড়া এই ফুল দীর্ঘদিন পর্যন্ত সতেজ অবস্থায় থাকে। এর পাপড়ি থেকে সুগন্ধি তেল বের করে বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করা যায়। এইসব কারণে রজনিগন্ধা চাষ অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এই ফুল চাষে রোজগারও বেশ ভালো হয়।

মাটি ঃ অবাধ সূর্যালোকপ্রাপ্ত উত্তম জলধারণ ও জল নিষ্কাশন ক্ষমতাযুক্ত পলি-দোআঁশ থেকে কাদা-দোআঁশ মাটি রজনিগন্ধা চাষের পক্ষে উপযোগী। বেলে-দোআঁশ মাটিতে চাষ করলে ঘন ঘন সেচ দিতে হয় এবং কৃমি শত্রু বা নিমাটোড আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সামান্য অম্ল থেকে নিরপেক্ষ (পি.এইচ ৫.৫-৭.০) মাটি রজনিগন্ধার পক্ষে আদর্শ।

আবহাওয়া ঃ রজনিগন্ধা আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু পছন্দ করে। শীতের সময় গাছের পাতা শুকিয়ে আসে এবং

মাটির নীচে কন্দ বাড়ে না। রজনিগন্ধা চাষের জন্য ৩০-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা, ৯০-৯৫ শতাংশ বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা, ১৫০-২৫০ সেমি বৃষ্টিপাত এবং বড় দিনের (Long day) প্রয়োজন।

জাত ঃ রজনিগন্ধার প্রধানত দু'প্রকার জাত আছে, যথা—একস্তর দলবিশিষ্ট (single stick) এবং বহুস্তর দলবিশিষ্ট (Double or Multiple stick)।

একস্তর দলবিশিষ্ট প্রকার—শৃদ্দার, কলিকাতা সিঙ্গল, মেক্সিকান সিঙ্গল।

দ্বিস্তর দলবিশিষ্ট প্রকার—পার্ল, সুবাসিনী, কলিকাতা ডাবল, ডোয়ার্ফ পার্ল এক্সেলসিয়ার।

বাগান বা টবের জন্য—রজতরেখা, স্বর্ণরেখা।

বংশবিস্তার ঃ রজনিগন্ধার ভূ-নিম্নস্থ কান্ড বা কন্দ থেকে সহজে চারা প্রস্তুত করা যায়। আবার উর্বর মাটিতে একটি পরিণত গাছ অল্পদিনের মধ্যেই অসংখ্য বিয়ান (seedling) বা চারাগাছ তৈরি করতে পারে, যেগুলি পরিণত অবস্থায় ফুলমঞ্জরি উৎপন্ন করতে পারে।

জমি তৈরি ও মূল সার প্রয়োগ ঃ রজনিগন্ধার কন্দ বসানোর জন্য মাটি বেশ নরম ও গভীর হওয়া প্রয়োজন। তিন-চারবার গভীরভাবে চাষ দিয়ে ও মাঝে মাঝে মই দিয়ে মাটিকে প্রথমে বেশ ভালোভাবে ভেঙে দিতে হবে। জমি মসৃণ করে নেওয়ার পর জলসেচ ও জলনিকাশের নালিগুলি তৈরি করতে হবে। জলসেচ নালির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে কন্দ বা বীচন বসানোর নালি তৈরি করুন।

জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন পচানো খামারের সার বা কম্পোস্ট, ৫ টন কেঁচো সার জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর শেষ চাষের সময় উন্নত জৈব সার কন্দ বসানোর নালিতে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিন। চারার গোড়া পচা রোগ প্রতিরোধের জন্য এই সময় কন্দ বসানোর নালিতে বায়ো ছত্রাকনাশক T.V/PF ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।

কন্দ লাগানো ঃ মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত, আবার মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জমিতে কন্দ লাগানো যায়। লাগানোর আগে ১০ লিটার জলে ১০ গ্রাম TV মিশিয়ে ১০-১৫ কেজি কন্দ ২৫ মিনিটের জন্য ডুবিয়ে শোধন করে নেওয়ার পর তা ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। কন্দগুলি যুগ্ম বা দ্বি-সারি পদ্ধতিতে লাগানো হয়। এর জন্য ২০ সেমি দূরত্বে ২টি সারি তৈরি করে পরবর্তী ২টি ৪০ সেমি ব্যবধানে তৈরি করা হয়। প্রতি সারিতে ১০ সেমি চওড়া ও ৪ সেমি গভীর নালা তৈরি করে এতে পরিমাণমত জীবাণু সার মিশিয়ে জমি তৈরি করে রাখা হয়। মাটিতে ভালো রস না থাকলে হালকা সেচ দেওয়া হয় এবং দু-একদিন পরে প্রতি সারিতে ২০ সেমি দূরত্বে কন্দগুলি মাটির ৫-৬ সেমি গভীরে বসানো হয়। এক হেক্টর জমির জন্য ২৫ হাজার পুষ্ট ও সুস্থ কন্দের দরকার।

সার প্রয়োগ ঃ রজনিগন্ধার জন্য বছরে হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫০-২০০ কেজি ফসফেট এবং ১৫০-২০০ কেজি পটাশের প্রয়োজন। জীবাণুসার, উন্নত জৈব সার (সুঃ সুষ্ম...), খইল, হাড় গুঁড়ো, রকফসফেট, ভারমি কম্পোষ্ট, প্রভৃতির মাধ্যমে ঐ খাদ্যের যোগান দিতে হবে। এই পরিমাণ সারকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রথম বছর বীজ কন্দ বসানোর নালিতে এক ভাগ, বীজ বসানোর ৪৫ দিন পরে এবং ৯০ দিন পরে বাকি দুই ভাগ সার দু'বারে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে মার্চ-এপ্রিল, আগস্ট-সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে তিন দফায় এই সার প্রয়োগ করা হয়। গাছের সারির দুধারে সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালো করে

মিশিয়ে গাছের গোড়াতে সেই মাটি ধরিয়ে দিতে হয়। কৃমি শত্রুর আক্রমণ কমাতে নিমখোল অথবা জৈব কীটনাশক PL প্রয়োগ করা উচিত।

জলসেচ ঃ জমিতে সঠিকমাত্রায় সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাওয়া যায়। কন্দ বসানোর আগে হালকা সেচ দিয়ে মাটিতে 'জো' আসার পর কন্দ লাগানো হয়। এরপর যতদিন পর্যন্ত ভালোভাবে পাতা তৈরি হয়, ততদিন পর্যন্ত জমিতে হালকা সেচ দিতে হয়। সাধারণত গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন অন্তর এবং শীতকালে ১৫ দিন অন্তর মাটি বেশ ভিজিয়ে জলসেচ দিতে হবে। বর্ষাকালে জমিতে উপযুক্ত জলনিকাশের বন্দোবস্ত রাখা জরুরি।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ঃ জমিতে কন্দ বসানোর দু'সপ্তাহের মধ্যে সরস মাটি ঠেলে অঙ্কুর বের হয়। গাছ পাতা ছাড়ে। এই সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য ২-৩ সপ্তাহ অন্তর আগাছা দমন ও গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দেওয়া দরকার।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার

রোগ ঃ রজনিগন্ধা পাতার ধ্বসা রোগ, ডাঁটির গোড়া পচা রোগে গাছের গোড়া বা কন্দ আক্রান্ত হয়। এর জন্য উপযুক্ত জল নিষ্কাশন, কন্দ শোধন ইত্যাদি ছাড়াও রোগ দেখা মাত্র লিটার প্রতি ৪ গ্রাঃ T.V. + ৪ গ্রাঃ PF এর দ্রবণ দিয়ে (হেক্টর প্রতি ৭৫০ লিটার) গাছের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রায় ১৫ দিন পরে আর একবার স্প্রে করা উচিত।

পোকা ঃ লেদা পোকা, ফুলের কুঁড়ি খাওয়া পোকা, সবুজ ফড়িং, শোষক পোকা ইত্যাদি রজনিগন্ধার প্রধান কীটশত্রু। এই পোকাগুলির উপদ্রব দেখা দিলে নিম তেল থেকে তৈরী ওষুধ অথবা এন. কে এই (নিম বীজ গুঁড়োর নির্যাস) ৭ দিন অন্তর দুইবার আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফসল তোলা ও পরবর্তী পরিচর্যা ঃ জমিতে পরিণত কন্দ বসালে (২.৫ সেমি ব্যাসবিশিষ্ট) ৮০-৯০ দিনের মাথায় গাছে ফুল আসে। বেশি শীত পড়লে গাছে ফুলের উৎপাদন কমে যায়। বছরে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বেশি পরিমাণ ফুল পাওয়া যায়। সাধারণত সন্ধেবেলায় বেশি ফুল ফোটে। মঞ্জরিতে ফুল ফোটার একদিন আগে যখন কুঁড়িগুলি সবুজাভ সাদা রঙের হয় এবং বেশির ভাগ ফুল কুঁড়ি অবস্থায় থাকে, সেই সময় সকালে বা বিকালে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে মঞ্জুরির দন্ডটি কেটে নিতে হয়। এর পরে ঠান্ডা জলে গোড়াগুলি কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখার পর জল থেকে তুলে ১২টি, ১০০টি বা ১০০০টির গোছা বেঁধে বাজারে পাঠানো হয়। তার আগে গোছাগুলি ০.১ শতাংশ তুঁতের দ্রবণে ডুবানো কলাপাতা দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে ঝুড়িতে সাজিয়ে নেওয়া হয়।

ফলন ঃ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৫০০-৪০০০টি রজনিগন্ধার ডাঁটি পাওয়া যায় এক হেক্টর জমি থেকে। একটি ভালো আকারের মঞ্জরিতে ৯০-১০০টি ফুল থাকে। ওজন হিসাবে হেক্টর প্রতি বছরে ১০,০০০-১২,০০০ কেজি ডাঁটি পাওয়া যায়।

ফুল সংরক্ষণ ঃ ফুলগুলি ম্লান হয়ে শুকিয়ে এলে অল্প সময়ের জন্য পাতলা তুঁতের শীতল দ্রবণে ডুবিয়ে নিলে মঞ্জরির উজ্জ্বলতা ও সতেজতা ফিরে আসে। ফুলদানিতে সংরক্ষণের জন্য প্রতি লিটার জলে এক চা চামচ লবণ বা তিন চামচ চিনি বা একটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট মিশিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া দৈনিক ফুলদানির জল পাল্টে এবং ডাঁটির জলে ডোবা অংশ কিছুটা কেটে দিতে হবে। তবে, জলে অল্প তুঁতে বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা কর্পূর মিশিয়ে নিলে নিয়মিত জল পাল্টাতে হবে না।

শীতে ভালো ফুল পাওয়ার জন্য অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে সেচ দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর প্রতি গাছের গোড়ার চারদিকের মাটি ১০-১৫ সেমি গভীরভাবে খনন করে উপরের স্তরের কিছু মূল মাটি থেকে আলগা করে দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে শৈতকরণ বলা হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যেই (১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর) ভারী ছাঁটাই করতে হবে। বছরের অন্যান্য সময়ে হালকা ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয়।

ছাঁটাই করার পরে ছেদন স্থানে লিটার প্রতি ৪ গ্রাঃ TV + ৪ গ্রাঃ PF মিশিয়ে ওই মিশ্রণের প্রলেপ দিতে হবে। এরপর প্রতি গাছে ২ কেজি খামারের জৈবসারের সঙ্গে খইল/উন্নত জৈব সার মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করে জলসেচ দিন। তারপর ৬০ দিনের মধ্যে আর একবার উক্ত সার প্রয়োগ করা দরকার। ফসল রক্ষার জন্য মাসে একবার TV এবং PF-এর মিশ্রণ সমানভাবে স্প্রে করতে হবে।

টবে গোলাপ চাষ

প্রায় ৩০-৩৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট সিমেন্টের বা মাটির বড় টবে জল নিকাশের ব্যবস্থা রেখে টবটি ভর্তি করতে হবে তিন ভাগ দোআঁশ মাটি, এক ভাগ পাতা পচা সার, এক ভাগ পচানো খামারের সার, এক ভাগ সামান্য পোড়া মাটির মিশ্রণ দিয়ে। এছাড়া টব প্রতি ১০ গ্রাম চুন, ৫০ গ্রাম হাড় গুঁড়ো, কিছু জৈব কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে টবটি ভর্তি করার পরে টবে ভালোভাবে সেচ দিয়ে ১৫-২০ দিন রেখে দিতে হবে এবং তারপর কলমের চারা লাগান। অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। রোপণের পরে নিয়মিত হালকা সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে রোগ ও কীটের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ওষুধ দিন। প্রতি ২-৩ মাস অন্তর গাছের গোড়া হালকাভাবে খুঁড়ে তরল সার দিতে হবে এবং সময়মত ছাঁটাই করতে হবে। বছরে একবার (অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ) টব থেকে মাটিসহ তুলে গাছের কিছু পার্শ্বমূল ও শাখাপ্রশাখা ছেঁটে দিয়ে আবার কিছু পরিমাণ সার-মাটি দিয়ে গাছটিকে টবে বসান।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার ঃ

গোলাপ বিভিন্ন রকম রোগ ও পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এজন্য পূর্ববর্ণিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে, যেমন রোপণের সময় মাটির সঙ্গে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধ মেশানো, ছাঁটাইয়ের পর ব্লাইটক্স ও ব্যাভিস্টিনের গুঁড়ো ভেসলিনের সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া, ইত্যাদি।

রোগ ঃ গোলাপের শাখা ছাঁটাইয়ের পর ডগা বা কান্ড শুকিয়ে আসা (Dieback), মরিচা ধরা (Rust), মিলডিউ, পাতায় কালো দাগ (Black spot) ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের দ্বারা গোলাপ গাছ আক্রান্ত হয়। সুসংহত উপায়ে রোগপোকা দমন করতে হবে। টব তৈরীর সময় প্রয়োজনীয় জৈবসারের সাথে নিম খইল এবং ট্রাইকোডারমা হারজিনিয়াম প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি মাসে একবার লিটার প্রতি ৪ গ্রাঃ TV এবং ৪ গ্রাঃ PF মিশ্রণ গাছ এবং গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করলে অধিকাংশ রোগ প্রতিরোধ করা যাবে।

পোকা ঃ (১) জাব পোকা, কান্ড ছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি আক্রমণ করলে গোলাপ গাছে নিমজাত কীটনাশক, নিমের নির্যাস অথবা BB ৭ দিন অন্তর ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।

(২) লেদা পোকা, সবুজ মাছি, ফড়িং, মিলিবাগ, বিটল ইত্যাদি পোকার আক্রমণের ক্ষেত্রে বিউভেরিয়া বেশিয়ানা অথবা নিমের নির্যাস বা নিমজাত কীটনাশক ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

(৩) গাছের গোড়ায় উইয়ের উপদ্রব হলে নিম খইল/নিম বীজের গুঁড়ো গাছের গোড়ায় ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

ফসল তোলা ও ফলন ঃ উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে কলমের চারা লাগানোর ৫-৬ মাস পর থেকেই গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে এবং ৫-৬ বছর পর্যন্ত ভালো ফুল পাওয়া যায়। বেশ ঠান্ডা আবহাওয়ায়, যেমন ভোরবেলা বা সন্ধের একটু আগে গাছ থেকে ফুল তোলা হয়। ফুলের বোঁটাসহ শাখার কিছু অংশ (প্রায় ৩০-৪০ সেমি লম্বা) কেটে নিলে সংরক্ষণের সুবিধা হয়। ফুল কাটার সঙ্গে সঙ্গে জল ভর্তি বালতিতে গোড়ার দিক খাড়াভাবে খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখার পর প্রয়োজন মত ৬টি, ১২টি অথবা ১০০টি হিসাবে আঁটিতে বেঁধে বাজারে পাঠানো হয়।

জাত অনুসারে শীত এবং বসন্ত ঋতুতে হেক্টর পিছু প্রতিদিন ২৫,০০০-৩০,০০০ কাটা ফুল পাওয়া যায়।

গ্লাডিওলাস

গ্লাডিওলাস নামটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'গ্লাডিয়াস' থেকে, যেহেতু এই ফুলগাছের পাতাগুলি দেখতে তরবারির মতো। এই ফুলের বাংলা নাম অপেক্ষা ইংরেজী নাম অধিক পরিচিত। ভারতীয় পৌরাণিক ধর্মীয় গ্রন্থে 'বৈজয়ন্ত' বা গ্লাডিওলাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এই ফুলের চাষ হয় সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ও মাটিতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই ফুলের চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

গ্লাডিওলাস ফুলের শীষকে '**স্পাইক**'(চলতি কথায় স্টিক) বলা হয়। এর মনমাতানো রঙের বৈচিত্র্য, দীর্ঘদিন টাটকা অবস্থায় থাকার ক্ষমতা এবং পাপড়ি মোলায়েম হবার জন্য পুষ্পপ্রেমী সমাজের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। এর বাজারদরও খুব বেশি, ফলে বাণিজ্যিক ভাবে গ্ল্যাডিওলাস চাষ লাভজনক।

আবহাওয়া ঃ সমতলে শীত, বসন্ত, বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্তে চাষ করা সম্ভব। তবে, ভালো গুণগত মানের ফুল পাওয়া যায় শীতকালে। গ্লাডিওলাসের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ১৬-৪০° সেলসিয়াস। এই উষ্ণতার মধ্যে এর বিভিন্ন রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং চাকচিক্য বজায় থাকে। প্রায় ১২ ঘন্টা সূর্যালোক অত্যন্ত আবশ্যিক। ঝড়প্রবণ এলাকায় এর চাষ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়।

মাটি ঃ উত্তম জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উঁচু জমি, জৈব পদার্থে ভরপুর গ্লাডিওলাস চাষের আদর্শ মাটি। মাটির রস সবসময় বজায় থাকতে হবে অথচ, অতিরিক্ত জল গাছের গোড়ায় দাঁড়াবে না। হালকা ঝুরঝুরে মাটি বীজকন্দ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। বেলে-দোআঁশ থেকে বেলে মাটি যুক্ত জমি গ্লাডিওলাসের পছন্দ। মাটির পি.এইচ 6-6.5 হলে ভালো হয় অর্থাৎ, ঈষৎ অম্লভাবাপন্ন মাটি গ্লাডিওলাস চাষের উপযোগী।

উন্নত জাত ঃ আমেরিকান বিউটি, ফ্রেন্ডশিপ, এলিজাবেথ, মেলোডি, ড্রিমগার্ল, সিলভিয়া, অপ্সরা, অস্কার, মীরা, মনোহর, মনীষা, স্বপ্না, শোভা, পুনম ইত্যাদি।

লাগানোর সময় ঃ এটি প্রধানত শীতকালীন ফুল। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস (আশ্বিন-কার্ত্তিক) এর মাঝামাঝি হল কন্দ বসানোর আদর্শ সময়। বর্ষাকালে এর চাষ করলে উঁচু সারিতে আইল তুলে কন্দ বসানো দরকার।

বীজ শোধন ঃ কন্দ বসানোর ২-৩ দিন আগে ৪ গ্রাম TV + ৪ গ্রাম PF প্রতি লিটার জলে গুলে বাল্বগুলিকে আধঘন্টা ভিজিয়ে রেখে বীজ শোধন করা হয়।

লাগানোর দূরত্ব ও বীজের হার ঃ শীতকালে ফুলের জাত অনুসারে ৩০-৪৫ সেমি পরপর সারি করে, ২০-২৫ সেমি পরপর, ৬-১০ সেমি গভীরে বীজ কন্দ রোপণ করে মাটি চাপা দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে সাধারণত ৩০সেমি × ২০ সেমি দূরত্বে বসালে, এক একর জমিতে ৬০,০০০ বীজ কন্দ লাগে।

জমি তৈরি ঃ গ্লাডিওলাস গাছের মাটির নীচে ওলের ন্যায় বীজকন্দ হয়, যার থেকে ছোট ছোট মুখী উৎপন্ন হয়। এগুলি বীজতলায় আলাদাভাবে রোপণ করা হলে পরবর্তী বছর বড় হয় এবং ফুল চাষের জন্য ব্যবহার করা যায়।

মে-জুন মাসে এই ফুল চাষের জন্য নির্বাচিত জমির মাটিকে কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, যাতে জীবাণু মুক্ত হয়। কন্দ লাগানোর আগে জমিতে ২-৩ বার চাষ দিয়ে মাটি হালকা ও ঝুরঝুরে করতে হবে। তারপর পরিচর্যার সুবিধার জন্য ৪ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করা দরকার। জমি তৈরির সময় প্রথম চাষে প্রতি একরে ২০-২৫ টন গোবর সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ একর প্রতি নাইট্রোজেন ১০ কেজি, ফসফেট ৫০ কেজি এবং পটাশ ১০০ কেজি, শেষ চাষের আগে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। চাপান সার গাছের ৪-৫টি পাতা গজালে অর্থাৎ কন্দ লাগানোর এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। চাপান সার প্রয়োগ ছাড়াও ১৫ দিন পরপর পাতার ওপর জৈব তরল সার স্প্রে করে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। তবে গাছে ফুল আসার পর স্প্রে করা উচিত নয়। কম্পোষ্ট, ভারমি কম্পোষ্ট, বায়ো NPK, হাড় গুঁড়ো, রক ফসফেট, নিম খইল, বাদাম খইল প্রভৃতি মারফৎ প্রয়োজনীয় খাদ্য জোগাতে হবে।

কন্দ রোপণ ঃ গ্লাডিওলাস চাষে বীজকন্দ বা মুখী ব্যবহার করা শ্রেয়। ফুল সংগ্রহের পর গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকাতে শুরু করে। এই সময় সেচ বন্ধ করে কন্দ সংগ্রহ করে বাঁশের মাচার উপর শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর বীজকন্দ ও মুখী সাইজ অনুসারে বাছাই করে ছোটগুলি বীজতলায় এবং বড় সাইজের কন্দগুলি ফুল চাষের জন্য মূল জমিতে রোপণ করা হয়। সাধারণত ৪-৫ সেমি ব্যাসযুক্ত লাটিম আকৃতির বীজকন্দ ব্যবহার করা উচিত। হাইব্রিড জাতের বীজকন্দ ব্যবহার করা উচিত নয়।

জলসেচ ঃ কন্দ বসানোর ৩-৪ দিন আগে একবার হালকা সেচ দিতে হয়। তারপর ৭-১০ দিন ছাড়া প্রয়োজনমত মাটির চরিত্র অনুযায়ী জলসেচ প্রয়োগ করা দরকার।

অণুখাদ্য প্রয়োগ ঃ উচ্চ মানের ফুল পেতে হলে অণুখাদ্যের প্রয়োগও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত দস্তা, লোহা ও লৌহঘটিত অণুখাদ্য গ্লাডিওলাসের পক্ষে বেশি প্রয়োজন। এর জন্য ৫ গ্রাম **চিলেটেড জিঙ্ক**, ১০-২০ গ্রাম **সোহাগা**, ১৫-২০ গ্রাম **ফেরাস সালফেট** ১০ লিটার জল ও ৫ গ্রাম চুনের সঙ্গে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হয়। এক ও দেড় মাস পর দু'বার এই দ্রবণ পাতায় স্প্রে করলে ভালো ফুল পাওয়া যায়।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ঃ বীজকন্দ বসানোর দুই সপ্তাহের মধ্যে চারা গজিয়ে ওঠে। আগাছা দমন করার জন্য **ব্যাসিলিন** ১.৫ লিটার প্রতি একর কন্দ বসানোর আগে প্রয়োগ করলে ৭০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা যায়। গাছ বড় হলে পাশ থেকে মাটি তুলে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। এছাড়া ফুল ফুটলে লাইন বরাবার দুপাশে খুঁটি দিয়ে ঠেকা দিতে হয়।

গ্লাডিওলাসের রোগ ও পোকা এবং তার প্রতিকার ঃ

গাছ মরা বা উইল্ট (Wilt) ঃ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া দু'ধরনের জীবাণু দিয়ে এই রোগ হয়। সাধারণত ফুল আসার আগে এই রোগ দেখা যায়। পাতাগুলো ক্রমশ হলুদ হতে শুরু করে। আস্তে আস্তে গাছ শুকিয়ে যায়। গুঁড়ি কন্দের সঙ্গে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার ঃ (১) সুস্থ জমি থেকে বাল্ব বা গুঁড়ি কন্দ সংগ্রহ করা দরকার। (২) বীজ শোধন এই রোগের প্রকৃত প্রতিকার। (৩) রোগাক্রান্ত জমিতে পরবর্তী বছর গ্লাডিওলাস চাষ করা উচিত নয়।

চোষী পোকা ঃ চোষী পোকা দেখতে খুব ছোট ও ছাই রঙের। এরা পাতা ও ফুলের রস শোষণ করে খায়। পাতা ও ফুল শুকিয়ে যায়। প্রকোপ বাড়লে গাছ শুকিয়ে যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম **কার্বারিল** প্রয়োগ করলে এই পোকা দমন করা যায়।

ফুল তোলা ঃ সাধারণত জাত ভেদে চারা গজানোর ৬০-৯০ দিনের মধ্যেই ফুল পাওয়া যায়। গ্লাডিওলাস ফুল তোলা হয় পুষ্পদন্ডসহ। পুষ্পদন্ড বা ডাঁটির গোড়ার দিকে ২-৩টি ফুল ফুটতে শুরু করলে কাঁচি বা ব্লেড দিয়ে ডাঁটার নীচে ৪-৫টি পাতা বাদ দিয়ে কেটে নিতে হয়। ডাঁটা কাটার প্রকৃষ্ট সময় ভোরে সূর্য ওঠার আগে বা বিকালে সূর্য ডোবার পর। যদি প্রতি একর জমিতে ৬০,০০০ হাজার বীজকন্দ বসানো যায় তাহলে এক বছরে ৭০ থেকে ৭৫ হাজার পুষ্পদণ্ড পাওয়া যায়।

ফলন ঃ পুষ্পদণ্ড কেটে নেওয়ার ৬-৮ সপ্তাহ পর কন্দ তোলা হয়। কন্দ তোলার ২-৩ সপ্তাহ আগে জলসেচ দেওয়া বন্ধ করা দরকার। কয়েকদিন পর পাতাগুলি শুকিয়ে গেলে কন্দের ২-৩ সেমি উপরে গাছগুলি কেটে নিয়ে সুস্থ কন্দ ও মুখী সংগ্রহ করা হয়। উৎপাদিত কন্দ ও মুখী রোদে শুকিয়ে নিয়ে ব্যাগে রাখলে ৬ মাস পর্যন্ত বীজের জীবনীশক্তি একই থাকে। কিন্তু হিমঘরে ৪-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা ভালো।

গাঁদা

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য, পূজা-পার্বণে, বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে গাঁদার ভূমিকা অপরিসীম। এই ফুলের চাষ সহজ। এর গাছ একটি বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ যার থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফুল পাওয়া যায়। গাঁদা গাছের ফুল ও পাতার ভেষজ গুণও বর্তমান। বিভিন্ন ফসলের ক্ষেতে নিমাটোড দমনের জন্য গাঁদা ফুলের চাষ করা হয়। দু'রকমের গাঁদার গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরনের গাঁদাগাছ আকারে ছোট, অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বেরোয়, ছোট ছোট ছড়ানো ফুল পাওয়া যায় এবং কান্ডের রঙ কিছুটা লালচে হয়। এদের ফরাসি বা চিনে গাঁদা বলা হয়। বড় জাতের গাঁদা ফুলের গাছও বড় হয়। ফুলের আকৃতিও বড় ও গোলাকার হয়। এদের আফ্রিকান গাঁদা বলা হয়। দু'ধরনের ফুলই পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয়।

মাটি ঃ এঁটেল, দোআঁশ, বেলে সব রকমের মাটিতেই গাঁদা ফুলের চাষ করা যায়। মাটিতে সব সময় রোদ থাকা এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো হওয়া খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ নদীচরের পলিমাটি গাঁদা চাষের পক্ষে আদর্শ। মাটির অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মান ৫.৫-৬.৫-এর মধ্যে থাকলে ভালো হয়।

আবহাওয়া ঃ উঁচু পাহাড়ি এলাকা ছাড়া সব ধরনের আবহাওয়াতেই গাঁদা ফুল চাষ করা যায়। গাঁদা গাছ সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ বা অল্প ঠান্ডা আবহাওয়া পছন্দ করে। বর্তমানে গরমকালের দু'টি মাস ছাড়া সব সময়ই গাঁদা ফুলের চাষ হয়।

জাত ঃ ফরাসি গাঁদা—রক্ত গাদা বা কৃষ্ণ গাঁদা বাটার-স্কচ, রেড ব্রোকেড, রাস্টি রেড।

আফ্রিকান গাঁদা—পুসা বাসন্তী গাঁদা, পুসা নারঙ্গী গাঁদা, সিরাকোল।

বহিরাগত গাঁদা—আলাস্কা, ফায়ার গ্লো, গোল্ডেন জুবিলি, ইন্‌কা।

টবের উপযোগী জাত—তারা গাঁদা বা মাছি গাঁদা।

চারা তৈরি ঃ বীজের মাধ্যমে সহজে গাঁদার চারা তৈরি করা যায়। কিন্তু ডগা কেটে অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে চারা তৈরি করলে মাতৃগাছের সমগুণ সম্পন্ন গাছ পাওয়া যায়। বালিতে ডগা পুঁতে দিলেই দু'সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণে শিকড় জন্মায়, তখন সেগুলি জমিতে বসানো হয়।

জমি তৈরি ঃ লাঙল দিয়ে বা কোদাল বা খুরপি দিয়ে কুপিয়ে ভালো করে জমি তৈরি করে নিতে হবে। জমি তৈরির সময়েই একর প্রতি ৫ টন গোবরসার বা খামার পচা সার দিতে হবে। আর শেষ চাষের সময় ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট এবং ৪০ কেজি পটাশ মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা লাগানোর এক সপ্তাহ আগে জমি তৈরির কাজ শেষ করে নিতে হবে।

চারা লাগানো ঃ সেচের সুবিধা থাকলে সারা বছর ধরেই গাঁদার চারা বসানো যায়। তবে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত (ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ মাস) 'সিরাকোল' জাতটি লাগানো চলে। 'চিনে গাঁদা' লাগানো যায় সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত (ভাদ্র থেকে পৌষ মাস)। দু'টি সারির মধ্যে দূরত্ব ৪৫ সেমি এবং সারিতে দু'টি চারার মধ্যে দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হবে।

পরিচর্যা ঃ জমিতে আগাছা থাকলে সময় সময় তা তুলে ফেলে দিতে হবে। চারা বসানোর ছয় সপ্তাহ পরে একবার একর প্রতি ২০০ কেজি নিম খোল এবং ১০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিতে হবে। আরও ছয় সপ্তাহ পরে ওই একই পরিমাণ সার আবার দিতে হবে। দু'সারির মাঝখানে চাপান সার ছড়িয়ে কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। চাপান সার দেওয়ার পরই সেচ দিতে হবে।

রোগ পোকার আক্রমণ ও প্রতিকার ঃ

এক রকমের ক্ষুদে শোষক পোকা গাঁদা পাতার নীচে বসে রস চুষে খায়। ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়। এছাড়া লাল মাকড়ও পাতার নীচে ও কিনারে সূক্ষ জাল তৈরি করে ওই জালের ভিতরে বসেই রস চুষে খায়। এই পোকাগুলিকে দমন করার জন্য প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাঃ জৈব কীটনাশক BB বা নিম জাতীয় কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে। ফড়িং, মথ বা প্রজাপতির কীড়া প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে নেয়। জাবপোকা গাছের নরম ডগা, কুঁড়ি এবং ফুলকে আক্রমণ করে। নিমের নির্যাশ, নিমজাতীয় কীটনাশক বা BB প্রয়োগ করে এদের দমন করতে হবে।

অনেক সময় গাঁদা গাছের ডগা বা ফুল পচে যায়, যা একটি মারাত্মক রোগ। প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম TV + ৪ গ্রাম PF মিশিয়ে স্প্রে করলে এই রোগের আক্রমণের তীব্রতা কমে।

ফলন ঃ চারা বসানোর প্রায় দু'মাস পর থেকেই ফুল তোলা যায়। সাধারণত একদিন অন্তর ফুল তোলা হয় এবং সাত-আট সপ্তাহ পর্যন্ত ফুল পাওয়া যায়। চাষের সময় অনুসারে এক একর জমি থেকে ১০ টন পর্যন্ত ফুল পাওয়া যায়।

জারবেরা

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে জারবেরা একটি অতি সুপরিচিত নাম। সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ হয়ে থাকে।

মাটি ঃ মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া অর্থাৎ অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মান ৫.৫-৬.৫-এর মধ্যে হওয়া দরকার। মাটির লবণাক্ততা যেন কখনও ২ মিলিমোস/সেমি-র চেয়ে বেশি না হয়। মাটি, গভীর, হালকা এবং মাটি থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো হওয়া চাই। সাধারণত এক মিটার গভীর মাটির স্তর জারবেরা চাষের উপযুক্ত।

আবহাওয়া ঃ শুষ্ক ও গরম আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে সবুজ ঘরে (Green house plant) জারবেরার চাষ লাভজনক। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত জলের মধ্যে যেন লবণ, জীবাণু ও অন্যান্য কঠিন উপাদানের পরিমাণ কম থাকে। তাপমাত্রা ১৮-২৭°সেলসিয়াসের মধ্যে থাকা দরকার এবং তা ১০° সেলসিয়াসের নীচে যেন না যায়। শীতকালে জারবেরার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোকের প্রয়োজন, যদিও গ্রীষ্মকালে ৫০% ছায়াজাল দিয়ে গাছের উপর ছায়া দিতে হয়।

মাটি শোধন ঃ মাটিতে বসবাসকারী জীবাণু বা ছত্রাকগুলির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিঘা প্রতি ১০০ কেজি নিমখোল এবং ১.৫ কেজি TH মাটির সাথে মিশিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে এবং দুই সপ্তাহ পলিথিন দিয়ে মাটি ঢেকে রাখতে হবে। মাটি শোধন করার দুই-তিন সপ্তাহ পরে মাটিতে গাছ লাগাতে হয়।

জমি বা বেড ঃ জারবেরা উঁচু বেডে লাগানো হয়, যার মাপ হল—উচ্চতা ৫০ সেমি, প্রস্থ ৬০ সেমি, দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমত এবং দুটি বেডের মাঝের রাস্তা ৩০ সেমি। বেডের সবচেয়ে নীচের স্তরে নুড়ি, বালি রাখতে হবে। বেড তৈরি করার সময় ৯৩০ বর্গ সেমি (১০০ বর্গ ফুট) জমির জন্য ৪ কেজি রকফসফেট, ভারমি কম্পোষ্ট এবং ১০০ গ্রাম বায়ো NPK মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা গাছ লাগানো ঃ প্রতিটি বেডে গাছ লাগানোর সময় সারিগুলির মধ্যে ৩০ সেমি দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এক একটি বেডে ২-৩টি সারি এবং প্রতি বর্গমিটারে ৯টি গাছ লাগানোই বাঞ্ছনীয়। লাগানোর সময় চারাগাছের উপরের দিকের ১-২ সেমি অংশ মাটির উপরে থাকতে হবে।

লাগানোর সময় ঃ সারা বছর ধরেই জারবেরা লাগানো চলে। এক বছরের উৎপাদনের জন্য জুন-আগস্ট মাস হল সবুজ ঘরে লাগনোর সবচেয়ে ভালো সময়। এ ছাড়া দেড় বছর (১৮ মাস) উৎপাদনের জন্য দুটি শীত বা গ্রীষ্ম পাওয়া যায়। আবার দুই বা তার বেশি বছর ধরে উৎপাদনের জন্য বসন্তকালে গাছ লাগাতে হয় (মার্চ-এপ্রিল মাস)।

জলসেচ ঃ এই ফুলে সকালবেলা জল দেওয়া উচিত। মাটিতে জলের পরিমাণ আন্দাজ করেই জল দেওয়া দরকার। জলের পরিমাণ প্রতি ঋতুর জন্য পরিবর্তিত হলেও মোট জলসেচের সংখ্যা প্রায় একই থাকে। প্রায় ১০ সেমি গভীর পর্যন্ত মাটিকে মাঝারি আর্দ্র রাখতে হবে। গাছ লাগানোর ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ক্ষুদ্র স্প্রিংলার দিয়ে জলসেচ দেওয়া চলে, তবে প্রথম কুঁড়ি বেরোনোর পর থেকেই ড্রিপ পদ্ধতিতে জলসেচ দিলে ভালো হয়।

সার প্রয়োগ ঃ প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ১০ কেজি ভালোভাবে পচানো গোবরসার, খোল অথবা উন্নত জৈব সার, হাড় গুঁড়ো প্রভৃতি প্রয়োগ করা দরকার।

রোগ ও পোকার আক্রমণ এবং প্রতিকার ঃ

রোগ ঃ জারবেরা সাধারণত স্ক্লেরোসিয়াম পচন, পদ বা গোড়া পচন, ব্লাইট, পাউডারি মিলডিউ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের পচনের প্রতিকারের জন্য প্রথমত জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। মাটিতে অতিরিক্ত জল দাঁড়িয়ে থাকলে এই ছত্রাকের আক্রমণ বেড়ে যায়। মাটিতে নিম খইল, TH এবং PF প্রয়োগ

করে, মাটি শোধন করা যায়। তাছাড়া, প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাঃ TV এবং ৪ গ্রাঃ PF মিশিয়ে জমি ভিজিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ব্লাইট জাতীয় রোগের প্রতিকারের জন্য অথবা পাউডারি মিলডিউ রোগের জন্য নিয়মিতভাবে বোটানিক্যাল ছত্রাক নাশক থাণ্ডার্শ বা PF এবং TV-র মিশ্রণ নিয়মিত স্প্রে করা প্রয়োজন।

পোকা ঃ আমেরিকান পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা, সবুজ ঘরের মাছি, মাকড় ইত্যাদি শত্রুপোকাগুলি দমনের জন্য কীটনাশক BB, BT প্রভৃতি অথবা নিমের নির্যাশ প্রয়োগ করা যায়।

ফুল তোলা ঃ গাছ লাগানোর পর ৭-৯ সপ্তাহ পরে গাছে প্রথম ফুল আসে। যদিও বীজ থেকে পাওয়া গাছে ফুল আসতে আরও ৩-৪ সপ্তাহ বেশি সময় লাগে। যখন ফুলের ভিতরের দুই সারি পুষ্পিকা ফুলের দণ্ডের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে, তখন সকালে বা সন্ধের দিকে ফুলের বৃন্ত না কেটে গাছের ঝাড়টিকে পা দিয়ে চেপে গাছ থেকে টেনে ফুল তোলা উচিত।

ফুল সংরক্ষণ ঃ প্রতি লিটার জলে **৭-১০ মিলি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের** দ্রবণ মিশিয়ে ফুল তোলার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের বৃন্তগুলি সেই দ্রবণে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এইভাবে ৭-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৪ ঘন্টা ফুলগুলিকে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

ফলন ঃ প্রতি বছরে প্রতি বর্গমিটার এলাকা থেকে ১৫০-২৫০টি ফুল পাওয়া যায়।

প্রশ্নমালা

পত্র ঃ ১

একক ১ ঃ

(ক) পৃথিবীর স্থলভাগের উপর কোন স্তরকে মাটি বলে?

(খ) মাটি সৃষ্টির নেপথ্যে কোন প্রক্রিয়াগুলি কাজ করে?

(গ) উদ্ভিদ জগতের প্রয়োজনে মাটির ভূমিকা কী?

(ঘ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে কোন কোন অনুজীবী ও প্রাণী অংশ নেয়?

(ঙ) উপাদান অনুযায়ী মাটির কতরকমের প্রকারভেদ হয়? সেগুলির নাম বল।

(চ) পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলায় কোন ধরনের মাটি পাওয়া যায়। এই মাটির প্রধান চরিত্র কী?

(ছ) মাটি পরীক্ষার দু'টি পদ্ধতির নাম বল। কোন পদ্ধতিতে কৃষক নিজেই নিজের জমির মাটি পরীক্ষা করতে পারবেন?

একক ২ ঃ

(ক) জৈব কৃষিতে কী কী উপকরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ?

(খ) জৈব কৃষি থেকে কী ধরনের সুফল পাওয়া যায়?

(গ) জৈব কৃষিতে পাঁচটি অবশ্য করণীয় কাজের নাম লেখো।

(ঘ) মাটি ও ফসলের উপকারী জীবাণু কোনগুলি?

একক ৩ ঃ

(ক) জৈব ও অজৈব কৃষিব্যবস্থার সমন্বয় কীভাবে সম্ভব?

(খ) মিশ্র কৃষির মূল সুবিধাগুলি কী? মিশ্র কৃষি কাহাকে বলে?

একক ৪ ঃ

(ক) জৈব কৃষির গোড়ার কথা সংক্ষেপে জানাও।

(খ) 'অর্গানিক ফামিং' শব্দবন্ধটির জন্ম কোন দেশে?

(গ) ১৯৭২ সালে জৈব কৃষি নিয়ে ফ্রান্সে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সংক্ষিপ্ত ও পুরো নাম কী?

(ঘ) APEDA ও NPOP পুরো লিখলে কী হবে?

একক ৫ ঃ

(ক) জৈব কৃষি কাহাকে বলে? জৈব কৃষির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

(খ) প্রকৃত কৃষি ব্যবস্থা রূপায়নে সমস্যাগুলি কী?

একক ৬ ঃ

(ক) গাছের প্রধান ষোলটি খাদ্যউপাদান কী কী?

(খ) কোন কোন খাদ্যউপাদানকে অনু খাদ্যউপাদান বলা হয়?

(গ) গাছ বাতাস থেকে কোন কোন খাদ্যউপাদান গ্রহণ করে?

(ঘ) গাছের দেহ গঠনে প্রধান তিনটি খাদ্যউপাদান এবং সেগুলির ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

(ঙ) গাছের প্রয়োজনীয় প্রধান খাদ্য উপদানগুলি কী কী?

একক ৭ ঃ

(ক) মাটিতে জৈব পদার্থের জটিল খাদ্য উপাদানগুলি কীভাবে উদ্ভিদের সহজলভ্য অবস্থায় পরিণত হয়।

(খ) যে দু'ধরনের ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থকে ভাঙতে সাহায্য করে সেগুলির নাম কী?

(গ) জৈব পদার্থ পচনের পর মাটিতে কোন ধরনের নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ উৎপন্ন হয়?

(ঘ) কোন ধরনের জমির মাটি সংশোধনে ফসফেট সার প্রয়োগ জরুরি?

(ঙ) মাটিতে কখন হিউমাস তৈরি হয়?

(চ) শস্যের বর্জ্য থেকে চাষের জমির মাটিতে কী কী যুক্ত হয়?

একক ৮ ঃ

(ক) উদ্ভিদ কীরূপে (Form) খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে? উদাহরণ দাও।

(খ) জমিতে ফসল থাকাকালীন কেন জৈব সার প্রয়োগ করা উচিত নয়?

(গ) মাটিতে প্রয়োগের পর পটাশ সারের কী পরিণতি হয়?

(ঘ) মাটিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন কোন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে?

(ঙ) ফসফেট সার মাটিতে প্রয়োগের পর যেসব বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে লেখ।

একক ৯ ঃ

(ক) মাটির উর্বরতা রক্ষায় জৈব সার কী কী ভূমিকা পালন করে?

(খ) মাটির খাদ্যভাণ্ডার কাকে বলে? কীভাবে এই খাদ্যভাণ্ডার তৈরি হয়?

(গ) জৈব সারের সঙ্গে রাসায়নিক সার দেওয়া কী খুব জরুরি? উত্তরের স্বপক্ষে কারণগুলি লেখো।

একক ১০ ঃ

(ক) কয়েকটি জৈব সারের নাম লেখো।

(খ) জৈব সার ব্যবহারের সুবিধা কী কী?

(গ) খামারের সার ও সবুজ সারের মধ্যে তফাৎ কী?

(ঘ) শিম্বীগোত্রীয় শস্য হিসাবে কোন কোন ফসলের চাষ করা যায়?

(ঙ) প্রাণীজ জৈব সার কোনগুলি? এ ধরনের সারে গাছের প্রধান তিনটি খাদ্যউপাদানের কোনটি কম পাওয়া যায়?

(চ) জীবাণু সার কাকে বলে? এই সারকে কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

(ছ) অ্যাজোটোব্যাক্টর জীবাণু মাটিতে কী ধরনের কাজ করে?

(জ) জীবাণু সার ব্যবহারের উপকারীতা কী কী?

(ঝ) কৃষিক্ষেত্রে জৈব বস্তুর পুনর্ব্যবহার কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(ঞ) চাষের ক্ষেতে 'মালচিং' বা আচ্ছাদন কাকে বলে?

(ট) ফসফোকম্পোষ্ট কীভাবে তৈরি করে?

একক ১১ ঃ

(ক) কতরকম পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরি করা যায়? সেগুলির নাম কী?

(খ) যে কোনও একটি পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরি সম্পর্কে লেখো।

(গ) একটি আদর্শ কম্পোষ্ট সারের কী কী গুণ থাকা দরকার?

(ঘ) কম্পোষ্ট প্রস্তুতের জন্য জৈব পদার্থ নির্বাচনের সময় কোন কোন ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে?

একক ১২ ঃ

(ক) ভার্মিকম্পোষ্ট কী? এই কম্পোষ্ট তৈরিতে ব্যবহৃত কয়েকটি কেঁচোর নাম লেখো।

(খ) এক কুইন্টাল ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরি করতে হলে কী করতে হবে?

(গ) ভার্মিওয়াশ কাকে বলে? এই তরল জৈব সার কীভাবে কখন কোন গাছে ব্যবহার হয়?

(ঘ) ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি ও ব্যবহার কেন বেশি লাভজনক?

পত্র ঃ ২

একক ১ ঃ

(ক) অত্যধিক রাসায়নিক সার ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে কী কী ক্ষতি হয়েছে?

(খ) রাসায়নিক কীটনাশক কীভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে?

(গ) মানবদেহে কৃষি-রসায়নের ক্ষতিকারক প্রভাব এড়াতে হলে কী করতে হবে?

(ঘ) জৈব বৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? মানুষের প্রয়োজনে এই জৈব বৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখা কেন জরুরি?

(ঙ) কৃষি জমিতে প্রয়োগ করা রাসায়নিক কীটনাশকের শেষ পরিণতি কী?

একক ২ ঃ

(ক) মাটির বিক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া কাকে বলে? সাধারণত মাটিতে কতরকমের বিক্রিয়া সংঘটিত হয়? এই বিক্রিয়া কোন একক দিয়ে মাপা হয়?

(খ) মাটি কখন অম্ল হয়? মাটির অম্লত্ব কয় প্রকারের? অম্লত্ব দূর করতে কী পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন?

(গ) নোনামাটির সমস্যাগুলির উল্লেখ করে তা সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে লেখো।

(ঘ) ক্ষার জমির পরিচর্যা ও সার ব্যবহার কীভাবে করা দরকার?

একক ৩ ঃ

(ক) মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে তফাৎ কোথায়?

(খ) উর্বরতা বাড়লেই কি মাটির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে? উত্তর না হলে, কেন নয়? উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে হলে আর কী কী দরকার?

(গ) জমির উর্বরতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

(ঘ) মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

একক ৪ ঃ

(ক) উদ্যান ও বাগিচা ফসলের শ্রেণীতে কোন কোন ফসল আসে?

(খ) শীতল জলবায়ু অঞ্চলে কোন ধরনের উদ্যান ফসল ভালো হয়?

(গ) পশ্চিমবঙ্গে কোন ধরনের দানা ও তন্তুলজাতীয় শস্যের চাষ ভালো হয়?

(ঘ) আমাদের রাজ্যে প্রধান কন্দজাতীয় ফসল কী? এর চাষের সময় সম্পর্কে বিশদে লেখো।

(ঙ) কোন আবহাওয়ায় এবং কোন সময়ে বিভিন্ন তৈলবীজের চাষ ভালো হয়?

(চ) বিভিন্ন ডালশস্য চাষে জৈব কৃষির উৎকর্ষ কীভাবে বাড়ে?

একক ৫ ঃ

(ক) গম চাষ না বোরোধান চাষ, জৈব কৃষির পরিপ্রেক্ষিতে কোনটা বেশি লাভজনক?

(খ) পাটের জৈব চাষে কোন সার কী পরিমাণে দিতে হবে?

(গ) আমাদের রাজ্যে তৈলবীজ চাষে ফলন কেন কম হয়?

(ঘ) জৈব চাষে সবজি বীজ কীভাবে শোধন করতে হবে এবং এ কাজে কোন জৈব কীটনাশক ও রোগনাশক ব্যবহার করতে হবে?

(ঙ) লাভজনকভাবে ফল চাষ করতে হলে কোন বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখতে হবে?

(চ) পেঁপের আঠা প্যাপেইন কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়?

(ছ) ফসল চক্রে শুঁটিজাতীয় ফসল কেন অপরিহার্য?

একক ৬ ঃ

(ক) শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

(খ) ড্রাম সীডারের সাহায্যে ধান চাষের সুফল কী?

(গ) পায়রা গম বা বিনা কর্ষণে গম চাষ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর?

একক ৭ ঃ

(ক) জীবাণুঘটিত পেস্টিসাইড পরিবেশ বান্ধব কেন?

(খ) কৃষিজমিতে প্রয়োগের পর কীটনাশকের কী পরিণতি হয়?

(গ) উদ্ভিদজাত কীটনাশক কোন কোন উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত করা হয়?

(ঘ) নিমগাছের অংশ দিয়ে ঘরোয়া কীটনাশক কীভাবে তৈরি করা যায়?

(ঙ) নিম তেল ও রসুনের মিশ্রণ কোন ফসলের কীটশত্রু দমন করে?

(চ) সুসংহত শস্য সুরক্ষা কোন পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়?

একক ৮ ঃ

(ক) নিমজাত কীটনাশকের সুবিধা কি?

(খ) কীটনাশক তৈরির জন্য নিমবীজ সংগ্রাহ কীভাবে করে?

(গ) নিম বীজের নির্যাশ (NKAE) কীভাবে প্রস্তুত করবে?

(ঘ) জৈব কৃষিতে নিমের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

একক ৯ ঃ

(ক) জৈব কৃষি ব্যবস্থা সুগঠিত করতে ভারত সরকার কী কী উদ্যোগ নিয়েছে?

(খ) জৈব কৃষির উন্নয়নে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি কোন কাজগুলি করছে?

একক ১০ ঃ

(ক) শহর ও শহরতলীতে কী ধরনের চাষ হয়?

(খ) শহর ও শহরতলীর কৃষিতে কী কী সুবিধা?

একক ১১ ঃ

(ক) চুক্তিবদ্ধ চাষ কাকে বলে?

(খ) চুক্তিচাষে কৃষকরা কী কী সুবিধা পান?

(গ) চুক্তিবদ্ধ চাষকে স্থিতিশীল করতে হলে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন?

একক ১২ ঃ

(ক) জৈব কৃষির মুখ্য চারটি স্তম্ভ কী কী?

(খ) জৈব খামার শংসাকরণ করতে হলে কৃষকদের কী কী কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

একক ১৩ ঃ

(ক) উদ্যানজাত ফসলে জৈব চাষের গুরুত্ব কতটা?

(খ) গুল্ম ও বীরুৎ শ্রেণীর কয়েকটি ফুলের নাম লেখো।

(গ) উদ্যানজাত ফসলের রপ্তানি বাড়াবার উপায় কী?